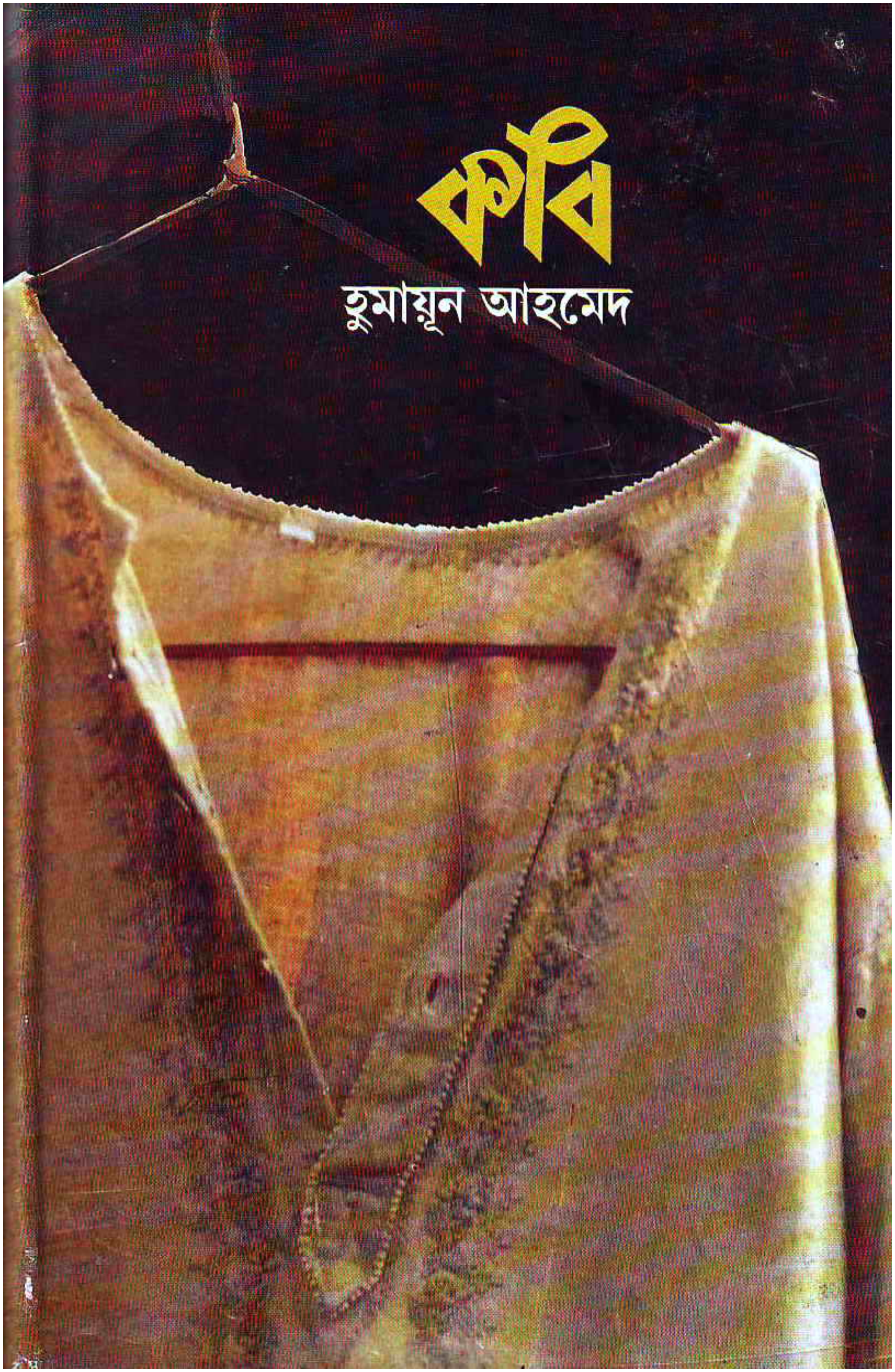
কবি
হুমায়ূন আহমেদ

সিলেটের মীরাবাজারের পুরানো শ্যাওলা ধরা দালানের একটা ঘর। মধ্যরাত্রি। পাঁচ–ছ' বছর বয়েসী একটি শিশু বাবা–মা'র পাশে ঘুমুচ্ছে। বাইরে উথাল পাথাল জোছনা। সেই জোছনা বাড়ির ভেন্টিলেটর দিয়ে ঘরে ঢুকেছে, পড়েছে শিশুটির মশারির ছাদে। মনে হচ্ছে আলোর ফুল ফুটে আছে। হঠাৎ শিশুটির ঘুম ভেঙে গেল। সে বিস্ময় এবং ভয় নিয়ে তাকিয়ে রইল জোছনার ফুলের দিকে। এক সময় বাবাকে ডেকে তুলে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "এটা কি?" শিশুর বাবা ফুলের রহস্য ব্যাখ্যা করলেন — "ভেন্টিলেটারে ফুলের নকশাকাটা। জোছনা ভেন্টিলেটার দিয়ে ঢুকেছে বলেই ফুল হয়ে মশারির ছাদে পড়েছে। ভয়ের কিচ্ছু নেই।" শিশুর ভয় তারপরেও যায় না। তখন বাবা বললেন, "হাত দিয়ে ফুলটা ধর, ভয় কেটে যাবে।" শিশুটি সেই ফুল হাত দিয়ে ধরতে গেল। যতবারই ধরতে যায় ততবারই ফুল হাত গলে বের হয়ে যায়।

কবি — জোছনার ফুল ধরার গল্প। মহান বোধকে স্পর্শ করার আকাংক্ষার গল্প। জীবনকে দেখা এবং না দেখার গল্প।

কবি উপন্যাসে কিছু কবিতা ব্যবহার করতে হয়েছে। অতি বিনয়ের সঙ্গে জানাচ্ছি কবিতাগুলি আমার লেখা। পাঠক-পাঠিকারা আমার দুর্বল গদ্যের সঙ্গে পরিচিত। সেই গদ্য তাঁরা ক্ষমা সুন্দর চোখে গ্রহণ করেছেন। কবিতাগুলিও করবেন — এই অসম্ভব আশা নিয়ে বসে আছি। ক্ষমা পেয়ে পেয়ে আমার অভ্যাস গেছে খারাপ হয়ে।

হুমায়ূন আহমেদ
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

কবি

আতাহারের পরনে পাঞ্জাবি।

পাঞ্জাবিতে ইস্‌ত্রি নেই, দলমচা ভাব। সেটা কোন ব্যাপার না — নতুন জামাইদের ক্ষেত্রেই ইস্‌ত্রি করা পাঞ্জাবি বাধ্যতামূলক, সে নতুন জামাই নয়। সমস্যা একটাই — পাঞ্জাবির পেটের কাছে হলুদ দাগ। মনে হয় গোশত দিয়ে ভাত খাবার পর কেউ একজন হাত না ধুয়ে পাঞ্জাবিতে হাত মুছে ফেলেছে। পাঞ্জাবি বদলে অন্য কিছু পরার মত সময় আতাহারের নেই — তাকে অতি দ্রুত বাড়ি থেকে বের হতে হবে। তার বাবা (অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টার, বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল) রশীদ আলি সাহেব এই মুহূর্তে বাথরুমে আছেন। তিনি খবরের কাগজ নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছেন। কাগজ শেষ করে বাথরুম থেকে বের হবেন। মিনিট কুড়ি লাগার কথা। এই সময়ের ভেতর আতাহারের হাওয়া হয়ে যেতে হবে। তা না করতে পারলে ভয়াবহ সমস্যা হতে পারে। রিস্ক নেয়া ঠিক হবে না।

কিছুক্ষণ আগে রশীদ আলি সাহেবের সঙ্গে তাঁর পুত্রের দেখা হয়েছে। তিনি বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করছিলেন — খবরের কাগজের জন্যে অপেক্ষা। কাগজ আসছে না, তিনি বাথরুমে ঢুকতে পারছেন না। এমন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আতাহার কি জন্যে যেন বারান্দায় এসেছে। বাবাকে দেখে সে থমকে গেল। রশীদ আলি কিছুক্ষণ ছেলের দিকে শীতল চোখে তাকিয়ে থেকে ধমকের গলায় বললেন, কি রে, তুই মনিকার ফ্ল্যাট দেখতে গিয়েছিলি?

আতাহার সঙ্গে সঙ্গে বলল, জ্বি। যদিও সে যায়নি। সময় করে উঠতে পারেনি। বেকার যুবকদের নানান ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় বের করা তাদের পক্ষেই সবচে কঠিন। এই তথ্য অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্য। বাবাকে সত্য কথাটা বলা গেল না।

রশীদ আলি বললেন, পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সব লিখে এনেছিস তো?

আতাহার বলল, হুঁ।

রশীদ আলি বিরক্ত গলায় বললেন, হুঁ হুঁ বলে জবাব দিবি না। কিছু জিজ্ঞেস করলে পুরো একটা সেনটেন্সে জবাব দিবি। সব লিখে এনেছিস?

'জ্বি, লিখে এনেছি।'

'কোন ঘরের আয়না ভাঙা, বাথরুমের কি অবস্থা, দেয়ালে দাগ আছে কি-না সব লিখেছিস?'

'লিখেছি।'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

'ভেরি গুড। নোটবইটা নিয়ে বারান্দায় বোস, আমি আসছি।'

রশীদ আলি বাথরুমে ঢুকলেন। আতাহার ঢুকল নিজের ঘরে। হাতের কাছের পাঞ্জাবিটাই গায়ে ঢুকিয়ে দিল। তাড়াহুড়ার সময় সব কাজে ঝামেলা হয়। পাঞ্জাবি গায়ে দেবার পর দেখা যায় পাঞ্জাবিটা উল্টো হয়েছে। বোতামের ঘর চলে গেছে পিঠের দিকে। স্যান্ডেল দু'পাটির ভেতর এক পাটি খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যপাটি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার পরম সৌভাগ্য — পাঞ্জাবি উল্টো হয়নি। স্যান্ডেলের দু'পাটিই খাটের কাছে আছে। শুধু পাঞ্জাবির পেটের কাছে হলুদ দাগ। থাকুক দাগ। চাঁদের মত সুন্দর জিনিসেও কলংক আছে — আর পাঞ্জাবিতে থাকবে না তা-কি হয় ! চাঁদের শোভা তার কলঙ্ক। পাঞ্জাবির শোভা হলুদ দাগ।

একতলার বারান্দায় মিলির সঙ্গে দেখা। মিলির মুখ শুকনা। চোখ ডেবে গেছে। গলায় কমলা রঙের মাফলার। মনে হয় আবার তার টনসিলের সমস্যা হচ্ছে। সপ্তাহে তিন দিন তার টনসিল ফুলে থাকে। গলায় কমলা রঙের মাফলার জড়াতে হয়। মিলি বলল, তুই কি বেরুচ্ছিস না-কি ভাইয়া ?

'হুঁ।'

'নাশতা না খেয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?'

মিলি আতাহারের ছ' বছরের ছোট। সে আতাহারকে তুই করে বলে। তার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন সে এ বাড়ির বড় মেয়ে। সংসার দেখেশুনে নেয়ার দায়িত্ব তার। আজ আবার সে শাড়ি পরেছে। মায়ের ছাপা শাড়ি পরেছে বলেই কি গলার স্বরে মা মা ভাব ?

শাড়ির রঙের সঙ্গে গলার স্বরের পরিবর্তন হয় কি ? হলুদ শাড়ি যখন পরবে তখন গলার স্বর এক রকম, আকাশী নীল শাড়িতে অন্য রকম। পরীক্ষাটা করে দেখলে হয়। গবেষণামূলক একটা প্রবন্ধ হতে পারে। প্রবন্ধের শিরোনাম — "দ্য ইফেক্ট অব কালার অন ইয়াং গার্লস ভয়েস।"

'ভাইয়া, তুই নাশতা-টাশতা না খেয়ে কোথায় যাচ্ছিস ?'

আতাহার জবাব দিল না। জবাব দিয়ে নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই। গেটের বাইরে এসে আতাহার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিল — প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব নেয়া হয়েছে, না তাড়াহুড়ায় কিছু বাদ পড়ে গেছে ? রুমাল পাওয়া গেল। এটা তেমন প্রয়োজনীয় না। তার সর্দি নেই যে নাকের সিকনি রুমালে ভরে পকেটে যত্ন করে রাখতে হবে। দেয়াশলাই পাওয়া গেল। এটা মোটামুটিভাবে জরুরি। একবার পকেটে সিগারেট থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র দেয়াশলাই-এর অভাবে সে সারারাত সিগারেট খেতে পারেনি।

মানিব্যাগ পাওয়া গেল প্যান্টের পকেটে। এটা অত্যন্ত আশার কথা। মানিব্যাগের সন্ধানে আবার বাড়িতে ঢুকতে হলে সাড়ে সর্বনাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

মানিব্যাগ খুলে আতাহার এক ঝলক দেখে নিল — লাল রঙ উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। তার মানে পঞ্চাশ টাকার নোট কোথাও লুকিয়ে আছে। বিরাট ভরসার কথা। আতাহার লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করল। সকালে নাশতা খাওয়া হয়নি। খিদে লাগছে।

খিদের চেয়েও যা বড় — চায়ের পিপাসা হচ্ছে। দিনের প্রথম চা এখনো খাওয়া হয়নি। দিনের প্রথম চা পানের আনন্দ স্বর্গীয় আনন্দের কাছাকাছি।

চা-নাশতার জন্যে সবচে ভাল জায়গা হচ্ছে সাজ্জাদের কলাবাগানের বাসা। সাজ্জাদের ছোট বোন নীতু আতাহারকে দেখামাত্রই বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাবে, তারপরেও চা-নাশতা এনে দেবে। এবং কঠিন গলায় বলবে, মানুষের বাসায় গিয়ে চেয়ে চেয়ে চা-নাশতা খেতে আপনার লজ্জা লাগে না? নীতু এবারই ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে। প্রথম ইউনিভার্সিটিতে ঢোকা মেয়েগুলি কঠিন কঠিন কথা বলে সবাইকে চমকে দিতে ভালবাসে, কাজেই নীতুর কোন কথাই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সমস্যা হচ্ছেন নীতুর বাবা হোসেন সাহেব। পৃথিবীর পাঁচজন বিরক্তিকর মানুষের তালিকা তৈরি হলে সেই তালিকাতেও তাঁর নাম থাকার কথা। জগতের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে হোসেন সাহেব কিছু না কিছু জানেন। সেই জ্ঞান তিনি নিজের ভেতর সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। ছড়িয়ে দিতে চান। হাসি হাসি মুখে একঘেঁয়ে সুরে তিনি যখন জ্ঞান বিতরণ করেন তখন আতাহারের ইচ্ছা করে লোহার একটা শাবল দিয়ে ঠাস করে তাঁর মাথায় বাড়ি দেয়। সেটা সম্ভব হয় না বলে কৌতূহলী ভঙ্গি চোখে-মুখে ফুটিয়ে তাঁর যাবতীয় জ্ঞানের কথা শুনতে হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য।

আশার কথা হচ্ছে আজ ছুটির দিন। ছুটির দিন হোসেন সাহেব সাপ্তাহিক বাজার করতে যান। আজ তাঁর সঙ্গে দেখা না হবার সম্ভাবনাই বেশি।

চৈত্র মাস। এই সকালেই চিড়চিড়ে রোদ উঠে গেছে। বাতাস দিচ্ছে বলে রোদটা অগ্রাহ্য করে হাঁটতে ভাল লাগছে। দুপুরের মধ্যে অবস্থা অন্য রকম হবে। দালান-কোঠা থেকে ভাপ বেরুতে থাকবে। সেই ভাপে থাকবে দালান কোঠার প্রাচীন গন্ধ। রাস্তার পিচ নরম হয়ে স্যান্ডেলের সঙ্গে উঠে আসতে থাকবে। সারাক্ষণ নাকে লাগবে পিচের ঝাঁঝালো টক টাইপ গন্ধ। আতাহারের মত মানুষ, রাস্তায় হাঁটাই যাদের প্রধান কর্ম তাদের জন্যে চৈত্র মাসের দুপুর বড়ই দুঃসময়।

আতাহার রিকশা নেবে, না হেঁটে হেঁটে যাবে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। মানিব্যাগের অবস্থা ভাল না। রিকশা ভাড়ার যন্ত্রণায় যাওয়া ঠিক হবে না। এখন বাজছে আটটা। হেঁটে যেতে যেতে ন'টার মত বাজবে। তাতে একটা সুবিধা হবে — হোসেন সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি বাজারে চলে যাবেন। সাড়ে আটটার মধ্যে তিনি বাজারে যান। সাবধানতার জন্যে আরো আধঘণ্টা হাতে থাকা ভাল।

হোসেন সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁর গায়ে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি। চোখে আঠারো ক্যারট সোনার চশমা। সোনালী ফ্রেমের ভেতর দিয়ে তাঁর মায়া মায়া চোখ দেখা যাচ্ছে। তাঁর সাজসজ্জা দেখে

মনে হচ্ছে তিনি বউভাতের কোন অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন। আতাহারের বুক ধক করে উঠল। হোসেন সাহেব হাসিমুখে মধুর গলায় বললেন, কেমন আছ আতাহার?

'জ্বি চাচা ভাল।'

'মুখ মলিন কেন?'

'হেঁটে এসেছি তো। আপনি বাজারে যাননি?'

'হ্যাঁ যাব। তোমাকে পেয়ে ভালই হয়েছে, ঐ দিনের ডিসকাশনটা শেষ হয়নি। তুমি তাড়াহুড়া করে চলে গেলে, সূফীবাদের মূল ব্যাপারটা বলতে ভুলে গেলাম। আরাম করে বোস, আমি নীতুকে চা দিতে বলি।'

'আমার একটা খুব জরুরি কাজ আছে চাচা। আমার বড়বোন, যিনি আমেরিকায় থাকেন, তাঁর একটা ফ্ল্যাট আছে এলিফেন্ট রোডে। ঐ ফ্ল্যাটের ভাড়াটে তিন মাসের ভাড়া বাকি ফেলে চলে গেছে। যাবার আগে বাড়ির অনেক ক্ষতি করেছে। আমাকে এইসব দেখে বাবাকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'রিপোর্ট করে কি হবে? যা করতে হবে তা হল মামলা। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে কি করতে হয়? আঙুল বাঁকা করতে হয়। যত বাঁকা করবে তত ঘি উঠবে।'

'জ্বি, তা তো বটেই।'

'আমাদের সমস্যা কি জান আতাহার — আমরা আঙুল বাঁকা করতে পারি না। মুখে খুব হৈ-চৈ করি কিন্তু আঙুল বাঁকা করি না। ভাড়াটে ক্ষতি করে চলে গিয়েছে এই নিয়ে আমরা খুব চেঁচামেচি করব। একে বলব, তাকে বলব। কি কি ক্ষতি করেছে তার লিস্ট করব। তা করতে গিয়ে আমাদের দম ফুরিয়ে যাবে। আসল কাজ আর করা হবে না। ঠিক না?'

'জ্বি চাচা, ঠিক। আপনি খুবই খাঁটি কথা বলেছেন।'

'আসল কাজের প্রতি আমাদের অনীহার কারণ জান আতাহার?'

আতাহার মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। আজ দিনটা খারাপভাবে শুরু হয়েছে। একের পর এক প্যাঁচে জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা প্যাঁচ খোলামাত্র অন্য একটা প্যাঁচ। এখন যে প্যাঁচে পড়েছে তার থেকে খুব সহজে মুক্তি পাওয়া যাবে তা মনে হচ্ছে না। দোয়া ইউনুস পাঠ করা যেতে পারে। ইউনুস নবী মাছের পেটে নির্বাসিত হয়ে এই দোয়া পাঠ করেছিলেন। মাছ দোয়ার তেজ সহ্য করতে না পেরে তাকে উগরে ফেলে দিয়েছিল। আতাহারের ক্ষেত্রেও কি তা হবে? হোসেন সাহেব তাকে উগরে ফেলে দেবেন? আতাহার দোয়াটা মনে করতে পারছে না। বাস এবং বেবীট্যাক্সির ড্রাইভারদের চোখের সামনে এই দোয়া লেখা থাকে। আতাহার অসংখ্য বার পড়েছে। এখন আর মনে পড়ছে না। সে তাকিয়ে আছে হোসেন সাহেবের দিকে। হোসেন সাহেব হাসিমুখে কথা বলছেন,

'বুঝলে আতাহার, পশু এবং মানুষকে তুমি যদি দু'টা ভাগে ভাগ কর তাহলে তুমি মজার একটা ব্যাপার লক্ষ্য করবে। ব্যাপারটা সিস্টেমেটিক্যালি কর। এসো, একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করি। মনে মনে কল্পনা করো। একটা শাদা পাতা নাও। একদিকে লিখো মানুষ, একদিকে পশু, মাঝখানে লম্বা একটা দাগ দাও। দিয়েছ?'

'জ্বি।'

'ভেরী গুড। এখন নাম্বারিং কর। এক দুই করে গো আপওয়ার্ড . . . ।'

হোসেন সাহেব উৎসাহের সঙ্গে শুরু করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হল। দরজার মুখে নীতুকে দেখা গেল।

নীতুও আজ শাড়ি পরেছে। আতাহার ভেবে পেল না — আজ কি কোন বিশেষ দিন — যে দিন সব বাচ্চা মেয়েকে শাড়ি পরতে হবে?

নীতুর মুখ কঠিন। তার গলার স্বরও হিমশীতল। হোসেন সাহেব বললেন, কি ব্যাপার মা?

'তুমি বাজারে যাবে না?'

'যাচ্ছি তো। পশু এবং মানুষ বিষয়ক আমার ধারণাগুলি আতাহারকে বলছিলাম।'

'ধারণাগুলি বলার সময় তুমি অনেক পাবে বাবা। ধারণা পালিয়ে যাচ্ছে না। এখন যদি বাজারে না যাও, মাছ-টাছ কিছুই পাবে না। আজ ছুটির দিন না?'

'দ্যাটস রাইট। আজ ছুটির দিন তো বটেই।'

'তুমি বাজারে চলে যাও। আমি আতাহার ভাইকে আটকে রাখছি।'

'এটা মন্দ না।'

'চট করে বাজার সেরে এসো। এসে পশু এবং মানুষ বিষয়ক তোমার হাইপোথিসিস আতাহার ভাইকে বুঝিয়ে বল।'

হোসেন সাহেব মেয়ের কথায় আস্বস্ত হলেন এবং অতিরিক্ত ব্যস্ততায় বাজারের দিকে রওনা হলেন। নীতু আতাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবার হাত থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে দিলাম। এখন আপনি ভালয় ভালয় বিদেয় হয়ে যান।

'নাস্তা খেয়ে তারপর যেতে হবে। নাস্তা খেয়ে আসিনি। বাসি রুটি-ভাজি যা হোক একটা কিছু দে। আমি সাজ্জাদের ঘরে গিয়ে বসি। ওর ঘুম ভেঙেছে?'

'ভাইয়া বাড়িতে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না কোথায় গেছে। দু'দিন ধরে তার কোন খোঁজ নেই।'

'দু'দিন ধরে একটা মানুষের কোন খোঁজ নেই আর তোরা বেশ স্বাভাবিক জীবন যাপন করছিস? আশ্চর্য তো!'

'আমরা কি করব? মাইকে করে পাড়ায় পাড়ায় ঘোষণা দেব — সাজ্জাদ নামের একজন যুবক হারানো গিয়াছে? ভাইয়ার বাড়ি থেকে উধাও হওয়া তো আজ নতুন কিছু না। আপনি সেটা ভাল করেই জানেন।'

'তুই আমার উপর রাগ করছিস কেন? আমি তো তাকে ফুসলে-ফাসলে বাড়ি থেকে বের করিনি। আমি খুবই গৃহী ধরনের মানুষ। রাত আটটার পর সব সময় আমাকে বাসায় পাওয়া যায়।'

নীতু গম্ভীর মুখে বলল, আপনি বসার ঘরে গিয়ে বসুন — আমি চা-নাশতা নিয়ে আসছি। হলুদ দাগ দেয়া পাঞ্জাবিটা কি ইচ্ছা করে পরেছেন? সবাইকে দেখানোর জন্যে

যে আপনি আলাদা? অন্যদের মত পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেন না — নোংরা জামা-কাপড় পরেন?

আতাহার হাই তুলতে তুলতে বলল, সাজ্জাদ বাড়ি থেকে পালিয়েছে এই রাগ তুই আমার উপর চাপাচ্ছিস এটা ঠিক হচ্ছে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে হলেও কথা ছিল। উদোর পিণ্ডি একেবারে সুলায়মানের ঘাড়ে!

নীতু কিছু না বলে চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাশতা নিয়ে ঢুকল। যেন তার জন্যে নাশতা তৈরিই ছিল, নীতু শুধু নিয়ে এসেছে। আগুন-গরম পারাটা, ডিমভাজা, একটা বাটিতে গরুর মাংস। নীতু খাবার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, চা খাবেন, না কফি খাবেন?

'দু'টাই খাব। প্রথমে এক কাপ চা, তারপর কফি। আর শোন নীতু, এক পারাটায় আমার হবে না। দু'টা লাগবে।'

'পারাটা ভাজছে।'

'গুড। শোন নীতু, পৃথিবীর পাঁচটা শ্রেষ্ঠ মেয়ের তালিকা যদি কোনদিন করার চেষ্টা হয় তাহলে আমি খুব চেষ্টা করব তোর নাম ঢুকাতে।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'দেশ ছেড়ে যাবার সময় পাঁচটা জিনিসের জন্য আমার খারাপ লাগবে। এক — বৃষ্টি, দুই — বর্ষার ব্যাঙের ডাক, তিন — বাঁশবনে জোছনা, চার — কালবোশেখি, পাঁচ — তুই।'

'আপনার সবই কি পাঁচটা পাঁচটা করে?'

'হুঁ। পাঁচ হচ্ছে ম্যাজিকেল নাম্বার। কোন মেয়েকে যদি কখনো পাঁচটা গোলাপ দেয়া যায় তাহলে সে জন্মের মত কেনা হয়ে যায়। পারাটা তো নীতু অসাধারণ হয়েছে। বিষ্ণু দে'র কবিতার চেয়েও ভাল হয়েছে। প্রায় ক্লাসিকের পর্যায়ে চলে গেছে। খেতে মায়া লাগছে। ক্লাসিক পর্যায়ের জিনিস ভক্ষণ করা যায় না।

'ভক্ষণ করা না গেলে করবেন না। আপনাকে তো জোর করে ভক্ষণ করাচ্ছি না।'

'নীতু, তুই কোন্ রাশির জাতক বল তো?'

'কেন?'

'আমার মনে হচ্ছে তুই লিব্রা। লিব্রারা যে কোন সহজ কথায় একটা প্যাঁচ ধরে। খবরদার, তুই বিয়ে করবি না। বিয়ে করলে তোর স্বামীর সঙ্গে তুই ৩৬৫ দিন ঝগড়া করবি। লিপ ইয়ারে করবি ৩৬৬ দিন।'

কাজের মেয়ে ধোঁয়া ওঠা পারাটা নিয়ে ঢুকল। নীতু আতাহারের প্লেটে পারাটা তুলে দিতে দিতে বলল, আপনি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, তা তো জানতাম না!

'সাজ্জাদ তোকে কিছু বলেনি?'

'ভাইয়ার সঙ্গে আমার কোন কথা হয় না। যাচ্ছেন কোথায়?'

'হলুদ চামড়ার দেশ — জাপানে।'

'জাপানে গিয়ে আপনি কি করবেন?'

'জাপানের আকাশে-বাতাসে ইয়েন উড়ছে। খাবলে খাবলে তাই ধরব। ভিসা পাওয়াই শুধু সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।'

'সমাধানটা কি?'

'সাংস্কৃতিক এক দল যাচ্ছে জাপানে। আমি ওদের সঙ্গে তবলাবাদক হিসেবে যাচ্ছি। ওরা ফিরে আসবে, আমি থেকে যাব।'

'পারাটা কি আরেকটা দেব?'

'না। দিলে লোভে পড়ে খেয়ে ফেলব। অত খাওয়া উচিত হবে না। চা দে, কফি দে। চা-কফি খেয়ে বিদেয় হই।'

'আপনার মা কেমন আছেন?'

'ভাল।'

'উনার কেবিন নাম্বার কত? আমি একবার উনাকে দেখতে যাব।'

'আনলাকি থারটিন-কে দুই দিয়ে গুণ করলে যত হয় তত।'

'উনার শরীর এখন কেমন?'

'ভাল।'

'ভাল হলে হাসপাতালে কেন?'

'হাসপাতালে যারা বাস করছে তাদের মধ্যে ভাল।'

'জাপান কবে যাচ্ছেন?'

'খুব শিগ্‌গির। তবে জাপানে যাই আর মালয়েশিয়াতে যাই — তোর পারাটার কথা মনে থাকবে।'

আতাহার সিগারেট ধরালো। নীতু কঠিন গলায় বলল, সিগারেট ধরাবেন না আতাহার ভাই। কতবার আপনাকে বলেছি আমার সিগারেটের গন্ধ সহ্য হয় না।

'গন্ধ সহ্য করতে তোকে কে বলছে? আমি তো বসে বসে তোর মুখের উপর ধোঁয়া ছাড়ব না। চলে যাব। এই সিগারেট হচ্ছে ফর দ্য রোড।'

'কফি তো খাননি। বানানো হচ্ছে।'

'বানানো হলে অবশ্যই খেয়ে যাব।'

'তাহলে সিগারেট ফেলতে হবে। সিগারেট হাতে নিয়ে কফি খেতে দেব না।'

'সিগারেট ছাড়া কফি খাওয়ার মধ্যে কোন মজা আছে? দরকার নেই আমার কফির। বিদায়। আর শোন নীতু, তুই একটু খাওয়া-দাওয়া কর। তুই যে হারে রোগা হচ্ছিস, কিছুদিন পর তোর আর ছায়া পড়বে না।'

আতাহার উঠে দাঁড়াল। নীতুর ইচ্ছা হল বলে, ঠিক আছে। সিগারেট ফেলতে হবে না। কফি খেয়ে যান। বলতে গিয়েও নীতু বলল না। কথাগুলি গলার কাছে শক্ত বরফের দলার মত আটকে রইল। তার আত্মসম্মান অতি তীব্র। সে মরে গেলেও নিজের কাছে ছোট হতে পারবে না। আতাহার ঠিক এগারো দিন পর তাদের বাড়িতে এসেছে। সে যে এইভাবে দিনক্ষণের হিসাব রাখে তাও সে কোনদিন আতাহারকে জানাতে পারবে না। আজ যে আতাহার আসবে তাও সে জানত। ভোরে ঘুম ভেঙেই তার মনে হয়েছে

আতাহার ভাই আসবে। কেন তার এরকম মনে হয়েছে তা সে জানে না। শুধু এইটুকু জানে, যখন তার মনে হয় আতাহার ভাই আসবে, তখন সে আসে। একবার রাত এগারোটার সময় তার এ রকম মনে হল। সে অতি দ্রুত চুল বেঁধে, শাড়ি পরল। তারপর বসার ঘরে বসে রইল। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। আতাহার ভাই সত্যি সত্যি রাত সাড়ে এগারোটার সময় উপস্থিত।

এইসব কথা কাউকে বলা যাবে না। তার আগে সে বিষ খেয়ে মরে যাবে। বিষ খেয়ে মরা নীতুর কোন কথার কথা না। বিষ তার কাছে আছে। সত্যি আছে। তার বইপত্র যে বুক শেলফে আছে সেই শেলফের তিন নম্বর তাকে বই-এর পেছনে লুকানো আছে। নীতুর ধারণা, খুব বেশিদিন শিশিটা লুকিয়ে রাখতে হবে না।

আতাহার চলে যাবার পরপরই নীতু বাথরুমে ঢুকল। সে দিনের মধ্যে কয়েকবার শুধুমাত্র কাঁদার জন্যে বাথরুমে ঢুকে। তার অনেক গোপন দুঃখ-কষ্টের একটা হচ্ছে সে কালো। যতটুকু কালো হলে মা'রা মেয়েদের শ্যামলা বলেন — সে তার চেয়েও কালো। নীতুর ধারণা, যত দিন যাচ্ছে তার গায়ের রঙ ততই কালো হচ্ছে। কালো মেয়েদের আলাদা কিছু সৌন্দর্য থাকে। তাদের চোখ সুন্দর হয়, ঠোঁট সুন্দর হয়, হাসি সুন্দর হয়। তার সবই অসুন্দর। নীতু আয়নার সামনে ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না সামলাবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

এক সময় বাড়ি-ঘরের সুন্দর সুন্দর নাম হত — সুরভি, কদম্ব, নীলাঞ্জন। এখন ইংরেজি নামের চল হয়েছে। মনিকার এপার্টমেন্ট হাউসের নাম Elephant Park Apartments. বাংলা করলে কি হয় — হাতি-বাগান ঘরবাড়ি। এপার্টমেন্টের ভাল বাংলা কি ভাবতে ভাবতে আতাহার রিসিপশনের দিকে এগোলো। রিসিপশনে ছোকরা মতন একজন বসে। তার গায়ে শাদা ড্রেস, মনে হয় নেভীতে কাজ করে। বুক পকেটে নাম লেখা — রইছুদ্দিন।

রইছুদ্দিন বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছে। আতাহার আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসার চেষ্টা করল। তাতে তেমন উপকার হল না। রইছুদ্দিন সন্দেহভাজন লোকদের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকানোর নিয়ম সেই দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আতাহারের ধারণা, হলুদ দাগ পরা পাঞ্জাবির কারণে ব্যাপারটা ঘটছে। হলুদ দাগ ছাড়াও পাঞ্জাবিতে আরো কিছু ক্রটি আছে। সাইজে খাটো। আজকাল লম্বা পাঞ্জাবির চল হয়েছে। পাঞ্জাবির ঝুল হাঁটু ছাড়িয়ে যত নামবে ততই উত্তম। মনে হয় হাতি-বাগান ঘরবাড়িতে হলুদ দাগ দেয়া খাটো পাঞ্জাবি পরে কেউ আসে না।

'কাকে চান?'

আতাহার লক্ষ্য করল 'কাকে চান' প্রশ্নটা করা হয়েছে তার দিকে না তাকিয়ে। সন্দেহভাজন মানুষের দিকে লোকজন বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু কথা বলার সময় অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আতাহার হাই তুলতে তুলতে বলল,

কাউকে চাই না। আটতলায় আমাদের একটা এপার্টমেন্ট আছে 7/C, ভাড়া ছিল। ভাড়াটে বিদায় করা হয়েছে। আমি যাচ্ছি ইন্সপেকশনে। ভাড়াটে কি কি ক্ষতি করে গেছে তার লিস্ট করতে হবে। নোটবই এবং কলম নিয়ে এসেছি। নোটবই, কলম দেখতে চান?

রইছুদ্দিনের চোখে সন্দেহ আরো ঘনীভূত হল। নোটবই এবং কলম দেখে সে তাকে আটতলায় যেতে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। এই এপার্টমেন্ট হাউসের সিকিউরিটি সিস্টেম খুব কঠিন। একটা মাছিও যদি কোন ফ্ল্যাটে যেতে চায় তাকেও ইন্টারকমে অনুমতি নিতে হবে। এটা আতাহারের কথা না — আতাহারের বাবা রশীদ সাহেবের কথা। তিনি এ জাতীয় কথা বলে ভজিয়ে-ভাজিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়েছিলেন। যাকে ফ্ল্যাট দিয়েছিলেন সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ফ্ল্যাট নিল। কিছুই তার পছন্দ হয় না। নানান প্যাঁচালের কথা বলে।

'লিফট নষ্ট হলে আটতলায় উঠব কিভাবে? আমার আবার হার্টের সমস্যা।'

রশীদ সাহেব বললেন, লিফট নষ্ট হবে কেন? জার্মান ওনাডা কোম্পানীর লিফট। পৃথিবীর সেরা। তাও একটা না, দু'টা।

'কারেন্ট যখন থাকবে না তখন?'

'নিজস্ব জেনারেটার আছে। কারেন্ট চলে গেলে জেনারেটার চালু হবে।'

'আটতলা বেশি উঁচু হয়ে যায়।'

'উঁচুই তো ভাল। যত উঁচুতে উঠবেন তত ফ্রেস বাতাস। মশা-মাছির উপদ্রব নেই। তাছাড়া সিকিউরিটি সিস্টেম দেখবেন না? এত কড়া সিকিউরিটি সিস্টেম বাংলাদেশের কোন এপার্টমেন্ট হাউসে নেই।'

ভদ্রলোক মুখে এমন ভঙ্গি করলেন যা থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তিনি রশীদ সাহেবের কথা বিশ্বাস করলেন না। কাজেই রশীদ সাহেবকে সিকিউরিটি সিস্টেম ব্যাখ্যা করতে হল। দীর্ঘ ব্যাখ্যার পর তিনি বললেন — বুঝলেন ভাই সাহেব, একটা মাছি যদি কোন ফ্ল্যাটে যেতে চায় তাকেও আগে ইন্টারকমে অনুমতি নিতে হবে। এমন অবস্থা।

ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত নিতান্তই অনাগ্রহের সঙ্গে ফ্ল্যাট নিলেন এবং ভাড়া দেয়ার ব্যাপারেও অসীম অনাগ্রহ দেখাতে লাগলেন। চারমাস ভাড়া বাকি পড়ে গেল। তাগাদা দেয়ার দায়িত্ব পড়ল আতাহারের উপর। আতাহার তখন হাড়ে হাড়ে বুঝল সিকিউরিটি সিস্টেম কাকে বলে। সে আসে, ইন্টারকমে ভাড়াটে ভদ্রলোক বলে দেন — দেখা হবে না। দারোয়ানরা তখন আর তাকে উঠতে দেয় না। শুকনো মুখে বাড়িতে ফিরতে হয়। শুকনো মুখে, কারণ রশীদ সাহেবের নিয়ম হচ্ছে একজনের রাগ তাৎক্ষণিকভাবে অন্যজনের উপর ঢেলে দেয়া। ভাড়াটের রাগ পুরোটাই তার উপর আসবে এই ভেবেই মুখ শুকনো।

'কি রে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল?'

'না।'

'না মানে কি? ফ্ল্যাটে ছিল না?'

'ছিল, দেখা করল না। দারোয়ান উঠতে দিল না।'

'তুই ফ্ল্যাটের মালিক, তোকে ফ্ল্যাটে উঠতে দিল না?'

'আমি তো ফ্ল্যাটের মালিক না। বড় আপা মালিক।'

'তার অনুপস্থিতিতে তুই।'

'এইসব আইনের কথা তো দারোয়ান বুঝবে না।'

'বুঝিয়ে বললে বুঝবে না কেন? তুই হচ্ছিস একটা ছাগল, রামছাগল। এই জন্যেই কেউ তোকে পাত্তা দেয় না। মুখের মধ্যে সব সময় একটা চোর চোর ভাব। যা আমার সামনে থেকে। আর শোন, এখন থেকে দাড়ি কামাবি না। দাড়ি ছেড়ে দে। রামছাগলের মত থুতনিতে কয়েকগাছা দাড়ি না হলে তোকে মানাবে না।'

আতাহার পিতৃআজ্ঞা পালন করেছে। দাড়ি কামানো বন্ধ রেখেছে। থুতনিতে কয়েকগাছা দাড়ির বদলে সারামুখময় দাড়ি গজিয়ে গেছে। কাউকে কাউকে দাড়িতে মানায়। তাকে মানাচ্ছে না। দাড়ি রাখার পরেও মুখ থেকে চোর চোর ভাবটা যায় নি। বরং সামান্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে অন্য কিছুও যুক্ত হয়েছে। সেই অন্য কিছু — শুভ না, অশুভ ধরনের। এপার্টমেন্টের ছোকরা যে কারণে গোড়া থেকেই তাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। সে তাকে 7/C ফ্ল্যাটে যেতে দেবে না, বলাই বাহুল্য। বাবার আরো কিছু কঠিন কথা শুনতে হবে। রিটায়ার করার পর কোন মানুষই তার বেকার ছেলেপুলে সহ্য করতে পারে না। এটা দোষের কিছু না, এটাই স্বাভাবিক। আতাহার তাতে কিছু মনে করে না। তবে রশীদ সাহেব ইদানীং যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুরু করেছেন তা সহ্য করা কঠিন। দীর্ঘদিন মেয়ে স্কুলে যেসব পুরুষ মাস্টারি করে তাদের স্বভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কি করে যেন ঢুকে যায়। তারা স্বাভাবিকভাবে কথাই বলতে পারে না।

আতাহার পাঞ্জাবির পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে বলল, এই যে দেখুন চাবি নিয়ে এসেছি, প্রমাণস্বরূপ যে ফ্ল্যাটটা আমাদের। তাছাড়া আমি আগেও অনেকবার এসেছি। আপনার সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছে। তখন আমার দাড়ি ছিল না। মাস তিনেক হল দাড়ি রেখেছি। চেহারা বদলে গেছে বলে আপনি চিনতে পারছেন না। দয়া করে দাড়ি ছাড়া আমাকে কল্পনা করুন। চিনতে পারবেন। এখন কি আমি যাব উপরে?

'যান।'

'লিফটে করে যেতে পারব, না হেঁটে হেঁটে উঠতে হবে?'

এপার্টমেন্ট হাউসের ছোকরা কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। এর বোধহয় রসবোধ নেই। রসিকতা ধরার ক্ষমতা বিবর্জিত মানুষ। রসিক মানুষদের সঙ্গে রসিকতা করে কোন আরাম নেই। রসবোধহীন মানুষদের সঙ্গে রসিকতা করাতেই বেশি আনন্দ।

সব লিফটেই বাথরুমের মত আয়না থাকে। এই লিফটে নেই। সুন্দর ছিমছাম লোহার ঘর। কয়েকটি বাতি জ্বলছে, নিভছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। আতাহারের

কাছে মনে হল এক্সস্ট ফ্যান, কারণ গায়ে বাতাস লাগছে না। এই ফ্যানের কাজ সম্ভবত লোহার ঘর থেকে দুষিত বাতাস বের করে দেয়া।

লিফট তিন তলায় থামল, দরজা খুলে গেল। লিফটের খোলা দরজার সামনে উনিশ–কুড়ি বছরের এক তরুণী। সে লিফটের ভেতর আতাহারকে দেখে ইতঃস্তত করছে — উঠবে কি উঠবে না। লোহার এই ঘরে দাড়িগোঁফওয়ালা এই যুবকের সঙ্গে ভ্রমণ করা কি ঠিক হবে? মেয়েটি শেষ পর্যন্ত উঠল। নিজেকে যথাসম্ভব এক কোণায় নিয়ে গেলো। হিংস্র জন্তুর সঙ্গে ভ্রমণের সময় এ জাতীয় সাবধানতা মানুষ নিয়ে থাকে। আতাহারের ইচ্ছা করছে দাঁত–মুখ খিঁচিয়ে ঘ্যাঁও জাতীয় কোন শব্দ করে মেয়েটাকে ভয় দেখাতে। মজিদ থাকলে অবশ্যই এই কাজটা করত। কোন না কোন ভাবে ভয় দেখাতোই। আতাহার নিরীহ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আছে। এক পলকের জন্যেও চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। এতেও কাজ হবে। ভয় পাবে। মেয়েদের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকলেও তারা ভয়ে অস্থির হয়। মেয়েটা তাকে অপমান করেছে। লিফটে তাকে দেখে প্রায় আঁৎকে ওঠার ভঙ্গি করেছে। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাব করেছে, কাজেই মেয়েটার শাস্তি প্রাপ্য। সাধারণ শাস্তি। পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকা। মেয়েটার নাম কি? নাম জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? নাম নিশ্চয়ই বলবে না। ধরা যাক তার নাম বেহুলা। লোহার ঘরে যেহেতু দেখা, সেহেতু বেহুলা নামটাই মানানসই। লিফট থেকে নেমে যাবার সময় সে কি বলবে — বেহুলা! আনন্দময় কিছু সময় তোমার সঙ্গে কাটলো। তোমাকে ধন্যবাদ?

লিফট থেকে নামার সময় আতাহার বেহুলার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলো। বেহুলা তাতে যে ভাবে চমকালো সেও এক দর্শনীয় দৃশ্য। মেয়েটা যাচ্ছে কোথায়? ছাদে? তিন তলা থেকে উঠেছে। ছাদে যাচ্ছে। ভরদুপুরে ছাদে যাবে কেন?

আতাহার কয়েক মুহূর্ত ব্যয় করল মন স্থির করতে। সে কি করবে — আপার ফ্ল্যাটের দরজা খুলবে, না ছাদে গিয়ে মেয়েটিকে আরেকবার চমকে দেবে? ছাদে যাবার পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত বাতিল করল। বেহুলার জন্যে এতটা ঝামেলা করা ঠিক হবে না।

তালা খুলে আতাহার ঘরে ঢুকেই প্রথম যে কাজটা করল তা হচ্ছে — গায়ের পাঞ্জাবি খুলে ফেলল। ফাঁকা ফ্ল্যাট। এই ঘরে উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কারো কিছু বলার নেই।

ভাড়াটে কি কি ক্ষতি করেছে তার লিস্ট করতে হবে। তেমন কোন ক্ষতি করেছে বলে মনে হচ্ছে না। প্লাস্টিক পেইন্টের দেয়ালে প্রচুর আঁকি–বুকি আছে। সে তো থাকবেই — বাচ্চা–কাচ্চা থাকবে আর তারা দেয়ালে ছবি আঁকবে না তা হয় না। শিশুর কাছে দেয়াল হচ্ছে খাতার বড় একটা শাদা পাতা। সেখানে সে তো ছবি আঁকবেই।

দু'টি বাথরুমের একটির কমোডের ঢাকনা ভাঙা। এমন কিছু ভয়াবহ ব্যাপার না। শোবার ঘরের জানালার কপাট খুলে এসেছে। ভাড়াটে টানাটানি করে খুলেছে এরকম মনে

করার কোন কারণ নেই। আগেই নিশ্চয় খোলা ছিল।

রান্নাঘরের অবস্থা অবশ্যি শোচনীয়। রান্নাঘরের সবই ভাঙা। মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাঙা হয়েছে। ভাড়াটের মনে হয় রান্নাঘরের উপরই রাগটা বেশি ছিল। পয়েন্ট বাই পয়েন্ট নোটবুকে লেখাও সম্ভব না। ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে ছবি তুলে রাখা যেতে পারে। রান্নাঘরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আতাহারের ক্লান্তি বোধ করল। চায়ের পিপাসা পেল।

দু'টার মত বাজে। বাসায় ফিরে খেয়ে দেয়ে লম্বা ঘুম দিতে ইচ্ছা করছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির পূর্ণ বিবরণ না নিয়ে বাড়ি যাওয়া সম্ভব না। আজ ছুটির দিন — বাবা বারান্দায় অতি বিরক্ত ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। ছুটির দিন না হয়ে অন্যদিন হলে — এই সময়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীনিদের সেকেন্ড ব্যাচের কর্মকাণ্ড শুরু হয়। রিটায়ার্ড হেড মাস্টার সাহেব তিন ব্যাচে ছাত্রীদের ইংরেজি শেখান। তিনটা থেকে পাঁচটা এক ব্যাচ, পাঁচটা থেকে সাতটা সেকেন্ড ব্যাচ, সাতটা থেকে নয়টা লাস্ট ব্যাচ। এক এক ব্যাচে পনেরোজন করে ছাত্রী। প্রত্যেককে দিতে হয় পাঁচশ করে। মাসে কুড়ি হাজার টাকার মত রোজগার। মন্দ কি?

আতাহার নোটবই বের করল। বল পয়েন্ট কালি ছাড়ছে না। নতুন কলম, আসার পথে কিনে আনা। নোটবইটাও নতুন। নীল রঙের প্লাস্টিকের মলাটে সুন্দর একটা খাতা। এরকম সুন্দর একটা খাতার শুরুটা হবে — ক্ষতির বিবরণ দিয়ে? প্রথম পৃষ্ঠায় একটা কবিতা থাকাটাই কি বাঞ্ছনীয় নয়? লিফট নিয়ে একটা কবিতা। লিফট হচ্ছে এমন একটা ঘর যা বড়ই অস্থির। ক্লান্তিহীনভাবে উঠা-নামা করছে। আতাহার শোবার ঘরের ঠাণ্ডা মেঝেতে এলিয়ে পড়ল। বুকের নিচে বালিশ থাকলে উপুড় হয়ে লিখতে আরাম হত। নিজের টাকাপয়সা হলে সে বেশ কিছু কবিতা লেখার বালিশ নেবে। বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন মাপের বালিশ। ভেলভেটের কাভার। একেক বালিশের একেক রঙ — নেভী ব্লু, স্কাই ব্লু, রেড, পার্পাল, মেজেন্টা, ভায়োলেট। সে আবার উপুড় হয়ে বুকের নিচে বালিশ না দিয়ে কবিতা লিখতে পারে না। মজিদ তাকে ঠাট্টা করে ডাকে — উপুড় কবি। সে নিজে হচ্ছে চিৎ কবি। সে নাকি চিৎ হয়ে আকাশের দিকে না তাকিয়ে কবিতার লাইন গোছাতে পারে না।

আতাহার নোটবুকে গোটা গোটা অক্ষরে লিখছে —

কপাটহীন একটা অস্থির ঘরে তার সঙ্গে দেখা।
লোহার তৈরি ছোট্ট একটা ঘর।
বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোন যোগ নেই।
ঘরটা শুধু উঠছে আর নামছে।
নামছে আর উঠছে।
মানুষ ক্লান্ত হয় —
এ ঘরের কোন ক্লান্তি নেই।
এ রকম একটা ঘরেই বোধহয় বেহুলার বাসর হয়েছিল।

নিশ্ছিদ্র লোহার একটা ঘর।
কোন সাপ সেখানে ঢুকতে পারবে না।
হিস হিস করে বলতে পারবে না, পাপ করো। পৃথিবীর সব আনন্দ পাপে।
পুণ্য আনন্দহীন। উল্লাসহীন।
পুণ্য করবেন আকাশের ফিরিশতারা।
কারণ পুণ্য করার জন্যেই তাদের তৈরি করা হয়েছে।
লোহার সেই ঘরে ঢোকার জন্যে সাপটা পথ খুঁজছিলো।
সেই ফাঁকে বেহুলা তাঁর স্বামীকে বললেন, কি হয়েছে, তুমি এত ঘামছ কেন?
আর তখন একটা সুতা সাপ ঢুকে গেল।
ফিসফিস করে কোন একটা পরামর্শ দিতে গেলো।
বেহুলা সেই পরামর্শ শুনলেন না বলেই কি লখিন্দরকে মরতে হল?

তার সঙ্গে আমার দেখা কপাটহীন একটা অস্থির ঘরে।
ঘরটা শুধু ওঠে আর নামে।
আমি তাকে বলতে গেলাম — আচ্ছা শুনুন, আপনার কি মনে হচ্ছে না
এই ঘরটা আসলে আমাদের বাসর ঘর?
আপনি আর কেউ নন, আপনি বেহুলা।
যেই আপনি ভালবেসে আমাকে কিছু বলতে যাবেন
ওম্নি একটা সুতা সাপ এসে আমাকে কামড়ে দেবে।
আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। দয়া করে কিছু বলবেন না।

কবিতা শেষ করেই আতাহারের ঘুম পেয়ে গেলো। সব সময় এরকম হয়। এমন ক্লান্তি লাগে। এ জন্যেই কবিতা লেখার জন্যে তার বালিশ দরকার। কবিতা শেষ হবে — বুকের নিচ থেকে বালিশ টেনে মাথার নিচে দিয়ে লম্বা ঘুম। আজ বালিশ নেই। শক্ত মেঝেতে মাথা রেখেই তাকে ঘুমাতে হবে। চারদিকে সুনসান নীরবতা। ঠাণ্ডা মেঝে, ভাঙা জানালা দিয়ে আরামদায়ক হাওয়া আসছে — আতাহার ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুমুলো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ঘর পুরোপুরি অন্ধকার। বারান্দায় বাতি জ্বলছে। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর ক্ষীণ রেখা মেঝেতে এসে পড়েছে। পিন পিন করছে রাজ্যের মশা। আটতলায় মশা উঠতে পারে না, এই তথ্য তারা ভুল প্রমাণ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে তারা লিফট ব্যবহার করে আটতলায় উঠে এসে কবির রক্তপান করেছে।

আতাহার ঘর বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। রইছুদ্দিন এখনো আছে। সব কিছুর দিকেই সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। আতাহারের দিকে তাকিয়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। আতাহার এগিয়ে গেল। এমন ভঙ্গিতে এগোল যেন অতি পরিচিত কোন বন্ধুর হাসিমুখ দেখে এগুচ্ছে।

'ভাইসাহেব, আমাকে চিনছেন তো? সেভেন সি। ফ্ল্যাট দেখতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। টানা একটা ঘুম দিলাম। এখন ফ্রেস লাগছে।'

রইছুদ্দিনের ভুরু আগে থেকেই কুঁচকে ছিল, এখন আরো কুঁচকে গেল। আতাহার গলার স্বর নামিয়ে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে বলল, তিনতলার ঐ মেয়েটার নাম কি? শ্যামলা মত, লম্বা, লালচে ধরনের চুল।

'ইশরাত আপা।'

'ও আচ্ছা, ইশরাত আপা। উনাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ে দেবেন। বলবেন খুব শিগ্‌গিরই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

রইছুদ্দিন তাকিয়ে আছে। আতাহার রওনা হয়েছে রাস্তার দিকে। কোথায় যাবে এ ব্যাপারে সে এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

জাপানের ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। জাপান-বাংলা সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যে সাংস্কৃতিক দল কবে যাত্রা করছে জানা দরকার। দলের নেতা ময়না ভাই অতিশয় ধুরন্ধর ব্যক্তি। তাঁর কাছে নিয়মিত হাজিরা দেয়া দরকার। নয়ত শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে তবলাবাদক হিসেবে অন্য কেউ চলে গেছে।

ময়না ভাইকে রাত এগারোটার আগে কখনো পাওয়া যায় না। তাঁর বেশ কয়েকটা আড্ডার জায়গা আছে। তার কোনটাতে কখন থাকবেন তা কেউ বলতে পারে না। তাঁকে পেতে হলে সব ক'টা আস্তানায় একবার করে টুঁ মারতে হবে। সবচে' কাছের আস্তানা হল — বিজয় নগরে সিনেমার অফিস পাড়া।

আতাহারের শরীর ঝিমঝিম করছে। দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি। ময়না ভাইয়ের সন্ধানে যাবার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। নানরুটি-শিক কাবাব খাওয়া যায়। সস্তার দোকানের নানরুটি এবং শিক কাবাব উপাদেয় হয় এবং অনেকক্ষণ পেটে থাকে — হজম হতে চায় না।

আতাহারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ময়না ভাইকে নিউ মুভিজের অফিস ঘরে পাওয়া গেল। টেবিলে পা তুলে চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। ঘরে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। শুকনো মুখে অফিসের পিওন বসে আছে। তাঁর মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ঈষৎ লাল। ময়না ভাই সিগারেট খান না, কিন্তু আজ তাঁর ঠোঁটে সিগারেট। সবই খুব ভাল লক্ষণ। ময়না ভাই মদের ঘোরে যখন থাকেন তখন খুব ভাল থাকেন। সবার সঙ্গে অতি মধুর ব্যবহার করেন। আতাহারকে দেখে ময়না ভাই ধমক দিয়ে উঠলেন, তোর ব্যাপারটা কি রে আতা? একেবারে দেখি ফ্লাওয়ার অব ডুমুর হয়ে গেছিস? তুই আমার পিছে ঘুরবি, না আমি তোর পিছে পিছে ঘুরব?

ময়না ভাই মহা বিরক্ত হয়ে সিগারেটে টান দিলেন। আতাহার হাসল। তিনি বললেন, খবরদার, দাঁত কেলিয়ে হাসবি না।

'জাপানের ব্যাপারটা কিছু হয়েছে ময়না ভাই?'

'অবশ্যই হয়েছে। হবে না মানে? আমার নাম ময়না। যা ধরি ছাড়ি না। আঠারো জনের দল যাবে। এর মধ্যে তোকে নিয়ে সাতজন হচ্ছে ফলস। তোরা টোকিওতে গিয়ে যার যার পথ ধরবি।'

'ভিসা কবে হবে?'

'পনেরো তারিখে ভিসার জন্যে কাগজপত্র জমা দিব। তোর পাসপোর্ট হয়েছে?'

'না।'

'এখনো পাসপোর্ট হয়নি আর তুই দাঁত কেলিয়ে হাসছিস? তিনদিনের ভেতর পাসপোর্ট বের করে আমাকে দিয়ে যাবি।'

'আচ্ছা।'

'একেকজন আমার জান ফানা করে দিচ্ছে আর তোর কোন হুঁস নেই। গরজটা কার? তোর না আমার?'

'আমার।'

'বোস। দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

আতাহার বসল। ময়না ভাই আক্ষেপের গলায় বললেন, লোকজন আমাকে বলে — মানুষ পাচারের যন্ত্র। অথচ কেউ বুঝে না আমি করছি দেশের সেবা। বেকার যুবক পার করে দিচ্ছি, তারা হার্ড ফরেন কারেন্সি পাচ্ছে। দেশের উন্নতি হচ্ছে। আমি যা করছি তার নাম দেশসেবা। ঠিক কি-না?'

'ঠিক তো বটেই।'

'এটা তো তুই হাসিমুখে বললি — "ঠিক তো বটেই"। আবার আড়ালে গিয়ে বলবি "শালা ফটকাবাজ"। বললেও কিছু যায় আসে না। আমি নিজের মত কাজ করি। যার যা ইচ্ছা আমাকে বলুক। যার ইচ্ছা শালা বলুক। তুই কিছু খাবি, আয়। মুখ শুকনা লাগছে।'

'কিছু খাব না ময়না ভাই।'

'তোর মত বেকার যুবকদের শুকনা মুখ যখন দেখি তখন মনটা খারাপ হয়। ধান্দাবাজি করে তোদের বিদেশে নিয়ে যাই। অন্যায় যা করি হিউমেনিটারিয়ান গ্রাউন্ডে করি। যাই হোক, শোন, চার লাখ টাকার জোগাড় কর। পারহেড আমি সাত করে নিচ্ছি। তোর অবস্থা তো জানি। তোর জন্যে চার। বাকি তিন জাপান গিয়ে দিবি। ভাবিস না টাকাটা আমার পকেটে যাচ্ছে — খরচপাতি আছে। টাকা যা নেই সবটাই খরচ হয়ে যায়। কাল রাতে বাসায় ভাত খেয়েছি কি দিয়ে জানিস?'

'কি দিয়ে?'

'ডালের চচ্চড়ি আর টেংরা মাছের ঝোল। ঢাকা শহরের যে রিকশাওয়ালা তার বাড়িতেও এরচে' ভাল রান্না হয়। যাই হোক, আমার কোন কমপ্লেইন নাই। রিজিকের মালিক আল্লাহপাক। আল্লাহপাক যদি আমার জন্যে টেংরা মাছের ব্যবস্থা করেন — আমার তো করার কিছু নেই। ঠিক না?'

'জ্বি, ঠিক তো বটেই।'

'এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা জোগাড় কর। সবাই দিয়ে ফেলেছে, শুধু তুই বাকি।'

'চার লক্ষ টাকা আমি পাব কোথায় ময়না ভাই?'

'তুই কোথায় পাবি সেটা আমি কি জানি? বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ধার নে। জাপানে গিয়ে মাসে দেড় লাখ থেকে দু'লাখ টাকা চোখ বন্ধ করে কামাবি। সাত বছরের মাথায় কোটিপতি। শুরুর ইনভেস্টমেন্ট সেই তুলনায় কিছুই না। চার জোগাড় করতে পারবি না?

'মনে হয় না।'

'গাধামি করিস না। এই সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না। চান্স অব লাইফ টাইম। তোকে স্নেহ করি বলেই সুযোগটা দিলাম — আচ্ছা যা, তিন লাখ ব্যবস্থা কর। তোর শুকনা মুখ দেখে মায়া লাগছে। বাকিটা জাপানে চাকরি করে শোধ দিস। দুই পারবি না?'

'পারব।'

'গুড। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাটা দিয়ে যাস। কবিতা লিখছিস তো?'

'হুঁ।'

'ভেরী গুড। সুকুমার বৃত্তির চর্চা রাখবি। টাকাটাই জগতের সব না। আসল হল আত্মা। আরেকটা উপদেশ দেই, মন দিয়ে শোন — ফস করে জাপান যাবার আগে বিয়ে করে বসবি না। বউ নিতে পারবি না, কিচ্ছু হবে না — মাঝখান দিয়ে বেড়াছেড়া হয়ে যাবে। বরং জাপানে গিয়ে দেখেশুনে একটা জাপানি মেয়ে বিয়ে করতে পারিস। হাউস ওয়াইফ হিসেবে জাপানি মেয়ের তুলনা নেই। অসাধারণ। স্বামীর সুখের জন্য এরা জীবন দিয়ে দেয়। তাদের যতই অত্যাচার করা হোক, মুখে পুতুলের মত হাসি লেগেই থাকে।'

ময়না ভাই উঠে দাঁড়ালেন। ঘড়ি দেখলেন। তাঁর আড্ডার স্থান বদলানোর সময় হয়েছে। তিনি এখন অন্য কোথাও যাবেন।

'আতাহার, তুই যাবি কোথায়?'

'বাসায় যাব।'

'বাসায় যাবি তো বটেই — বাসাটা কোথায় বল, তোকে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

'শ্যামলী লিংক রোড।'

'এক্কেবারে উল্টো দিক। যাই হোক, চল নামিয়ে দিয়ে যাই।'

ময়না ভাই ভাঙা লক্কর একটা মাইক্রোবাসে চলাফেরা করেন। মাইক্রোবাস ভাঙা হলেও তার জানালায় বাহারী পর্দা। বাইরের কেউ গাড়ির ভেতরে কি হয় দেখতে পারে না। তার প্রয়োজন আছে — মদ্যপানের ব্যাপারটা ময়না ভাই বেশির ভাগ সময় গাড়িতে সারেন। চলন্ত অবস্থায় মদ্যপানের মজাই নাকি অন্য রকম।

কবি

আতাহারের মা সালমা বানু গত এক মাস হল হাসপাতালে। তাঁর অসুখটা যে কি ডাক্তাররা ধরতে পারছেন না। শুরুতে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা হল। এখন সেই চিকিৎসা বন্ধ করে নানান ধরনের টেস্ট করানো হচ্ছে। একই টেস্ট কয়েক জায়গা থেকে করানো হচ্ছে। রেজাল্ট একেক জায়গা থেকে একেক রকম আসছে। ডাক্তাররা তাতে বিরক্ত বা বিস্মিত হচ্ছেন না। এটাই স্বাভাবিক ধরে নিয়েছেন। দু'জন ডাক্তারের ভেতর একজন মনে করছেন কিডনিঘটিত কোন জটিলতা। রক্তের দুষিত অংশ পরিষ্কার করার পর কিডনি আবার তা রক্তেই ফেরত পাঠাচ্ছে। অন্যজন বলছেন কিডনি খুব ভাল অবস্থায় আছে। সমস্যা অন্য কোথাও। সেই অন্য কোথাওটা কি তা বলতে পারছেন না।

সালমা বানু ঘোরের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। আচ্ছন্ন অবস্থা। মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে যায়, তখন কৌতূহলী চোখে চারপাশে তাকান। লোকজনের কথা শুনেন। নিজেও কথা বলেন। এই সময় কথা শুনতে ও বলতে তাঁর ভাল লাগে। শব্দগুলি ঝন ঝন করে কানে বাজে। নিজের গলার শব্দও নিজে চিনতে পারেন না। মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে। এই রকম সময় তাঁর বেশি আসে না। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, যখন আসে তখন আশেপাশে কথা বলার মত কেউ থাকে না। তখন তিনি একা একাই কথা বলেন,শব্দ করে হাসেন। এই অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে পাগল ভাবতো। এখনো কেউ দেখেনি। শুধু মতির মা দেখেছে। মতির মা বুয়া আঠারো বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আছে। তার সুবিধা হচ্ছে সে কোন কিছুতেই বিস্মিত হয় না। সালমা বানুর একা একা কথা বলাটাকে সে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে।

গতকাল গভীর রাতে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল। শরীর ফুরফুরে হালকা বোধ হতে লাগল। মনে হল নিজেই হেঁটে হেঁটে বাথরুমে যেতে পারবেন। তাঁর বেশ ক্ষুধাবোধও হল। মুড়ির মোয়া খেতে ইচ্ছে করল। ছোট ছোট মোয়া যা আস্ত মুখের ভেতর ফেলে দিয়ে পেয়ারার মত কচ কচ করে চিবানো যায়। এত কিছু থাকতে মুড়ির মোয়া খেতে ইচ্ছে হচ্ছে কেন তিনি বুঝতে পারছেন না। তবে তাঁর লজ্জা লজ্জা লাগতে লাগল। এই বয়সে কোন তুচ্ছ খাদ্যদ্রব্যের প্রতি লোভ হওয়া লজ্জারই ব্যাপার। তার মাথার কাছে লোহার ডেস্ক ধরনের টেবিলে অনেক ফল-টল সাজানো — আপেল, কমলা, আঙুর, বড় বড় সাইজের সাগর কলা। এর কোনটাই তাঁর খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কচকচ শব্দে মুড়ির মোয়া খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। অসুস্থ সময়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলিও সম্ভবত অসুস্থ।

রাত ক'টা বাজে তাঁর জানার ইচ্ছে হল। তাও জানার উপায় নেই। কেবিন ঘরে কোন

ঘড়ি নেই। আতাহার যখন এসেছিল তাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাকে বললে সে তক্ষুণি গিয়ে একটা ঘড়ি এনে এমনভাবে বসিয়ে দিত যেন তিনি চোখ মেললেই সময় দেখতে পান। অসুস্থ মানুষ ঘড়ি দেখতে ভালবাসে হাসপাতালের লোকজন বোধহয় এই তথ্য জানে না।

সালমা বানু ঘাড় কাত করে কেবিন ঘরটা দেখতে চেষ্টা করলেন। কত অসংখ্যবার এই ঘর দেখা, তারপরেও প্রতিবারই ঘরটা তাঁর নতুন মনে হয়। যেমন বাথরুমের দরজাটা এর আগের বার তাঁর মনে হয়েছিল কাঠের, এবার দেখলেন শাদা রঙ করা দরজা। এমনকি হতে পারে তাঁর তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এরা বাথরুমের দরজা রঙ করে ফেলেছে? না বোধ হয়। তাহলে নতুন রঙের গন্ধ নাকে লাগতো। তিনি কোন গন্ধ পাচ্ছেন না। ফিনাইলের গন্ধও না। শুধু ছড়ছড় শব্দে বাথরুম থেকে পানি পড়ার শব্দ আসছে। বাথরুমে পানি পড়ার শব্দ সবসময়ই বিরক্তিকর। আজ বিরক্তিকর লাগছে না, বরং শব্দটা শুনতে ভাল লাগছে। তিনি পাশ ফিরলেন। এতেও আশ্চর্য বোধ করলেন। পাশ ফেরার শক্তিও তাঁর নেই। আজ বেশ স্বাভাবিকভাবে পাশ ফিরলেন।

মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে মতির মা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা অন্যায় হবে। গভীর ঘুম থেকে কাউকে ডাকতে নেই। তবু সালমা বানু ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন, মতির মা ! মতির মা !

মতির মা ধড়মড় করে উঠে বসল। তার উদ্বিগ্ন চোখ দেখে সালমা বানুর খারাপ লাগছে। তাঁর কথা বলার ইচ্ছা করছে বলেই তিনি মতির মাকে ডেকেছেন, অন্য কিছু না।

'কি হইছে আম্মা?

'কিছু না।'

মতির মা এসে কপালে হাত রাখল। মতির মা'র হাতে হলুদ বাটার গন্ধ। মতির মা দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে তার সঙ্গে আছে। হলুদ বাটছে না। তারপরেও তার হাতে হলুদের গন্ধ কেন কে জানে ! জ্বর সামান্য আছে, ভয় পাবার মত কিছু না।

'পানি খাব, মতির মা।'

মতির মা বোতল থেকে গ্লাসে পানি ঢালছে। তার হাত কাঁপছে। ঘুম থেকে সে পুরোপুরি জাগেনি। কিংবা হঠাৎ ঘুম ভাঙার ভয় এখনো কাটেনি।

'আজ কি বার মতির মা?'

'রবিবার। আম্মা, আপনের শইল খারাপ লাগতাছে? ডাক্তাররে খবর দিমু?'

'শরীর ঠিক আছে।'

শরীর ঠিক আছে বললেও সালমা বানু বুঝলেন তাঁর শরীর ঠিক নেই। পানি খেতে তেতো লাগছে। অসুস্থ মানুষের কাছে পানি সব সময় তেতো বোধ হয়। পানি যার কাছে যত স্বাদু মনে হবে সে তত সুস্থ।

'বাসার খবর কিছু জান মতির মা?'

'বাসার খবর ভাল আম্মা। ছোড আফা মন লাগাইয়া পড়তাছে।'

'পরীক্ষা শুরু হবে কবে?'

'হেইটা আম্মা জানি না।'

সালমা বানু ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেললেন। মেয়েটা অনেক দিন তাঁকে দেখতে আসছে না। বোঝা যাচ্ছে পরীক্ষা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। কিংবা হয়ত এসেছে, এমন সময় এসেছে যখন তিনি আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন। মতির মা বলল, সক্কালে ছোট আফা আসছিল। আফনে ঘুমের মধ্যে ছিলেন আফনেরে জাগনা করে নাই। ডাক্তার জাগনা দিতে নিষেধ দিছে।

'মিলি আছে কেমন?'

'খুব ভাল আছে। আফনের জন্যে চিডি নিয়া আসছিল।'

'কোথায় চিঠি?'

'আফনের বালিশের নিচে আছে।'

তিনি হাত বাড়িয়ে বালিশের নিচ থেকে খাম বের করলেন। খামের মুখ খোলা হয়নি। এর আগেও মনিকার দু'টা চিঠি এসেছে। দু'টারই খামের মুখ খোলা ছিল। তিনি বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। একজনের চিঠি আরেকজন খুলবে কেন? মনিকা হয়ত এমন কিছু তাঁকে লিখতে চেয়েছে যা অন্যের জানা উচিত না। যা শুধু মা'ই জানতে পারেন।

'মতির মা!'

'জ্বি আম্মা।'

'এইটা কি মাস?'

'এইটা হইল আম্মা ফালগুন। কিছু খাইবেন আম্মা?'

'না, কিছু খাব না। মাথার কাছের বাতিটা জ্বেলে দাও তো।'

'মাথার কাছে আম্মা কোন বাতি নাই। ঘরে একটাই বাতি।'

তিনি আবারো নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি যে হাসপাতালে আছেন তা তাঁর মনে থাকে না। প্রায়ই মনে হয় নিজের ঘরেই শুয়ে আছেন। তাঁর নিজের ঘরে মাথার কাছে একটা টেবিল ল্যাম্প আছে। বড় মেয়ের চিঠি গভীর রাতে মাথার কাছের এই টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়েন। মেয়েটার কথা মনে করে তিনি তখন কিছুক্ষণ কাঁদেন।

মনিকা অবশ্যি গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারে না। প্রয়োজনীয় কথার চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কথায় তার চিঠি ভর্তি থাকে। অসংখ্য খবর থাকে। সব খবর এলোমেলোভাবে লেখা। হাতের লেখাও খুব খারাপ। ঘরের কম আলোয় মনিকার চিঠি পড়া যাবে কিনা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিনি খাম খুললেন।

আম্মা,

আমার সালাম নিবেন। আমি এর আগে আপনাকে তিনটি চিঠি লিখেছি। কোন চিঠির জবাব পাই নাই। আপনার পক্ষে হয়ত জবাব দেয়া সম্ভব না। কিন্তু আপনার হয়ে অন্য কেউও তো জবাবটা দিতে পারে। মিলি তো পারে! মিলিকে আমি পৃথক চিঠি দিয়েছি, সে তারও জবাব দেয় নাই। আসলে আমার ব্যাপারে

আপনাদের কারোরই কোন রকম আগ্রহ নাই। আমি বেঁচে থাকলেই কি? মরে গেলেই কি?

আপনার চিকিৎসার জন্য আমি বাবার ঠিকানায় দু'শ ডলারের একটা ব্যাংক ড্রাফট পাঠিয়েছিলাম। আমি লিখে দিয়েছিলাম ব্যাংক ড্রাফটের প্রাপ্তি কথাটা যেন আমাকে না লেখা হয়। নিষেধ করার পরেও বাবা সেই কাজটা করেছেন। বিরাট চিঠি লিখে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এদিকে টাকাটা আমি আপনাদের জামাইকে না জানিয়ে পাঠিয়েছিলাম। সে বাবার লেখা চিঠি পড়ে খুব গম্ভীর। আমাকে বলল — মা'র চিকিৎসার খরচ দিতে চাও খুব ভাল কথা। খরচ দিবে। মেয়ে মা'র অসুখের খরচ দিবে না তো কে দিবে? কিন্তু আমাকে জানিয়ে পাঠাতে অসুবিধা কি? আমি কি তোমাকে নিষেধ করতাম? তোমার মা তো আমারো মা।

এই হল মা আমার অবস্থা। ঢাকায় আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িটা নিয়েও আপনার জামাইয়ের সঙ্গে সমস্যা হচ্ছে। আপনার জামাইয়ের ধারণা, ভাড়াটে ভাড়া ঠিকই দিচ্ছে — আমাদের মিথ্যা করে জানানো হচ্ছে ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। মা, আপনি ঐ ফ্ল্যাট বিক্রির ব্যবস্থা করে ওর নামে সোনালী ব্যাংকে যে একাউন্ট আছে সেই একাউন্টে টাকাটা জমা করে দিবেন। আমার ফ্ল্যাট বাড়ির দরকার নাই। তাছাড়া আপনার জামাই দেশে ফিরবে না। বিদেশেই স্থায়ী হবে।

ও নিজে বাবাকে এই বিষয়ে পৃথক চিঠি দিয়েছে। মা, আমি আপনাদের জন্যে সর্বদাই দুঃশ্চিন্তায় অস্থির থাকি। আতাহারকে আমেরিকা নিয়ে আসার চেষ্টা আমি করে যাচ্ছি। এখানকার পত্রিকায় প্রায়ই পাওয়া যায় আমেরিকান সিটিজেনশীপ পাওয়া বাংলাদেশের মেয়ের জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে। আমি তার সব ক'টিতে যোগাযোগ করি। আতাহারকে বলেছিলাম তার কিছু রঙিন ছবি পাঠাতে। সে তার উত্তর দেয় নাই। আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, কেউ আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখে না?

আম্মা, আমি খুব মানসিক অশান্তির মধ্যেও আছি। তোমার নাতনী ফারজানা এখন এক কালো ছেলের সঙ্গে ডেট করছে। ছেলেটা দেখতে দানবের মত। যখন দরজার কড়া নাড়ে তখন মনে হয় দরজা খুলে পড়ে যাবে। এই হারামজাদা রোজ সন্ধ্যায় এসে ফারজানাকে ডেটিং-এ নিয়ে যায়। আমি বলে দিয়েছি দশটার মধ্যে মেয়েকে বাসায় পৌঁছে দিতে। সে দিন এসেছে রাত তিনটায়। আমি খুব হৈ-চৈ করেছি। এতে ফারজানা আমার উপর বিরক্ত হয়ে বলেছে সে আমার সঙ্গে থাকবে না। আলাদা এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকবে। চিন্তা করেন অবস্থা! গরিলার মত ছেলের মধ্যে সে কি দেখেছে একমাত্র আল্লাহপাক জানেন। কি বিপদে যে আমি পড়েছি! একদিকে আপনার জামাই, অন্যদিকে ফারজানা আম্মা, আপনি অবশ্যই নফল নামাজ পরে ফারজানার জন্যে দোয়া করবেন। যেন দৈত্যটার হাত থেকে মেয়েটা উদ্ধার পায়।

ইতি মনিকা

'মতির মা !'

'জ্বি।'

'আতাহার আমাকে দেখতে আসে না?'

'ও আল্লা, আসে না আবার ! এক-দুইদিন পরে পরেই আসে। ভাইজান যখন আসে তখন আফনে থাকেন ঘুমে।'

মতির মা'র এই কথাগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আতাহার গত এক মাসে দু'বার মাত্র এসেছিল। রোগীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখার জন্যে মিথ্যা বলতে হয়। এতে দোষ হয় না।

'আতাহার আছে কেমন?'

'ভালই আছে আম্মা। আপনার অবস্থা দেইখ্যা খুব পেরেশান।'

'দুশ্চিন্তা করছে খুব?'

'দুশ্চিন্তা বলে দুশ্চিন্তা। ভাইজানের বলতে গেলে ঘুম হারাম।'

'অসুখ-বিসুখে সে সব সময় অস্থির হয়।'

'ভাইজান দাড়ি রাখছে গো আম্মা।'

'দাড়ি রেখেছে ! কেন?'

'ওখন ভাইজানরে আরো সুন্দর লাগে।'

সালমা বানু রাগী গলায় বললেন, সুন্দর লাগলেও হুট করে দাড়ি রাখবে কেন? আমাকে আরেকটু পানি দাও তো মতির মা।

মতির মা পানি এনে দিল। এক চুমুক খেয়েই তিনি গ্লাস ফেরত দিলেন। পানি আরো তিতা লাগছে। মনে হচ্ছে পানিতে নিমপাতার রস হালকা করে মিশিয়ে দিয়েছে।

'মতির মা !'

'জ্বি আম্মা।'

'তোমার খালুজান আছেন কেমন?'

'ভাল আছেন আম্মা।'

'তাঁর বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট তো আম্মা হইবই।'

'উনার বয়স হয়েছে তো। এই বয়সে শরীর সেবা-যত্ন চায়। উনার দেখাশোনার কেউ নাই।'

'ছোট আফা আছে। ছোট আফার সবদিকে খুব নজর।'

'নজর হলেও সে নিতান্তই বাচ্চা একটা মেয়ে। তা ছাড়া বাবার ভয়ে সব সময় অস্থির। কাউকে ভয় পেলে তার সেবা-যত্ন করা যায় না।'

'তাও ঠিক।'

তোমার খালুজান মাঝে মাঝে রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ঘুম থেকে উঠে আমাকে ডেকে তুলে বলে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করে এক গ্লাস লেবুর সরবত দাও। লেবুর সরবতের কি যে এক নেশা ! মেয়েকে সে তো আর রাত তিনটার সময় লেবুর সরবতের

জন্যে ডেকে তুলবে না। অই না?

'ঠিক আম্মা।'

'বিয়ের রাতেও তোমার খালুজানের লেবুর সরবত খাওয়ার ইচ্ছা হল। রাত তিনটা সাড়ে তিনটা বাজে। আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে আছি। তোমার খালুজান গায়ে হাত দিয়ে ডাকতেই লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। তোমার খালুজান বললেন — শরীরটা ভাল লাগছে না। এক গ্লাস লেবুর সরবত খাওয়াবে? চিন্তা কর অবস্থা ! আমি নতুন বৌ। ঐ বাড়ির কাউকে চিনি না। কাকে গিয়ে লেবুর সরবতের কথা বলব? দরজা খুলে বাইরে এসেছি। তোমার খালুজানের বড়বোনের সঙ্গে দেখা। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে উনাকে লেবুর সরবতের কথা বললাম। উনি হাসতে হাসতে আমাকে বললেন — লেবুর সরবত-টরবত কিছু না। তোমার ঘুম ভাঙানোর জন্যে এইসব ফন্দি করছে। কি যে লজ্জার মধ্যে পড়েছিলাম মতির মা !'

'লজ্জারই কথা।'

'তোমার খালুজানের বড়বোন আমাকে খুবই আদর করতেন। এই যে অসুখ হয়ে পড়ে আছি, উনি বেঁচে থাকলে দিনরাত আমার পাশে থাকতেন। তাঁর মত ভাল মহিলা আমি আমার জীবনে দেখিনি মতির মা। টাইফয়েডে মারা গিয়েছিলেন। খুব সুন্দর মৃত্যু হয়েছিল উনার। অসুখের খবর পেয়ে চিটাগাং-এ তাঁকে দেখতে গিয়েছি — আমাকে দেখে কি খুশি। হাসতে হাসতে বললেন, "বৌ আসছে, বৌ আসছে।" আমাকে বৌ ডাকতেন।

'আম্মা, আফনে একটু ঘুমানের চেষ্টা করেন।'

'ঘুম আসছে না মতির মা। তারপর শোন কি হয়েছে — সন্ধ্যার সময় উনার পাশে বসেছি। মাথায় বিলি দিয়ে দিচ্ছি। উনি বললেন, বৌ, কাকে কি বলতে হবে আমাকে বলে দাও। আমি বললাম, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। উনি হাসিমুখে বললেন, তোমার মৃত আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তো খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে — ওদের কি বলতে হবে বলে দাও। এই বলেই খুব হাসতে লাগলেন। উনি খুব রসিক ছিলেন। মৃত্যুর এক ঘণ্টা আগে রসিকতা করা তো খুব সহজ ব্যাপার না। তাই না মতির মা?'

'জ্বি।'

'মতির মা ! পানি খাব।'

মতির মা পানির গ্লাস এনে দিল। তিনি আবারো এক চুমুক পানি খেয়ে গ্লাস ফেরত দিলেন। দীর্ঘ সময় কথা বলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন।

কোথায় যেন কচ কচ শব্দ হচ্ছে।

কচকচ শব্দে কেউ কিছু খাচ্ছে। সালমা বানু চোখ মেললেন। অপরিচিত একটা ছেলে তাঁর মাথার কাছে বসে মহানন্দে আপেল খাচ্ছে। ছেলেটার মুখ ভর্তি ফিনফিনে

দাড়ি। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। ছেলেটাকে খুবই চেনা লাগছে। তাঁকে তাকাতে দেখে ছেলেটা আপেল খাওয়া বন্ধ রেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, মা, তোমার আপেল সব খেয়ে ফেলছি।

সালমা বানুর বুকে ধ্বক করে ধাক্কা লাগল। কি আশ্চর্য কাণ্ড, নিজের ছেলেকে তিনি চিনতে পারছেন না ! মুখ ভর্তি দাড়ি রেখেছে তো কি হয়েছে? গায়ের গন্ধেই তো তাঁর চিনে ফেলা উচিত ছিল। ছোটবেলা থেকেই আতাহারের গায়ে বার্লি বার্লি গন্ধ।

সালমা বানু খুশি খুশি গলায় বললেন, বটু, তোকে চিনতে পারিনি।

আতাহার আপেলে বড় করে কামড় দিতে দিতে বলল, চিনতে না পারলে তোমার কোন দোষ নেই। আমি নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না। যখনি আয়নায় নিজেকে দেখি তখনি মনে হয় অপরিচিত কাউকে দেখছি। তোমার অবস্থা তো মা খুবই খারাপ। দিন-রাত না-কি ঝিম ধরে থাক ?

সালমা বানু হাসলেন। ছেলেকে দেখে তাঁর এত ভাল লাগছে ! লম্বা-চওড়া ছেলে। জন্মের সময় এই এতটুক হয়েছিল। ডাক্তার বললেন, আন্ডারগ্রোথ চাইল্ড। মাত্র ২.৯ পাউন্ড ওজন। সারভাইভ না করারই সম্ভাবনা। ছেলেকে নিয়ে প্রায় এক মাস থাকতে হয়েছে হাসপাতালে। রাতের পর রাত তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে কাটিয়েছেন। সামান্য শব্দ হলেই ছেলে কেমন চমকে তাকাতো। মুঠি বন্ধ করে শরীর শক্ত করে ফেলত। কি দিন গিয়েছে ! একবার তো হঠাৎ নিঃশ্বাস বন্ধ। হাত-পা সব নীল হয়ে গেল। ডাক্তার-নার্স সব ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সালমা বানুর শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে বাবার কোলে দিয়ে অজু করে জায়নামাজে গেলেন। ছেলের জীবন রক্ষার জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন— "হে পরোয়ার দেগার, আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। ধন না, সম্পদ না, সুখ না, শান্তি না। আমি শুধু আমার ছেলের জীবন তোমার কাছে ভিক্ষা চাই।" নামাজে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে মনে হল শিশু যখন তার মা'র কোলে থাকে তখন আজরাইল তার জান কবচ করতে পারে না। আজরাইলকে নিষেধ করা আছে সে যেন কোন মা'র কোল থেকে শিশুর জীবন ছিনিয়ে না নেয়। যে কারণে মা'র কোলে থাকা অবস্থায় কখনো কোন শিশুর মৃত্যু হয় না। মা যখন মনের ভুলে বা অন্য কোন কারণে তাঁর অসুস্থ শিশুকে অন্যের কাছে ক্ষণিকের জন্যে দেন সেই সময় টুক করে আজরাইল তার জান নিয়ে ছুটে চলে যায়। এই কথা মনে হওয়ামাত্র সালমা বানু নামাজ ছেড়ে ছেলের কাছে ছুটে গেলেন। ছেলের বাবার কাছ থেকে ছেলেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে নিলেন।

সেবার আজরাইলকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক সালমা বানু নামের অতি নগণ্য এক মহিলার কথা শুনেছিলেন।

'ও বটু।'

'কি মা?'

'এত দূরে বসে আছিস কেন, কাছে এসে বোস না।'

'রোগীর গা ঘেঁসে বসে থাকতে আমার জঘন্য লাগে মা।'

'থাক, তাহলে দূরেই বসে থাক। বাসার খবর কি?'

'বাসার খবর ভয়াবহ।'

'ভয়াবহ মানে কি?'

'বাবা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করেছেন। তুমি না থাকায় সংসারের এসেম্ব্লীতে বিরোধীদল অনুপস্থিত। বাবার যা ইচ্ছা করে যাচ্ছেন।'

'কি করছে?'

'কোত্থেকে কাল দু'টা বেল নিয়ে এসেছেন। কাঁচা বেল। সেই কাঁচা বেলই হাত দিয়ে কচলে পানি মিশিয়ে ঝাঁকিয়ে বেলের সরবত বানিয়ে ফেললেন। সেই বিষ সবাইকে এক গ্লাস খেতে হবে।'

সালমা বানু হাসছেন। ছেলে এত সুন্দর করে কথা বলে যে, শুধু শুনতেই ইচ্ছা করে। তাঁর ধারণা, এই ছেলের সঙ্গে যে মেয়ের বিয়ে হবে সেই মেয়ে মহা ভাগ্যবতী। মুগ্ধ হয়ে সে শুধু স্বামীর কথা শুনবে। তাছাড়া এমন রূপবান একজন পুরুষ পাওয়াও তো ভাগ্যের ব্যাপার।

'ও বটু!'

'বটু বটু করবে না তো। বটু ডাকলে নিজেকে কুলী সর্দার কুলী সর্দার বলে মনে হয়।'

'এত বড় নাম মুখে নিতে পারি না। ছোট একটা কিছু ডাকতে ইচ্ছা করে।'

'কবি ডাকলেই পার। ছোট দুই অক্ষরের ইকারান্ত নাম। মাত্র দুই মাত্রা।

'তোকে যে কবি ডাকব, তুই কবি না-কি?'

'অবশ্যই কবি। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শুধু জীবনানন্দ ছাড়া আমার চেয়ে ক্ষমতাবান কোন কবি জন্মায়নি।'

'দাড়িতে তোকে অবশ্যি খানিকটা রবীন্দ্রনাথের মত লাগছে।'

'সত্যি?'

'হুঁ, সত্যি।

'তোকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে সুন্দর লাগছে। উনার গায়ের রঙ ছিল কালো — তোর গায়ের রঙ দুধে-আলতায়।'

'রবীন্দ্রনাথের গায়ের রঙ কালো ছিল কে বলেছে?'

'কোন বইতে যেন পড়েছিলাম। তুই উনার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর।'

'পৃথিবীর সব মা' নিজের ছেলেমেয়ে সম্পর্কে এরকম ভাবে। যে ছেলের এক ঠ্যাং নেই সেই ছেলের মা নিজের ছেলে সম্পর্কে ভাবে — "লাঠিতে ভর দিয়ে আমার ছেলের মত সুন্দর করে কেউ হাঁটতে পারে না।"

সালমা বানু হাসছেন। প্রথমে নিঃশব্দে, তারপর শব্দ করে। আতাহার বলল, মা যাই।

'যাই যাই করছিস কেন? আরেকটু বোস।'

'রোগীর কাছে বেশিক্ষণ বসা ঠিক না। তুমি দ্রুত শরীর সারিয়ে বাসায় ফিরে আস।'

সালমা বানু বললেন, টেবিলের উপর থেকে কালো ব্যাগটা দে তো। আতাহার ব্যাগ

দিল। তিনি ব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করে বললেন, নে।

আতাহার অবাক হয়ে বলল, কি?

'কি আবার, টাকা।'

'টাকা কি জন্যে?'

'খরচ করবি। চা-টা খাবি।'

'তোমাকে দেখতে আসার ঘুষ না-কি মা? তাহলে তো রোজ রোজ আসতে হয়।'

আতাহার অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে টাকা নিল। আজ টাকাটা খুব কাজে আসবে। আতাহার যাবে সাপ্তাহিক সুবর্ণের সম্পাদক আবদুল গনির কাছে। 'বাসর' কবিতাটার কোন গতি করা যায় কি-না তা দেখবে। আবদুল গনি সাহেবের কাছে খালি হাতে যাওয়া যায় না। সব সময়ই কিছু না কিছু নিয়ে যেতে হয়। সাহিত্য বিষয়ে তাঁর দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর বক্তৃতা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনতে হয়। কোন রকম সাহিত্যবোধহীন একজন মানুষ এত সুন্দর একটা সাহিত্য পত্রিকা কি করে বের করছে কে জানে! জগতের অসংখ্য রহস্যের মত এও এক রহস্য।

আতাহার হাসপাতাল থেকে বের হল বেলা এগারোটায়। ভোরবেলা যখন বের হয়েছিল তখন চনমনে রোদ ছিল। আকাশ এখন মেঘে মেঘে ঢাকা। এত মেঘ হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হল কে জানে! হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামলে খুব যন্ত্রণা হবে।

আজ বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না। পকেটে কবিতা। কবিতা ভিজে যাবে। কোন একটা দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করা ভয়াবহ শাস্তির মধ্যে একটি। বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করলে বৃষ্টি বাড়তে থাকে — এটি জগতের আদি সত্যের একটি।

আবদুল গনি সাহেব থাকেন পুরানো ঢাকায়। আগামসি লেনে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লেই তাঁর বাড়ির সামনের গলিতে এক কোমর পানি জমে যায়। সেই পানি আলকাতরার মত ঘন কালো। পানির ঘনত্বও বেশি, কারণ সব কিছুই সেই পানিতে ভাসে — মরা কুকুর, মরা বিড়াল, মরা মুরগি। গলিতে ঢাকনাবিহীন দু'টা ম্যানহোল আছে। আতাহারের বন্ধু সাজ্জাদের ধারণা, ম্যানহোল দু'টির মধ্যে একটি জীবন্ত। সে জায়গা বদলায়। কখনো সে থাকে গলির মাঝামাঝি, কখনো সাইডে চলে আসে। বৃষ্টি-বাদলার দিনে যতবার সাজ্জাদকে নিয়ে আতাহার প্রাজ্ঞ সমালোচকের বাসায় গিয়েছে ততবারই সাজ্জাদ ম্যানহোলে পড়ে গেছে।

বৃষ্টির আগে আগেই আতাহার আবদুল গনি সাহেবের বাসায় পৌঁছে কড়া নাড়ল। গনি সাহেব বের হয়ে এলেন। ছোটখাট মানুষ। শান্ত সৌম্য চেহারা। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চমশা। গায়ে পাতলা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির নিচে গেঞ্জি নেই বলে রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। গনি সাহেব অনাগ্রহের সঙ্গে বললেন, ও, তুমি আতাহার। খবর কি?

আতাহার বলল, গনি ভাই, কেমন আছেন?

বলেই গাল ভর্তি করে হাসল। তার হাসি থেকে মনে হতে পারে যে মহাপুরুষের দর্শন পেয়ে সে কৃতার্থ। তার আনন্দ রাখার জায়গা নেই।

'আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছি, গনি ভাই।'

আতাহার সিগারেটের প্যাকেট বের করল। বেনসন এন্ড হেজেজ। এম্নিতে ষাট টাকায় পাওয়া যায়, আজ আশি টাকা লাগল। সিগারেটের প্যাকেট দেখেও গনি সাহেবের মুখের নিস্পৃহ ভাব কাটল না। তবে তিনি বললেন, বোস।

আতাহার বলল, আপনার সময় নষ্ট করব না গনি ভাই। এক্ষুণি বিদায় হব। লিখছিলেন নিশ্চয়ই।

গনি সাহেব শুকনো গলায় বললেন, লিখছিলাম না। পড়ছিলাম। লেখালেখির প্রথম ধাপ পড়াশোনা। তোমরা কেউ পড়াশোনার ধার দিয়ে যাও না, লেখালেখি শুরু করে দাও। এটা একটা আফসোস। ঐদিন এক ইয়ং ছেলে চারটা কবিতা নিয়ে এসেছে। আমি তাকে বললাম, অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা পড়েছ? সে হা করে তাকিয়ে রইল। মনে হয় নামটা প্রথম শুনল। দেখে খুব মায়া লাগল। চা খাবে না-কি আতাহার?

'জ্বি গনি ভাই, এক কাপ খেতে পারি।'

গনি সাহেব চায়ের কথা বলে ফিরে এলেন। তাঁর চেহারা থেকে নিস্পৃহ ভাব কিছুটা দূর হয়েছে। ঠোঁটের কোণায় হাসি হাসি ভাব।। এটিও ভয়াবহ সংবাদ। সাহিত্য বিষয়ক দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়ার আগে গনি সাহেবের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা যায়।

'আতাহার।'

'জ্বি গনি ভাই।'

'পড়। পড়। এক লক্ষ কবিতা পড়ার পর একটা কবিতা লিখবে। এবং সেই কবিতা ছাপানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। কবিতা লিখতে পারাটাই প্রধান, ছাপানো প্রধান না।'

'যদি কবিতা নাই ছাপি তাহলে লেখারই দরকার কি? কবিতা মাথায় থাকলেই হয়।'

'যথার্থ বলেছ। সেটাই হওয়া ভাল। পৃথিবীর প্রধান কবিরা তাঁদের শ্রেষ্ঠ কবিতা কোনটাই লিখেননি। মাথার মধ্যে রেখে দিয়েছেন।'

আতাহার মনে মনে বলল, চুপ থাক গাধার বাচ্চা। অফ যা।

'শোন আতাহার। দাড়ি রেখে পাঞ্জাবি পরে ঘুর ঘুর করলেই কবি হওয়া যায় না।'

আতাহার আবার মনে মনে বলল, গাধার বাচ্চা গাধা হয়, তুই হয়েছিস খাটাস।

চা চলে এসেছে। অতিরিক্ত চিনি দেয়ার পরেও সেই চায়ের তিতকুটে ভাব যায়নি। চায়ের প্রধান যে গুণ উত্তাপ তাও তার নেই। এই চা গনি সাহেবের মতই ঠাণ্ডা।

'আতাহার?'

'জ্বি গনিভাই।'

'ছন্দ বিষয়ে বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছাড়াই তোমরা কবিতা লিখতে যাও। এত হাস্যকর আমার কাছে লাগে! এ দেশের খুব নামী দামী একজন কবি কয়েকদিন আগে আমার

কাছে দু'টা কবিতা পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর নাম বলব না। নাম বলাটা ঠিক হবে না। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা — পদে পদে ছন্দ ভুল। যেখানে তিন মাত্রা হওয়ার কথা সেখানে দু'মাত্রা। ক্লান্তি শব্দটা ট্রিট করেছে তিন মাত্রা হিসাবে। রীতিমত স্কুল করে এদের ছন্দ শেখানো উচিত। কাজটা কে করবে?

'আপনি ছন্দের উপর একটা বই লিখুন গনি ভাই। এই বিষয়ে আপনার চেয়ে বেশি দুই বাংলায় কেউ জানে না।'

গনি সাহেব আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গেলেন। আতাহার মনে মনে হাসল। খাটাসটা ফ্লাটারি ধরতে পারে না। আতাহারের কথা সত্যি বলে ধরে নিয়েছে। খাটাসটার দোষ নেই — বুদ্ধিমানরাই ফ্লাটারি ধরতে পারে না, আর এ হচ্ছে গাধার বাচ্চা খাটাস।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'ছন্দের উপর একটা বই লেখার ইচ্ছা আমার আছে। লিখব কাদের জন্যে? পণ্ডশ্রম।'

'পণ্ডশ্রম হলেও আপনাকেই লিখতে হবে। আমরা আপনার ছন্দজ্ঞান নিয়ে প্রায়ই কথা বলি। আপনাকে আমরা আড়ালে কি ডাকি জানেন গনি ভাই? আড়ালে ডাকি — চালুনি।'

গনি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, চালুনি মানে?

'আপনাকে আমরা বলি ছন্দের চালুনি। যত বড় কবিই হোক চালুনির মধ্যে আটকা পড়ে যাবে।'

গনি সাহেব অত্যন্ত প্রীত হলেন। আনন্দ তাঁর চোখ-মুখে ফুটে উঠল। উদার গলায় বললেন — তুমি ইদানীং কিছু লিখেছ না-কি?

'একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলাম।'

'নাম কি?'

'বাসর।'

'বাসর নামে মডার্ন একজন কবি কবিতা লিখবে ভাবাই যায় না, বাসর-ফাসর হচ্ছে মিডল ক্লাস ফ্যান্টাসি।'

'একটু যদি পড়ে দেখেন গনি ভাই। আপনি কবিতাটা পড়েছেন এটাই আমার জন্যে বিরাট ঘটনা।'

গনি সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে কবিতা পড়তে শুরু করলেন — এক হাতে তাল দিয়ে ছন্দ দেখছেন। ছন্দের সমস্যা হচ্ছে বলে মনে হয়। মাঝে মধ্যে গনি সাহেবের মুখ বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছেন।

'কেমন হয়েছে গনি ভাই?'

'আছে — থোর বড়ি খাড়া। খাড়া বড়ি থোর।'

আতাহার মনে মনে বলল — থোর বড়ি তোর পশ্চাদ্দেশ দিয়ে ঢুকিয়ে দেব শালা

চালবাজ।

'গনি ভাই।'

'হুঁ।'

'ঠিকঠাক করে যদি আপনার পত্রিকায় . . .।'

'আচ্ছা, দেখি।'

'আপনার হাত দিয়ে একটা কবিতা ছাপা আমার জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে।'

'দেখি দেখি — অনেক কাটাকুটি লাগবে।'

'আমি তাহলে উঠি গনি ভাই।'

'উঠবে ! আচ্ছা যাও — ও ভাল কথা, এন্টাসিডের একটা বোতল এনে দাও তো — গ্লাক্সো কোম্পানীর। দাঁড়াও টাকা এনে দি।'

'টাকা লাগবে না গনি ভাই। আছে আমার কাছে, পরে দিয়ে দেবেন।'

'আবদুল গনি অত্যন্ত উদার ভঙ্গিতে বললেন, দেখি সামনের সংখ্যায় দিয়ে দেব। তবে লিসন টু মাই অনেস্ট এডভাইজ। এইসব আজেবাজে লেখা ছেড়ে ভাল কিছু লেখার চেষ্টা করো। গ্রো আপ। গ্রো আপ।

আতাহার মনে মনে বলল, হে খাটাস, তোকে আমি পুঁতে ফেলব। পাঁচ হাত গভীর একটা গর্ত করে তার ভেতর পুঁতব। গোবর সার দেব, পানি দেব, যাতে একটা গাছ হিসেবে তুই আবার পৃথিবীতে আসতে পারিস। সেই গাছে কোন ফল হবে না, ফুল ফুটবে না। সেই গাছে শুধু আঁটি জন্মাবে। শক্ত শক্ত আঁটি।

'কিছু ভাবছো না-কি আতাহার'?

'জ্বি না।'

গ্ল্যাক্সো কোম্পানীর এন্টাসিড কিনে গনি সাহেবের হাতে দিয়ে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ঘটল। ম্যানহোলে পা বেজে গিয়ে চামড়া ছিলে গেল। ম্যানহোলের বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যই ঘটনাটা ঘটেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটলে এই সমস্যা হত না। আতাহার আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ঘন কালো। মেঘ আর মেঘ জমছে। "মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার হয়ে এল।" সুন্দর যে সব কথা সবই বলা হয়ে গেছে। সবচে বেশি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের জন্ম বাংলা সাহিত্যের বড় দুর্ঘটনার একটি। তাঁর কারণে সুন্দরের চিন্তা ও ব্যাখ্যায় অন্যেরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এই ব্যাপারটা কি কেউ লক্ষ্য করেছে?

বৃষ্টি ধরে গিয়েছিল, রাস্তার মোড় পর্যন্ত যেতেই আবার শুরু হল। আতাহার লোহালক্করের এক দোকানে ঢুকে গেল। নাট-বল্টু, স্ক্রুর বিশাল দোকান। দোকানের মালিক মধ্যবয়স্ক চশমা পরা এক ভদ্রলোক। গভীর আগ্রহে তিনি হাদিসের কি একটা বই পড়ছেন এবং পা নাচাচ্ছেন। লোহালক্করের দোকানের মালিক বলেই বোধহয়

ভদ্রলোকের মুখ লৌহ-কঠিন। চোখ দুটিও মনে হয় পাথরের — কোন জ্যোতি নেই। ভদ্রলোক মুখ তুলে তাকাতেই আতাহার বলল, বৃষ্টির জন্যে ঢুকেছি। বৃষ্টি থামলেই চলে যাব।

ভদ্রলোক বললেন, কোন অসুবিধা নেই — যতক্ষণ ইচ্ছা বসুন। আতাহার বসল। ভদ্রলোক আতাহারকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, চা খাবেন? আতাহার বলল, জ্বি খাব। ভদ্রলোক পিছন ফিরে বললেন, দু' কাপ চা।

এই দোকান ঘরটা লম্বাটে। পেছন দিকে অনেকখানি খালি জায়গা। সেখানে কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ চা বানাচ্ছে। সে এতই বৃদ্ধ যে তার মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।

ভদ্রলোক বই পড়তে পড়তেই বললেন, বৃষ্টি আজ রাত দশটার আগে থামবে না।

আতাহার বলল, ও আচ্ছা।

'একথা বলায় মনে করবেন না যে, আপনাকে বৃষ্টির মধ্যে বের করে দিতে চাচ্ছি। চা খান, যতক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করে থাকুন।'

' থ্যাঙ্ক য়্যু।'

'বাড়িতে টেলিফোন থাকলে টেলিফোন করতে পারেন।'

ভদ্রলোকের কথাবার্তা লোহা-লক্করের দোকানের মালিকের মত না। কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের মত। সুবর্ণ পত্রিকার মালিক হলে ভদ্রলোককে বেশি মানাত।

বুড়ো চা নিয়ে এগুচ্ছে। তার হাত এমনভাবে কাঁপছে যেন এক্ষুণি হাত থেকে কাপ মাটিতে পড়ে যাবে। বুড়োর দিকে তাকিয়ে থাকাই এক ধরনের টেনশন।

ভদ্রলোক বই পড়তে পড়তেই চা খাচ্ছেন। একবারও চায়ের কাপের দিকে তাকাচ্ছেন না। ভদ্রলোক বই যে পড়ছেন তাও মনে হচ্ছে না। তিনি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি একটা পাতাতেই স্থির হয়ে আছে। বুড়ো চা ভাল বানিয়েছে। কড়া লিকার, চা পাতার সতেজ গন্ধ, দুধ-চিনি সব ঠিকঠাক আছে।

একজন মানুষের মুখোমুখি চুপচাপ বসে থাকা যায় না। বৃষ্টি যেভাবে নেমেছে, বের হবার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রলোকের কথা ঠিক হলে এই বৃষ্টি রাত দশটার আগে থামবে না। সংসারে কিছু লোক আছে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে ভালবাসে। এও বুঝি সেই পদের।

'ভাই, একটা টেলিফোন করব।'

ভদ্রলোক পিছন ফিরে বললেন, টেলিফোনের চাবি খুলে দাও।

বুড়ো আবারও কাঁপতে কাঁপতে আসছে। টেলিফোনের চাবি তার কোমরের ঘুনসির সঙ্গে বাঁধা। টেলিফোনের চাবি খুলতে তার দীর্ঘ সময় লাগল। হাত এমনভাবে কাঁপছে যে তালার ফুটোয় চাবি ঢুকানো যাচ্ছে না। যতবার টেলিফোন করা হয় ততবার কি এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে প্রাণান্ত পরিশ্রমের ভেতর যেতে হয়?

একটা টেলিফোন নাম্বারই আতাহারের মুখস্থ। সাজ্জাদদের টেলিফোন। সেই টেলিফোনের সমস্যা হচ্ছে — টেলিফোন ধরে নীতু। সামনাসামনি সে কথা বলে না বললেই হয়, কিন্তু টেলিফোন সহজে ছাড়তে চায় না।

'হ্যালো, নীতু?'

'হ্যাঁ।'

'সাজ্জাদ আছে?'

'না।'

'কোথায় গেছে?'

'কোথায় গেছে সেটা আতাহার ভাই আপনি খুব ভাল করেই জানেন। কিন্তু আমাদের জানাচ্ছেন না।'

'আমি জানি না নীতু।'

'আপনার এইসব রসিকতা ভাল লাগে না। সাত দিন হয়ে গেল একটা মানুষের খোঁজ নেই।'

'সাতদিন হয়ে গেছে?'

'আজ অষ্টম দিন।'

'পুলিশে খবর দেয়া দরকার।'

'আতাহার ভাই, ফাজলামি করবেন না। ফাজলামি আমার ভাল লাগে না।'

'ফাজলামি করছি না। সিরিয়াসলি বলছি — থানায় একটা ডায়েরি করিয়ে রাখা দরকার।'

'আতাহার ভাই, আপনি কি দয়া করে একটু বাসায় আসবেন? বাবা আপানার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আসব কি করে? বৃষ্টি কেমন নেমেছে দেখছিস না?'

'বৃষ্টি থামলে আসুন।'

'বৃষ্টি চট করে থামবে না। রাত দশটার দিকে বৃষ্টি থামার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।'

গোঁৎ গোঁৎ শব্দে করে হঠাৎ লাইন কেটে গেল। আতাহার টেলিফোন নামিয়ে রাখতেই ভদ্রলোক বললেন, বৃষ্টি থামার সম্ভাবনা ক্ষীণ নয়, বৃষ্টি থামবেই।

'ও আচ্ছা, আপনি কি পুরোপুরি নিশ্চিত যে বৃষ্টি থামবেই?

'জ্বি। আবহাওয়ার ব্যাপারে আমার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল।'

'কি বই পড়ছেন এত মন দিয়ে?'

'বই পড়ছি না। তাকিয়ে আছি।'

'ও আচ্ছা।'

'ব্যবসা-বাণিজ্য নেই, কাজেই কিছু করার নেই। দিনের পর দিন বই মুখের সামনে ধরে ধরে অভ্যাস হয়ে গেছে।'

'ব্যবসাপাতি ভাল না?'

'কোন কালেই ভাল ছিল না।'

'ও আচ্ছা।'

'সৎ ব্যবসা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছি। সব জিনিসের দাম আমার এখানে সস্তা। লোকে ভাবে নকল জিনিস দিচ্ছি। বেশি দাম দিয়ে জিনিস কেনা মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে। একই কমলা আপনি যদি দু'টা ঝুড়িতে রাখেন — এক ঝুড়ির কুড়ি টাকা হালি,

অন্য ঝুড়ির পঁচিশ টাকা হালি বিক্রি করেন, লোকজন পঁচিশ টাকা হালির কমলা কিনবে। আপনি নিজেও কিনবেন।'

আতাহার গম্ভীর মুখে বলল, এর একটা কারণও আছে। বাংলায় একটা বাগধারা আছে — সস্তার তিন অবস্থা। এই ভেবেই সস্তার জিনিস কেউ কেনে না। নতুন একটা বাগধারা যদি রচনা করা যায় . . .

'কি রকম বাগধারা?'

'চট করে বলা যাবে না। চিন্তাভাবনা করে বলতে হবে। আমি চিন্তাভাবনা করে বের করে আপনাকে বলে যাব। আপনার নাম কি ভাই?'

'আবদুল্লাহ। নিন, কাডটা রেখে দিন। যদি কখনো আপনার বা আপনার কোন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের লোহালক্করের কিছু দরকার হয়, বলবেন। বাজারের কারেন্ট প্রাইসের চেয়ে দশ পার্সেন্ট কম না হলে কান কেটে কুত্তাকে দিয়ে খাইয়ে দেব।'

'আমি তাহলে উঠি আবদুল্লাহ সাহেব?'

'বৃষ্টির মধ্যে যাবেন কি ভাবে?'

'অসুবিধা হবে না। আমি আগের জন্মে ব্যাঙ ছিলাম। ব্যাঙ স্বভাবের কিছুটা এখনো আছে। বৃষ্টিতে কিছু হয় না।'

'ছাতা আছে। ছাতা নিয়ে যান। পরে ফেরত দিলেই হবে।'

'আপনার লাগবে না?'

'আমি দোকানের উপরের ঘরে থাকি।'

'বের-টের তো হবেন। ঘরে তো আর বসে থাকবেন না।'

'আমি বের হই না। আমার পা নেই। দু'টা পা ট্রেনে কাটা পড়েছে।'

'সে কি?'

আতাহার এতক্ষণে লক্ষ্য করল, ভদ্রলোক চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর গায়ের উপর খয়েরি রঙের একটা চাদর। আতাহারের মনটা খারাপ হয়ে গেল। তার এখন আর এক মুহূর্তের জন্যেও এই ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। দমবন্ধ হয়ে আসছে। সে ঘোর বর্ষণের মধ্যে ছাতা হাতে বের হয়ে গেল।

বৃষ্টির এতই তোড় যে ছাতায় বৃষ্টি মানছে না। ছাতার কাপড়টাও পুরানো। কয়েক জায়গায় ফুটো। ফুটো গলে মাথায় টপ টপ করে বৃষ্টির পানি পড়ছে। আবদুল্লাহ সাহেবের বুড়ো কর্মচারী এই ছাতাও হাতছাড়া করতে চায়নি। ছাতা হাতে দেয়ার সময় কঠিন চোখে তাকাচ্ছিল। বুড়োকে নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলতে হবে।

> এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ছিলেন নিজ মনে
> আপন ভুবনে।
> জরার কারণে তিনি পুরোপুরি বৃক্ষ এক।
> বাতাসে বৃক্ষের পাতা কাঁপে—
> তাঁর কাপে হাতের আঙ্গুল।

বৃদ্ধের সহযাত্রী জবুথবু —
পা নেই, শুধু পায়ের স্মৃতি পড়ে আছে।
সেই স্মৃতি ঢাকা থাকে খয়েরি চাদরে।
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ভাবে চাদরের রঙটা নীল হলে ভাল ছিল।
স্মৃতির রঙ সব সময় নীল।

রশীদ সাহেব ভেতরের বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছেন। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, তিনি বৃষ্টি দেখছেন। ঘটনা তা না — বৃষ্টির পানি জমে বারান্দা পর্যন্ত চলে এসেছে। আরো যদি বাড়ে তাহলে বারান্দা উপচে নোংরা পানি ঘরে ঢুকে যাবে। রশীদ সাহেব সেই ভয়াবহ সময়ের অপেক্ষা করছেন। গত বৎসর এ রকম নোংরা পানি ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। পানি পরদিনই নেমে গেল। দুর্গন্ধ নামল না। বিকট গন্ধ তিন মাস থাকল। এই ব্যাপার দ্বিতীয়বার ঘটতে দেয়া যায় না। কি করা যায় তিনি তাই ভাবছেন।

আতাহারকে ঢুকতে দেখে তিনি আনন্দিত হলেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ একা করা যায় না। শক্তসমর্থ সঙ্গি–সাথী লাগে। যুবা–পুরুষ লাগে।

আতাহার কাক–ভেজা হয়ে ঢুকেছে। আবদুল্লাহ সাহেবের ছাতার কল্যাণে মাথাটা রক্ষা পেয়েছে — কিন্তু শরীর পুরোটা ভেজা। শীতে গা কাঁপছে। গরম এক কাপ চা খেয়ে চাদরের ভেতর ঢুকে পড়ে বর্ষা যাপন করতে হবে। বাবার হাত থেকে কতক্ষণে মুক্তি পাওয়া যাবে কে জানে ! বাবার তাকানোর ভঙ্গি আতাহারের ভাল লাগছে না।

রশীদ সাহেব অস্বাভাবিক কোমল গলায় বললেন, বৃষ্টির পানি কি রকম বাড়ছে দেখছিস না–কি রে ?

আতাহার চমকে উঠল। এ রকম মিষ্টি–মধুর স্বরে বাবা কথা বলছেন — এর মানে কি ? সামথিং ইজ ভেরী রং। আতাহার শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করছে। মধুর প্রস্তাবনার পরের অংশটা শোনা দরকার।

রশীদ সাহেব বললেন, তোর কি মনে হয় বৃষ্টি কমবে ?

আতাহার অস্বস্তির সঙ্গে বলল, রাত দশটার আগে বৃষ্টি কমবে না।

'তাহলে তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

আতাহার ভয়ে ভয়ে বলল, কি ব্যবস্থা ?

বাবার চিন্তার গতি সে এখনো ধরতে পারছে না। রশীদ সাহেব বললেন, গতবারের মত এবারও ঘরে পানি ঢুকে যাবে। পানি আটকাতে হবে।

'কি ভাবে ?'

'কোদাল নিয়ে তুই নেমে পড়। একটা ড্রেনেজ সিস্টেমের ব্যবস্থা কর। জমা পানি যেন বেরিয়ে যেতে পারে।'

আতাহার হতভম্ব গলায় বলল, পুরো উঠান সিমেন্টের ঢালাই করা। কোদাল দিয়ে আমি তার কি করব ?

'একটা কিছু বুদ্ধি বের কর। রান্নাঘরের পাশের জায়গাটা তো সিমেন্টের না —

সেখানে একটা খালের মত কেটে দে।'

'খাল কাটতে বলছ?'

'একটা কিছু বুদ্ধি বের করতে বলছি। কোন একটা কাজের কথা বললেই তুই এরকম করে তাকাস কেন? মানুষের জন্ম কি জন্যে হয়েছে? কাজ করার জন্যে হয়েছে, না বিছানায় গড়াগড়ি করার জন্যে হয়েছে?'

আতাহার মনে মনে বলল, মানুষের জন্ম হয়েছে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যার জন্যে।

মনে মনে কথা বলার একটা ব্যবস্থা থাকায় জীবন যাপন কিছুটা সহনীয় হয়েছে। মনে মনে কথা বলার সিস্টেম না থাকলে অর্ধেক মানুষ মরে যেত বলে আতাহারের ধারণা। রশীদ সাহেব বললেন, কি রে, হা করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

'কোদাল কোথায় পাব?'

'জোগাড় করবি। জোগাড় করতে না পারলে বিকল্প ব্যবস্থা দেখবি।'

'টিপ টিপ করে যেভাবে বৃষ্টি পড়ছে তাতে মনে হয় না ঘরে পানি ঢুকবে।'

'এখন টিপ টিপ করে পড়ছে, দশ মিনিট পরে যে ঝুম ঝুম করে পড়বে না তার নিশ্চয়তা কি? বৃষ্টি তো আর তুই কনট্রোল করছিস না।'

আতাহার পানিতে নেমে পড়ল। রান্নাঘরের পাশের একফালি জায়গায় বটি দিয়ে কুপিয়ে নালার মত করতে করতেই ঝুমবৃষ্টি নেমে গেল। রশীদ সাহেব বারান্দা থেকে আনন্দিত গলায় বললেন — দেখলি, কেমন "ক্যাটস এন্ড ডগস" বৃষ্টি শুরু হয়েছে? আজ অমাবশ্যা, বৃষ্টি হবেই।

খাল কাটায় পানির কোন হেরফের হল না, তবে রশীদ সাহেব ঘোষণা করলেন — পানি দুই আঙ্গুলের মত নেমে গেছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি তিনি খানিকটা মমতাও বোধ করলেন। উদার গলায় বললেন, ভাল করে গরম পানি দিয়ে গোসল কর। সাবান ডলে গোসল। তারপর আগুন-গরম এক কাপ চা খা। আদা-চা। নয়তো ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে যাবে।

আতাহার মনে মনে বলল, পুত্রের প্রতি আপনার এই গভীর মমতায় আমি অভিভূত হয়েছি। আপনাকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ। আতাহার পুতি-গন্ধময় পানি থেকে বটি হাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে এল। সে বেকুবের মত খালি পায়ে নেমেছিল। ভাঙা কাচে বাম পা কেটে গেছে। আতাহারের ধারণা, তার শরীরের শ্বেতকণিকাদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কারণ ক্ষতস্থান দিয়ে বহু বিচিত্র ধরনের জীবাণু একসঙ্গে শরীরে ঢুকে গেছে। এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে মরাতেও আনন্দ। বাবা-শ্বেতকণিকারা তাদের ছেলেমেয়েদের শেখাচ্ছে — এই যে দেখ, এটা হচ্ছে টিটেনাসের জীবাণু, আর ঐ পাশে দেখ, এরা জণ্ডিসের জীবাণু। বৈজ্ঞানিক নাম হেপাটাইটিস-এ। কিছু কলেরার জীবাণুও আছে। বল তো লক্ষ্মী সোনারা, কলেরার জীবাণু দেখতে কেমন?

'কমা'র মত।'

'এই তো পেরেছ। এখন ছুরি-কাচি যা পাও হাতে নিয়ে চলে এসো — জীবাণুদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।'

'বাবা, আমরা তো ছোট।'

'ছোট-বড় এখন আর ব্যাপার না। কোটি কোটি জীবাণু ঢুকে পড়েছে। লোকটাকে বাঁচাতে হলে আমাদের সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সবাই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে না পড়লে বেচারা বাঁচবে না।'

চাদর মুড়ি দিয়ে আতাহার তার বিছানায় বসে আছে। জ্বর আসছে বলে মনে হচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ার কোন স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না, পানি তিতা লাগছে।

মিলি বড় মগভর্তি একমগ চা এনে আতাহারের সামনে রাখল। আতাহার বলল, চা খাব না। চা নর্দমায় নিয়ে ফেলে দে।

মিলি বলল, আমার উপর রাগ করছ কেন? আমি তো তোমাকে বৃষ্টিতে চুবাইনি।

'কারো উপর রাগ করছি না। চা খেতে ইচ্ছা করছে না। জ্বর আসবে বলে মনে হচ্ছে।'

'প্যারাসিটামল খাবে?'

'খেতে পারি।'

'আগে দেখি ঘরে আছে কি-না। না থাকলে তোমকে গিয়েই আনতে হবে। সেলফ হেলপ।'

মিলি হাসছে। আতাহারের মেজাজ খুবই খারাপ, তারপরও মিলির হাসি তার দেখতে ভাল লাগছে। মিলি বলল, তোমার কাছে একটা খোলা চিঠি এসেছে। চিঠির উপরে লেখা — আর্জেন্ট। যেহেতু খোলা চিঠি আমি পড়ে ফেলেছি।

'ভাল করেছিস।'

নীতু নামক জনৈক তরুণী কিংবা কিশোরী, কিংবা মহিলা লিখেছেন যে, তাঁর ভাইয়ের এখনো কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। তুমি যেন দ্রুত কোন ব্যবস্থা কর।

'আমি কি ব্যবস্থা করব? আমি কি আইবি'র লোক?'

'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? ধমক দিতে হলে নীতুকে ধমক দাও। নীতুটা কে ভাইয়া?'

'সাজ্জাদের ছোট বোন।'

'ও আচ্ছা, সাজ্জাদ ভাইয়ার ছোট বোন। তোমার মুখে তো কোন দিন তার নাম শুনিনি।'

'নাম শোনার কি আছে?'

'এই নাও নীতুর চিরকুট।'

'ফেলে দে। আমি ওটা নিয়ে করব কি? খবর যা জানার তা তো জানলামই। এখন চিরকুট দিয়ে হবে কি? তাবিজ করে গলায় ঝুলাব?'

মিলি আবারও হাসল। সেই হাসি দেখে আতাহারের মন দ্রবীভূত হল। সে চায়ের কাপে চুমুক দিল। চা খেতে ভাল হয়েছে। মিলি হাসি মুখে বলল, ভাইয়া, দুই মিনিটের

জন্য বসি? খুব জরুরি কথা আছে। ভয়াবহ একটা সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাবাকে সেই সমস্যার কথা কিভাবে বলা হবে বুঝতে পারছি না। তোমার পরামর্শ দরকার।

'সমস্যাটা কি?'

'ফরহাদ ভাইয়া পরীক্ষা ড্রপ দিয়েছে।'

'সে কি?'

'আজ তার সেকেন্ড পেপার ছিল। প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে দেখল খুব সহজ প্রশ্ন। প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর যে সে জানে তাই না — তার ঝাড়া মুখস্থ। এই আনন্দে তার মাথা ঘুরে গেল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান হবার পর দেখে তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছে। সারা শরীর পানিতে ভেজা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তার পর আর হলে ঢোকেনি। তার জন্যে গরম দুধ আনা হয়েছিল। দুধ খেয়ে সে বাসায় চলে এসেছে।'

'বলিস কি?'

মিলি এখনও হাসছে। আতাহার শঙ্কিত বোধ করছে। ঘটনা যা ঘটেছে তাতে হাসাহাসি করা যায় না। বাবা ঘটনা শুনে কি করবেন তা ভাবতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

'ফরহাদ এখন করছে কি?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'ঘুমুচ্ছে মানে?'

'ঘুমুচ্ছে মানে ঘুমুচ্ছে। স্লিপিং। আরাম করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।'

আতাহার বিড় বিড় করে বলল, ওহ্ মাই গড! মিলি বলল, ওহ্ মাই গড বলা ঠিক না ভাইয়া। গড তো তোমার একা না। কাজেই আমাদের বলা উচিত — ওহ্ আওয়ার গড!

মিলির ফাজলামি ধরনের কথা শুনতে ভাল লাগছে না। আতাহার চিন্তিত মুখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টি মুষল ধারে পড়ছে। বৃষ্টি রাত একটা পর্যন্ত হল। আতাহারের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে রাত একটার সময়ই নোংরা পানি বাড়িতে ঢুকে গেল।

সেই রাতে আতাহারের খুব ভাল ঘুম হল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল সে জাপানে। কিমানো পরা এক জাপানি তরুণী তার সঙ্গে হেসে হেসে বাংলায় কথা বলছে। তরুণীর মুখটা কিছুটা নীতুর মত। আতাহার বলল, আপনি এত সুন্দর বাংলা কোথায় শিখেছেন? জাপানি তরুণী তাতে খুব মজা পেয়ে গেল। খিল খিল করে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বলল, আপনার কাছ থেকে শিখেছি। আপনি ছাড়া আর আমাকে কে শেখাবে? আতাহার কিছুতেই ভেবে পেল না কখন সে এই মেয়েকে বাংলা শিখিয়েছে। স্বপ্নের মধ্যেই তার খুব অস্থির লাগতে লাগল।

কবি

রশীদ সাহেব বললেন, তুই যাচ্ছিস কোথায়?

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আতাহার সত্যি সত্যি ভুলে গেল সে কোথায় যাচ্ছে। কিছুতেই মনে করতে পারল না — অথচ সে একটা বিশেষ কাজেই বেরুচ্ছিল। কাজটা কি তা বাবাকে দেখার আগ পর্যন্ত মনে ছিল — এখন আর মনে নেই। একটা বিশেষ বয়সের পর বাবা–ছেলের সম্পর্ক বন্ধুর মত হবার কথা — তাদের হচ্ছে না। যতই দিন যাচ্ছে ততই তাদের দূরত্ব বাড়ছে। এক সময় তার বাবা ঘোড়া সেজেছেন এবং সে তার বাবার পিঠে বসেছে এটা ভাবতেও এখন গা শির শির করে। তবে ঘটনা সত্যি। ঘোড়া সাজা রশীদ সাহেবের ছবি আছে। বেশ যত্নে আছে। ছবিটা বাঁধানো এবং রশীদ সাহেবের শোবার ঘরে বাঁকাভাবে টানানো।

'কি রে, কথা বলছিস না কেন? যাচ্ছিস কোথায়?'

'ময়না ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি।'

'ময়না ভাইটা কে?'

'পলিটিক্যাল লোক। আমাকে জাপানে নিয়ে যাবেন বলেছেন।'

'মানুষের মুখের কথায় বিভ্রান্ত হবি না। মিষ্টি কথায় ভুলবি না। তার কি দায় পড়েছে তোকে জাপানে নেয়ার?'

'উনি এর জন্যে টাকা নেন।'

'আদম ব্যবসা?'

'প্রায় সে রকমই।'

'জাপানে গিয়ে কি করবি? ঝাড়ুদার হবি? তোকে এম. এ. পাশ করিয়েছি ঝাড়ুদার হবার জন্যে?'

আতাহার একবার ভাবল বলে — কোন কাজকে ছোট ভাবা ঠিক না। ক্লাস নাইনে মুখস্থ করা রচনা আছে না 'শ্রমের মর্যাদা'। যে জাতি শ্রমের মর্যাদা দিতে জানে না সেই জাতির সামনে ভয়াবহ দিন — উদাহরণ বাংলাদেশ। কিছুই বলা হল না। আতাহার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রশীদ সাহেব বললেন, ঐ লোককে কত টাকা দিতে হবে?

'দুই লাখ টাকা।'

'বলিস কি? এত টাকা! এইসব চিন্তা মাথা থেকে দূর কর। যার দেশে কিছু হয় না তার বিদেশেও হয় না। বুঝলি?

'জ্বি।'

'এখন একটা কাজ কর — পত্রিকার অফিসে যা — একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আয়।

মনিকা ফ্ল্যাট বিক্রি করতে চায়। বিক্রি করে ঝামেলা চুকিয়ে দেই। উল্টাপাল্টা কথা তোর মা'কে লিখেছে — ওর ফ্ল্যাটের ভাড়া না-কি খেয়ে ফেলেছি। নিজের বাবা প্রসঙ্গে এই বক্তব্য। ধরে চাবকানো দরকার।'

'বিজ্ঞাপনটা কি লেখা আছে?'

'হ্যাঁ, লেখা আছে। আমার টেবিলের উপর আছে।'

'বিজ্ঞাপন ছাপাতে বাবা টাকা লাগবে।'

'টাকা তো লাগবেই। তোর মুখ দেখে তো আর বিজ্ঞাপন ছাপবে না। আয় টাকা নিয়ে যা।'

আতাহার টাকা নেয়ার জন্যে বাবার পেছনে পেছনে গেল। রশীদ পাঁচটা একশ' টাকার নোট দিলেন। বিরস মুখে বললেন, যা লাগবে দিয়ে বাকিটা আমাকে ফেরত দিবি।

'জ্বি আচ্ছা।'

'পত্রিকা অফিস থেকে ফেরার পথে নাখালপাড়া হয়ে ফিরবি।'

'নাখালপাড়ায় কি?'

'আমার এক পুরানো ছাত্রী, ফরিদা নাম, তাকে এই চিঠিটা দিবি। তার হাতেই দিবি — অন্য কারো হাতে না। খামের উপরে ঠিকানা লেখা আছে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

আতাহার ঘর থেকে বের হয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুক্তির আনন্দ পুরোপুরি পাওয়ার জন্যে চায়ের সঙ্গে বিদেশী একটা সিগারেট খাওয়া দরকার। পকেটে টাকা আছে। খাওয়া যেতে পারে। আতাহারের বাঁধা চায়ের দোকান আছে। দোকানের মালিক ফরিদ আলির সঙ্গে তার বেশ ভাল খাতির। শুধু চা খাওয়া বাবদ ফরিদ আলি পাঁচশ' টাকার মত পায়, এই নিয়ে আতাহারকে সে কখনো কিছু বলেনি। ভবিষ্যতেও কিছু বলবে বলে মনে হয় না।

ফরিদ আলি আতাহারকে দেখে ক্যাশবাক্স ছেড়ে উঠে এল। আতাহারের সামনে বসতে বসতে বলল, খবরটা শুনে মনে বড় ব্যথা পেয়েছি আতাহার ভাই। আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, কোন খবর?

'আপনার ছোট ভাই নাকি পরীক্ষা দিতে পারে নাই। মাথা ঘুরে হলের মধ্যে পড়ে গেছে। ঘটনা কি সত্য?'

'ঘটনা সত্য তো বটেই। প্রশ্ন খুব সহজ ছিল। সহজ প্রশ্ন দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে।'

ফরিদ গম্ভীর গলায় বলল, হাসেন কেন ভাইজান? এটা তো হাসির কোন বিষয় না।

আতাহার বিরক্ত গলায় বলল, সহজ প্রশ্ন দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে এই ঘটনা যদি হাসির না হয় তাহলে হাসির ঘটনা কোনটা? যাই হোক, আপনি আমার এখানে বসে প্যাঁচাল পারবেন না। আপনি ক্যাশবাক্সে গিয়ে বসুন। আর আমাকে চা দিতে বলুন। পিচ্চি পাঠিয়ে সিগারেট আনিয়ে দিন। বেনসন।

'আপনি না-কি জাপান চলে যাচ্ছেন আতাহার ভাই?'

'হুঁ।'

'জাপানে গিয়ে কি করবেন?'

'ওদের ফুটপাত ঝাড় দিব। ঝাড়ুদার হব। আর কি করব?'

'জাপানের ফুটপাত ঝাড় দেয়ার মধ্যেও আনন্দ আছে ভাইসাব। এইগুলা হল সোনার দেশ। ভাইজান, আমারেও সাথে করে নিয়ে যান। দোকান দিয়ে পুষে না। লোকসানের উপরে লোকসান।'

'অনেক পাঁচ্যাল পেরেছেন। এখন যান তো — আমাকে আরাম করে চা খেতে দিন।'

এক কাপ চায়ে মেজাজটা ঠিক আসে না। প্রথম কাপ খেতে হয় সিগারেট ছাড়া। দ্বিতীয় কাপে সিগারেট ধরাতে হয়। আতাহার দেয়াশলাইয়ের জন্যে পকেটে হাত দিল। খামের চিঠিটায় হাত পড়ল। ইংরেজিতে সুন্দর করে নাম লেখা – Farida Hoque. বাবার হাতের লেখা সুবিধার না — এই নামটা বোধহয় যত্ন করে লেখা। কারণ কি কে জানে?

পুরানো ছাত্রীর সঙ্গে বাবার ব্যাপারটা কি আতাহারের মাথায় আসছে না। সাহস থাকলে চিঠিটা খুলে পড়ে ফেলা যেত। আতাহারের এত সাহস নেই।

পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়ার ব্যাপারেও ঘুষের ব্যাপার আছে। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার বললেন, সাড়ে তিনশ' টাকা লাগবে। বিজ্ঞাপন যেতে দেরি হবে, হেভী বুকিং। তবে ইয়ে, এক্সট্রা কিছু দিন — দেখি ইমিডিয়েট কিছু করা যায় কিনা। আতাহার বলল, এক্সট্রা কত?

'শ'খানিক দিন।'

আতাহার বলল, পঞ্চাশ দিলে হয় না?

ঘুষের ব্যাপারে দরদাম করার দস্তুর আছে। দরদাম করে ঘুষ দিলে যিনি ঘুষ নেন তিনি ভাল বোধ করেন। ঘুষ নেয়ার লজ্জাটা কমে যায়।

পঞ্চাশ টকা ঘুষ দিয়ে আতাহার হৃষ্টচিত্তে রিকশায় উঠল। নাখালপাড়ায় যেতে হবে পিতার ছাত্রীর সন্ধানে। রিকশায় চড়ায় একটা রাজকীয় ব্যাপার আছে। মাথা সামান্য উঁচু করলেই আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। গাড়ির যাত্রীরা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আকাশ দেখতে হলে তাদের অনেক ঝামেলা করে জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাতে হয়।

আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে। চোখের দৃষ্টি পিছলে আসছে। এক–আধ টুকরা শাদা মেঘ হলে তাকিয়ে আরাম পাওয়া যেত। আতাহার তারপরেও দৃষ্টি নামালো না। ভাল না লাগুক, তারপরেও চোখ থাকবে আকাশে। তার চোখ তো আর সাধারণ মানুষের চোখ না — কবির চোখ। এই চোখে সারাক্ষণ ছায়া পড়বে আকাশের।

রিকশায় ট্রেনের মত দুলুনি থাকলে কবিদের জন্যে ভাল হত। ছন্দ চলে আসত। আতাহার সিগারেট ধরানোর জন্যে দেয়াশলাই হাতে নিল। চলন্ত রিকশায় সিগারেট ধরানোরও আলাদা মজা আছে। বিরুদ্ধ বাতাসে আগুন জ্বালানো সহজ ব্যাপার না। একের পর এক দেয়াশলাইয়ের কাঠি নিভে যাবে। দেয়াশলাইয়ের কাঠির সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকবে। মনের ভেতর তৈরি হবে টেনশান — শেষ পর্যন্ত ধরানো যাবে তো? টেনশানেরও মজা আছে। আতাহারকে কোন টেনশানের ভেতর দিয়ে যেতে হল না — প্রথমবারেই

সিগারেট জ্বলে উঠল। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় কবিতার লাইন চলে এল।

যতই আমি দূরে যেতে চাই ততই আসি কাছে
আমার গায়ে তাহার গায়ের গন্ধ লেগে আছে।

না, ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কলেজ ম্যাগাজিনের কবিতা। তা ছাড়া গায়ে কখনো গন্ধ লেগে থাকে না। লাক্স সাবান দিয়ে গোসল করলেই গন্ধ ধুয়ে চলে যায় — গন্ধ যদি লেগে থাকার হয় তাহলে লেগে থাকে — মনে। কাজেই এই বিষয়টি থাক, বাবার ছাত্রীকে নিয়ে বরং একটা কিছু লেখা যাক।

আমি যাচ্ছি নাখালপাড়ায়।
আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে পাঠাচ্ছেন তাঁর
প্রথম প্রেমিকার কাছে।
আমার প্যান্টের পকেটে শাদা খামে মোড়া বাবার লেখা দীর্ঘ পত্র।
খুব যত্নে খামের উপর তিনি তাঁর প্রণয়িনীর নাম লিখেছেন।
কে জানে চিঠিতে কি লেখা — ?
তাঁর শরীরের সাম্প্রতিক অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনা ?
রাতে ঘুম হচ্ছে না, রক্তে সুগার বেড়ে গেছে
কষ্ট পাচ্ছেন হাঁপানিতে — এইসব হাবিজাবি। প্রেমিকার কাছে
লেখা চিঠি বয়সের ভারে প্রসঙ্গ পাল্টায়
অন্য রকম হয়ে যায়।
সেখানে জোছনার কথা থাকে না,
সাম্প্রতিক শ্বাসকষ্ট বড় হয়ে ওঠে।
প্রেমিকাও একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর
রোগভুগের কথা পড়তে ভালবাসেন।
চিঠি পড়তে পড়তে দরদে গলিত হন —
আহা, বেচারা ইদানীং বড্ড কষ্ট পাচ্ছে তো . . .

মা-মা চেহারার এক মহিলা দরজা খুলে আশ্চর্য রকম মিষ্টি গলায় বললেন, কে ? আতাহার হকচকিয়ে গেল। ফরিদা হক নামের একজন মহিলার যে ছবি মাথায় নিয়ে সে এসেছে — এই মহিলার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। দরজা খুলেছেন মাথায় কাপড় দেয়া রোগা শ্যামলা একজন মহিলা, যার চোখ আশ্চর্য সুন্দর, গলার স্বর অদ্ভুত মিষ্টি। নিশ্চয়ই এই মহিলা ফরিদা হক না, অন্য কেউ। ফরিদা হকের দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয়।

মহিলা আবার বললেন, কে ?

'জ্বি, আমার নাম আতাহার। বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার বাবার নাম রশীদ আলি।'

'ও, তুমি রশীদ স্যারের ছেলে। তোমার যখন তিন-চার বৎসর বয়স তখন তোমাকে

দেখেছি। তোমার চেহারা তো একদম পাল্টে গেছে।'

আতাহার বলল, জ্বি, তখন আমার দাড়ি ছিল না।

মহিলা খিলখিল করে হেসে ফেললেন। গলার স্বরের মত এই মহিলার হাসিও মিষ্টি।

'এসো বাবা, ভেতরে এসো।'

'জ্বি না, আমি চলে যাব। আমার খুব জরুরী একটা কাজ আছে। বাবা আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।'

'তুমি ভেতরে আস তো।'

আতাহার ঘরে ঢুকল। সুন্দর ছিমছাম একটা বসার ঘর। বেতের চেয়ার। চেয়ারের কুশনগুলি ধবধবে পরিষ্কার। মেঝেতে কার্পেট নেই তবে মেঝে ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে খালি গায়ে এই মেঝেতে শুয়ে বই পড়লে খুব আরাম হবে।

'বাবা, তুমি ফ্যানের নিচে এই চেয়ারটায় বস তো। ঘেমে একেবারে নেয়ে গেছ। সরবত বানিয়ে দেই — সরবত খাবে?'

'জ্বি না, আমি সরবত খাই না।'

'আজকালকার ছেলেরা চা ছাড়া আর কিছু খেতে চায় না — অথচ গরমের মধ্যে তেতুলের সরবতের মত ভাল জিনিস আর কিচ্ছু নেই। একটু তেতুলের সরবত করে দেই? তেতুল ভিজানো আছে।'

'আমি টক খাই না। আমার পেটে আলসার আছে।'

'তাহলে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাও। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। ইশ, কি ঘামা ঘেমেছ!'

ভদ্রমহিলা পানি আনতে গেলেন। আতাহারের আগে তৃষ্ণা পায়নি — কিন্তু চিঠির জন্যে পকেটে হাত দিয়ে তৃষ্ণা পেয়ে গেল। পকেটে চিঠি নেই। পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করার সময় নির্ঘাৎ পড়ে গেছে। কি সর্বনাশের কথা! আতাহার এক চুমুকে পানির গ্লাস শেষ করে নিচু গলায় বলল, বাবার চিঠিটা হারিয়ে ফেলেছি। প্যান্টের পকেটে ছিল — মনে হয় রাস্তায় কোথাও পড়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা বললেন, হারিয়ে গেলে তো করার কিছু নেই। তুমি এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? চিঠি হারিয়ে গেছে শুনলে স্যার রাগ করবেন?

'জ্বি।'

'চট করে রেগে যাবার ব্যাপারটা অবশ্যি স্যারের মধ্যে আছে — যাই হোক, উনাকে বলার দরকার নেই যে তুমি চিঠি হারিয়ে ফেলেছ। বলবে আমাকে চিঠি দিয়েছ।'

'জ্বি আচ্ছা। আমি তাহলে যাই।'

'আরেকটু বসে যাও। গায়ের ঘামটা মরুক।'

আতাহার গায়ের ঘাম মরার জন্যে অপেক্ষা করল না। জীবিত ঘাম নিয়েই বের হয়ে পড়ল। সাজ্জাদের খোঁজ বের করতে হবে। কোথায় সে ডুব মেরেছে কে জানে। সাজ্জাদকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে যেতে ইচ্ছা করছে। শহর আর ভাল লাগছে না।

কবি

গত চার দিন ধরে সাজ্জাদ ভূতের গলির এক বাসায় আছে। এই চার দিন দাড়ি-গোঁফ কামায়নি। তার মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ব্রাশের অভাবে মাজা হয় নি বলে — হলুদ দাঁত। ঘুম মোটেই ভাল হচ্ছে না। ঘুমের অভাবে চোখের নিচে কালি পড়েছে।

তিন কামরার এই বাড়িটি হাফ বিল্ডিং। ছাদ টিনের। দিনের বেলা এই ছাদ তেতে আগুন হয়ে থাকে। টিনের বাড়িগুলির উত্তাপ রাতে কমার কথা। এখানে কমছে না, বরং বাড়ছে। শোবার ঘরে কয়েকটা জানালা। জানালায় তারের জালি দেয়া। মশা-মাছি আটকানোর জন্য তারের জালি — মশা-মাছির তাতে অসুবিধা হচ্ছে না। আটকে যাচ্ছে বাতাস। একফোঁটা বাতাস নেই।

বাড়ির মূল মালিক মোসাদ্দেক হোসেনের তাতে কোন অসুবিধা হয় না। ভদ্রলোকের নির্বিকার থাকার ক্ষমতা দেখে সাজ্জাদ বিস্মিত ও অভিভূত।

মোসাদ্দেক সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁর স্বাস্থ্য অসম্ভব ভাল। গাট্টাগোট্টা ধরনের চেহারা। অতি অল্পভাষী। তবে হাস্যমুখ। সারাক্ষণ মুখে হাসি লেগে আছে। চুলটানা স্বভাব আছে। এক হাতে সারাক্ষণ মাথার চুল টানছেন। গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এরকম কালো মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না।

ভদ্রলোক ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা প্রথম ব্যাচের ছাত্র। শিল্পীর শোবার ঘরের দেয়ালে ছবি-টবি থাকার কথা। মোসাদ্দেক সাহেবের বাড়ির দেয়াল বলতে গেলে খালি। দেয়ালে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের দু' বছর আগের একটা ক্যালেন্ডার আছে। ক্যালেন্ডারের পাশে দামী ফ্রেমে বাঁধাই করা একটা চিঠি। চিঠিটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ চিঠিটি লিখেছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। স্পেনের মাদ্রিদের এক হোটেলের প্যাডে গুটি গুটি হরফে লেখা চিঠি।

> মোসাদ্দেক,
>
> আমি আমার জীবনে অনেক অপদার্থ দেখেছি — তোমার মত কাউকে দেখি নাই। অকর্মন্যতা, অলসতা এবং স্থবিরতা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া উচিত। আমাদের দুর্ভাগ্য, তা হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে অকর্মন্যতা ও অলসতাকে গ্লোরিফাই করা হয়।
>
> তোমার অকর্মন্যতা আমাকে সতত পীড়া দেয়। মনে রাখবে, অব্যবহারে ইস্পাতের তৈরি অতি ধারালো যন্ত্রেও মরিচা ধরে।

বিশেষ আর কি। কিছুদিন যাবৎ শরীর ভাল যাচ্ছে না। দুর্বল পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ায় কষ্ট পাচ্ছি।

ভাল থাক এবং গা ঝাড়া দিয়ে উঠ। ইতি —

বিষয়বস্তু ছাড়াও চিঠিটির আর একটি গুরুত্ব আছে — চিঠির শেষে ফাঁকা জায়গাটা শিল্পাচার্য ফাঁকা রাখেননি। যে কলমে চিঠি লেখা হচ্ছিল সেই কলমের কয়েক টানে রাস্তার একটা স্কেচ করে দিয়েছেন।

মোসাদ্দেক সাহেব চিঠি বাঁধিয়ে রেখেছেন স্কেচটির জন্যে। তাঁর ধারণা, জয়নুল আবেদীনের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজের মধ্যে এটি একটি। সৃষ্টিশীল মানুষ তার অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি কখনো খুব ভেবেচিন্তে করেন না। সেই সব কাজ হঠাৎ করে তৈরি হয়। কাজের শুরুতে তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারেন না। মাদ্রিদের যে রাস্তার ছবিটি আঁকা হয়েছে সেই রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। দুজন তরুণী মেয়ে রাস্তা ধরে এগুচ্ছে। শিল্পী তাদের পিছনটা এঁকেছেন। একটি মেয়ে মুখ ফিরিয়ে তার বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করছে বলে তার মুখের কিছু অংশ ধরা পড়েছে।

মোসাদ্দেক সাহেব মাথার চুল টানতে টানতে ছবিটির দিকে তাকান এবং বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেন, বড় মাপের একজন শিল্পী সামান্য জায়গায় কি অসাধারণ কাজ করতে পারেন। সামান্য কয়েকটি টানে শহরের রাজপথে প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। দুটি তরুণী মেয়ে হাসতে হাসতে, গল্প করতে করতে যাচ্ছে — মনে হচ্ছে তাদের সঙ্গে রাস্তাটাও হাসতে হাসতে এগুচ্ছে। রাস্তা যেন রাস্তা না, বহমান নদী। মোসাদ্দেক সাহেবের ইচ্ছা আছে — টাকাপয়সা হলে কোন একদিন মাদ্রিদে গিয়ে রাস্তাটা দেখে আসবেন। সেই সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

মোসাদ্দেক সাহেবের স্থায়ী কোন রোজগার নেই। রোজগারের চেষ্টাও নেই। বর্তমানে তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা তিনি রিকশা এবং বেবীটেক্সীর পেছনে চিত্রকলা নির্মাণে ব্যয় করছেন। কাজগুলি তিনি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে করেন। এবং তাঁকে প্রচুর মেধাও ব্যয় করতে হয়। ছবিগুলি এমন হতে হবে যেন ছবি দেখে কেউ বুঝতে না পারে একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং সম্ভাবনাময় শিল্পী ছবি এঁকেছেন। আনাড়ি কাঁচা হাতের শিল্পীর মত করে ছবি আঁকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। মোসাদ্দেক সাহেব দুরূহ কাজটি তৃপ্তির সঙ্গে করেন। ছবি আঁকা শেষ হলে ইংরেজিতে লিখে দেন — Art by M. Hossain. মাঝে মাঝে by–এর জায়গায় লেখেন dy. 'b' এবং 'd'–এর মধ্যে মূর্খ শিল্পী যে ভুল করেন তাঁকেও তাই করতে হয়। ছবির সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে কথাবার্তা লিখতে হয়। বেশির ভাগ বেবীটেক্সীতে লিখতে হয় — "মায়ের দোয়া।" বেবীটেক্সীওয়ালারা রিকশাওয়ালাদের তুলনায় বেশি মাতৃভক্ত। রিকশায় লিখতে হয় টিভি এবং সিনেমার চালু সংলাপ, যেমন — "শান্তি নাই," "থামলে ভাল লাগে," "বিষয়টা কি?"। মোসাদ্দেক সাহেব টিভি–সিনেমা কোনটাই দেখেন না। সংলাপ লেখার সময় বুঝতে পারেন বাজারে এখন কি চলছে। তিনি মাঝে মাঝে কিছু রসিকতাও করেন। যেমন এক

টেম্পোত "ছাদে উঠা নিষেধ" লিখে দেয়ার কথা, তিনি লিখে দিলেন "চাঁদে ওঠা নিষেধ"।

এইসব কাজ ছাড়াও তিনি অর্ডার পেলে ন্যুড ছবি এঁকে দেন। নব্য ধনীদের জন্যে এইসব আঁকা হয়। ন্যুড মেয়েদের মুখ নব্য ধনীদের পছন্দসই কোন মুখের মত হতে হয়। ফিগারের জন্যে তিনি মডেল ব্যবহার করেন। তাঁর পরিচিত তিন–চারজন মডেল আছে। খবর দিলে তারা আসে। ঘণ্টা হিসাবে সিটিং দেয়। প্রতি ঘণ্টা পঁচিশ টাকা। খাওয়ার সময় খাওয়া–দাওয়া।

সাজ্জাদ মডেল দেখে ছবি আঁকার প্রক্রিয়াটা দেখার জন্যে মোসাদ্দেক সাহেবের কাছে এসে আটকা পড়ে গেল। গত চার রাত গরমে সিদ্ধ হয়ে সে মোসাদ্দেক সাহেবের সঙ্গে এক খাটে ঘুমিয়েছে। রাতে দোকান থেকে শিক কাবাব এবং নানরুটি এনে খেয়েছে।

মোসাদ্দেক সাহেব সারাদিনে একবেলা খান। সাজ্জাদকে তিনি বলেছেন, আমি কুকুর স্বভাবের মানুষ। কুকুর সারাদিনে একবার খায় — আমিও একবার খাই। তুমি আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে না — তুমি দুপুরে খেয়ে এসো। 'বিসমিল্লাহ' হোটেলে গিয়ে বলবে — মনা মিয়া পাঠিয়েছে। তাহলে পয়সা দিতে হবে না। আমার খাতা আছে, খাতায় নাম তুলে রাখবে।

সাজ্জাদ হোটেলে যায়নি। চিনি–দুধবিহীন কাপের পর কাপ কড়া চা খেয়ে খিদে নষ্ট করেছে। প্রায় কুকুরের মতই হুমহাম শব্দ করে শিক কাবাব নানরুটি খেয়েছে। জীবনটাকে তার অনেক দিন পর অর্থবহ মনে হয়েছে।

মোসাদ্দেক সাহেবকে তার যেমন মনে ধরেছে — মোসাদ্দেক সাহেবের মডেলকেও মনে ধরেছে। মডেল মেয়েটির নাম কণা। মেয়েটির বছরখানেক আগে বিয়ে হয়েছে। স্বামী একটা ফার্মেসীতে সেলসম্যান। মাসে পনেরশ টাকা পায়। এক কামরার যে ঘরে তারা দুইজন বাস করে তার ভাড়া ন'শ টাকা। বাকি ছয় শ টাকায় সংসার চলে না। কণাকে বাড়তি রোজগারের চেষ্টা করতে হয়।

মেয়েটি দেখতে সুন্দর। কথাবার্তা অতি মার্জিত। মোসাদ্দেক সাহেবকে সে বড় ভাইজান বলে ডাকে। সাজ্জাদ লক্ষ্য করল ন্যুড সিটিং দেয়ার ব্যাপারে মেয়েটির ভিতরে কোনরকম লজ্জা বা সংকোচ নেই। সাজ্জাদ একজন অপরিচিত মানুষ। অপরিচিতের সামনে নিজেকে নগ্ন করার স্বাভাবিক লজ্জাও কণার ভেতরে পুরোপুরি অনুপস্থিত।

এক ঘণ্টার মত সিটিং–এর পর পাঁচ–দশ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম দেয়া হয়। মোসাদ্দেক সাহেব এই সময়ে চা খান, সিগারেট খান। কণা তখন অতি দ্রুত শাড়ি নিজের গায়ে জড়িয়ে স্বাভাবিক গলায় গল্প করে। সাজ্জাদ মেয়েটির খাপ খাইয়ে নেয়ার শক্তি দেখে মোহিত হল। মেয়েটি তাকে সাজ্জাদ ভাই বলছে এবং এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলছে যেন আসলেই সাজ্জাদ তার ভাই।

'বুঝলেন সাজ্জাদ ভাই, ঢাকা শহরে কত কিছু দেখলাম। আসল জিনিস দেখা হয় নাই।'

'আসল জিনিস কি?'

'চিড়িয়াখানা। আমি প্রতি সপ্তাহে একবার করে ওকে বলি — চিড়িয়াখানায় নিয়ে

যাও। সে খালি বলে, আচ্ছা আচ্ছা।'

'তোমার স্বামী পশু-পাখি পছন্দ করে না?'

'তার পছন্দ-অপছন্দ নাই। তার হল আলসি।'

'আলসি?'

'গ্রাম্য ভাষা বললাম। অলস, সে বড়ই অলস।'

'শব্দটা সুন্দর — আলসি। যাই হোক, একদিন তোমাকে আর তোমার আলসী স্বামীকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে নিয়ে আসব।'

'সত্যি দেখাবেন?'

'মনে থাকলে দেখাব। আমার আবার কিছুই মনে থাকে না। যাদের কিছুই মনে থাকে না গ্রাম্য ভাষায় তাদের কি বলে?'

'বেভুইল্যা।'

'বেভুইল্যা?'

'হুঁ।'

কণা হাসছে। সুন্দর করে হাসছে। সাজ্জাদ বলল, তুমি যে মডেল হয়ে সিটিং দাও তোমার স্বামী জানে?'

'জানবে না কেন? সেই তো জোগাড় করল।'

'সে জোগাড় করে দিয়েছে?'

'হুঁ। তার ফার্মেসীর পাশে ছবি বিক্রির একটা বড় দোকান আছে — ঋতু গ্যালারী। ওদের সাথে কথাবার্তা বলে একদিন আমারে বলল, কাজ করবা?'

আমি বললাম, হুঁ করব।

সে রাগী গলায় বলল, কি কাজ না শুনেই বললা — করব? আগে শোন কি কাজ।

আমি বললাম, কাজ হল কাজ। কাজের আবার শোনাশুনি কি?

সাজ্জাদ বলল, কাজটা কি তোমার পছন্দ হয়েছে?

কণা হাসতে হাসতে বলল, না। পছন্দ না হইলেও তো করনের কিছু নাই। মানুষের পছন্দ-অপছন্দে দুনিয়া চলে না। দুনিয়া চলে তার নিজের পছন্দে। সেই পছন্দ ভাল লাগলে ভাল। ভাল না লাগলে নাই।

মোসাদ্দেক চোখের ইশারা করলেন। কণা তৎক্ষণাৎ গায়ের কাপড় খুলে টুলে গিয়ে বসল। তার মধ্যে কোন রকম বিকার, কোন রকম অস্বাভাবিকতা দেখা গেল না।

সাজ্জাদ মোসাদ্দেকের দিকে তাকিয়ে বলল, মোসাদ্দেক ভাই, আমি চললাম।

মোসাদ্দেক হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। তাঁর চোখ কণার দিকে। তাঁর হাতে পেনসিল এবং ব্লেড। কণার দিকে তাকিয়েই তিনি পেনসিলের মাথা কাটছেন। কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে না।

রাস্তায় নেমে সাজ্জাদের মনে হল — ভুল হয়েছে, আরো কিছুক্ষণ মোসাদ্দেক সাহেবের সঙ্গে থাকলে হত। আলসি স্বামীর স্ত্রীটির সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছিল।

আজকাল তার কি যে হয়েছে, কারো সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। কথা বলে আরাম পাওয়ার একটা ব্যাপার আছে — সেটা হচ্ছে না।

তিনটার মত বাজে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। বেশিক্ষণ এই রোদে হাঁটলে সানস্ট্রোক হবার কথা। সাজ্জাদের মাথা ঝিম ঝিম করছে। তার গায়ে কালো রঙের বুশ শার্ট। শার্টটা বাইরের সব উত্তাপ শুষে নিচ্ছে। তার গা দিয়ে রীতিমত ভাপ বেরুচ্ছে। সে অবশ্যি হাঁটছে মোটামুটি নির্বিকার ভঙ্গিতে। তাকে দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক না যে, সে হেঁটে আনন্দ পাচ্ছে। দু'দিকে কৌতূহলী চোখ ফেলে ফেলে সে এগুচ্ছে। দেখার মত দৃশ্য দু'দিকে প্রচুর আছে।

সে ফার্মগেট ছাড়িয়ে চলে এসেছে। এখন রাস্তার দু'পাশেই কৃষ্ণচূড়া গাছ। রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুল ফুটেছে। রোদের আগুন ফুল হয়ে ফুটেছে এরকম ভাবা যেতে পারে। কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখতে দেখতে চোখ যখন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে তখন চোখ পড়ছে জারুল গাছে। গাছ ভর্তি থোকা থোকা নীল ফুল। কৃষ্ণচূড়া ফুল যদি আগুনের ফুল হয় তাহলে . . . জারুল ফুলে হল জোছনার ফুল। এই দুই ফুল পাশাপাশি যেতে পারে না। নগর যারা পরিকল্পনা করেন তাদের অফিসে বেতনভুক কিছু কবি থাকা দরকার। কবিরা ঠিক করবেন কোথায় কোন গাছ হবে।

বড় নগরীর পরিকল্পনা করা হবে ঋতুর দিকে তাকিয়ে। নগরীর একটা অংশের নাম হবে বর্ষা নগর। সেই অংশে থাকবে শুধুই কদম গাছ। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কদম গাছ। বর্ষার প্রথম জলধারায় ফুটবে সোনালী ফুল —। আহা, কি দর্শনীয় হবে সেই নগর ! সেই নগরে ছাতা নিষিদ্ধ। বৃষ্টির সময় ভিজে ভিজে সবাইকে যাতায়াত করতে হবে।

নগরীর একটা অংশের নাম হবে গ্রীষ্ম। সেই অংশে থাকবে শুধুই কৃষ্ণচূড়া। বৈশাখ মাসে মনে হবে নগরীতে আগুন ধরে গেছে।

সাজ্জাদের পানির পিপাসা পেয়ে গেল। পিপাসার ধরনটা ভাল না। সাধারণত পানির পিপাসা বুকের ভেতরে হয় — তার পিপাসা সারা শরীরে হচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া, কদম, জারুল কোন গাছই এখন তাকে আকর্ষণ করছে না। তার চোখে এখন একটা বাথটাবের ছবি ভাসছে। তার নিজের ঘরের বাথটাব। কানায় কানায় টলটলে পানিতে ভর্তি। তার উপর বরফের কুঁচি ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। বরফ ভাসছে। বাথটাবের পাশে ছোট্ট একটা টেবিল যার টপটা মার্বেল পাথরের। সেই টেবিলে পাশাপাশি দু'টা পানির গ্লাস। বাথটাবের মত পানির গ্লাস দু'টিও কানায় কানায় ভর্তি। বরফ চিনির দানার মত গুড়ো করে গ্লাসে দেয়া হয়েছে। গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে।

সাজ্জাদ এখন আর হাঁটছে না। দাঁড়িয়ে আছে। কোন খালি রিকশা দেখলেই লাফিয়ে উঠে পড়তে হবে। খালি রিকশা দেখা যাচ্ছে না। হুস হুস করে কয়েকটা বেবীটেক্সি গেল। সবক'টা যাত্রী বোঝাই। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের দিনে খালি রিক্সা খালি বেবীটেক্সি চলাচল করে না। প্রাইভেট গাড়ি, মাইক্রোবাস প্রচুর যাতায়াত করছে। হাত তুললে এরা কেউ কি থামবে ? মনে হয় না। সাজ্জাদের মাথা এখন ফাঁকা ফাঁকা লাগতে

শুরু করেছে। এটা সানস্ট্রোকের আগের ধাপ কিনা সে বুঝতে পারছে না। মাথার ভেতর বিজ বিজ করে কে যেন আবার কথাও বলছে — কবিতার লাইন।

"সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর প্রাচীরের তলে
একদা দিলেন সুপ্ত।"

ক্লাস সিক্সে বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণীর দিন আবৃত্তি করার জন্যে এই দীর্ঘ কবিতাটি সে মুখস্থ করেছিল। উৎসবের দিন প্রথম তিন লাইন বলার পর কবিতা আর মনে পড়ে না। শত শত মানুষ তাকিয়ে আছে তার দিকে। উইংসের আড়াল থেকে বাংলা স্যার চাপা গলায় বললেন — কি হল ! এই গাধা ! সে তখন আবার গোড়া থেকে শুরু করল। তিন লাইন বলার পর আবার আটকে গেল। দর্শকদের ভেতর থেকে চাপা হাসি শুরু হল। বাংলা স্যার ক্রুদ্ধ গলায় বললেন,— এই গাধার বাচ্চা, চলে আয়। সে চলে না এসে আবারো গোড়া থেকে শুরু করল। আবারো তিন লাইনে আটকে গেল। শুরু হল প্রচণ্ড হাসাহাসি। বাংলা স্যার উইংসের আড়াল থেকে এসে হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ভেতরে নিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরো কবিতাটা তার মনে পড়ল। এখনো যে কোন দুঃসময়ে ফট করে কবিতাটা মাথার ভেতর চলে আসে। মাথার ভেতরে বসে কেউ একজন গম্ভীর এবং ভারি গলায় পুরো কবিতা আবৃত্তি করেন।

এখনো আবৃত্তি শুরু হয়েছে। পুরো কবিতাটা শেষ না হলে তা বন্ধ হবে না। সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে আছে। অসহায় মুখ করে কবিতা শুনছে — রোদ মনে হয় আরো বাড়ছে — রাস্তার পিচ গলে যাচ্ছে —

নগরীর দীপ নিবেছে পবনে,
দুয়ার রুদ্ধ পৌর ভবনে,
নিশীথের তারা শ্রাবণ গগনে
ঘন মেঘে অবলুপ্ত।

কাহার নূপুরশিঞ্জিত পদ
সহসা বাজিল বক্ষে . . .

সাজ্জাদ বাসায় এসে পৌঁছল সাড়ে তিনটার দিকে। তার সারা শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। মুখ শুকিয়ে এতটুক হয়ে গেছে। নীতু বলল, ভাইয়া, এ কি অবস্থা ! সাজ্জাদ হাসিমুখে বলল, অবস্থা খুবই খারাপ। মনে হয় কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্তেকাল করব। চার মাইল দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছি।

'আগামীকাল তোমার ইন্টারভিউ, মনে আছে ?'

'আগামীকালেরটা আগামীকাল দেখা যাবে। তিন বোতল ঠাণ্ডা পানি নিয়ে আয়।'

'গতকাল তোমার জন্যে থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়েছে। বাবার ধারণা তোমাকে গুম খুন করা হয়েছে। বাবা খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।'

'কথা বলে সময় নষ্ট করিস না নীতু। ঘরে কি বার্নল আছে?'

'বার্নল কি জন্যে?'

'গায়ে মাখব। সারা শরীরে ফোসফা পড়ে গেছে।'

'তুমি এই ক'দিন কোথায় ছিলে?'

'ব্যানানা গার্ডেন।'

'সেটা কোথায়?'

'সেটা হচ্ছে কলাবাগান। নীতু, দাঁড়িয়ে বক বক করিস না — পানি, জল, অম্বু...

'তুমি যতই পানি পানি করে চেঁচাও তোমাকে এখন পানি দেব না। তুমি একটু নরম্যাল হও। ফ্যানের নিচে চুপ করে দাঁড়াও। এখন পানি খেলেই তোমার অসুখ করবে।'

'অসুখ করলে করবে। অসুখের চিকিৎসা আছে। মরে গেলে চিকিৎসার বাইরে চলে যাব রে নীতু।'

সাজ্জাদ সোফায় গা এলিয়ে বসল। নীতু ট্রেতে করে পানির বোতল এবং গ্লাস এনে দেখে সাজ্জাদ ঘুমুচ্ছে। গভীর ঘুম। তাকে দেখে মনে হচ্ছে গত পাঁচ দিন সে ঘুমায়নি।

'ভাইয়া, পানি এনেছি। পানি খেয়ে বিছানায় গিয়ে ঘুমাও।'

সাজ্জাদ চোখ মেলে নীতুকে দেখল, পানির বোতল-গ্লাস দেখল, আবার চোখ বন্ধ করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। তার ঘুম ভাঙল সন্ধ্যায় — ঝড়ের শব্দে। তখন বাড়ির সবাই ছোটাছুটি করে দরজা-জানালা বন্ধ করছে। শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে বাইরে। তাদের বাড়ির সামনের দীর্ঘ দিনের পুরানো আম গাছ সশব্দে ভেঙে তাদের বাড়ির উপর পড়ল। জানালার ভাঙা কাচে নীতুর হাত কেটে গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল। রান্নাঘরে কাজের বুয়া আটকা পড়ে গেল। ঝড় রান্নাঘরের দরজা চেপে ধরেছে। কাজের বুয়া প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেই দরজা এক ইঞ্চিও খুলতে পারল না। সে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল — আফা গো! ও আফা! মইরা গেলাম গো আফা! হোসেন সাহেব অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি উত্তেজনার দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না, ঝড়ের পরবর্তী ধাক্কাটার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

বৈশাখের ঝড়ের স্থায়িত্ব কম। ঝড় আসে, ছোট্ট একটা অঞ্চল লণ্ডভণ্ড করে চলে যায়। সেদিনের ঝড় ঢাকা শহরের তেমন কোন ক্ষতি করল না — শুধু হোসেন সাহেবের বাড়িতে প্রবল একটা ছোঁবল বসাল।

হোসেন সাহেবের স্থান হল সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে। তাঁর বিছানার পাশে সাজ্জাদ বসে আছে। সাজ্জাদের মুখ হাসি হাসি। তিনি ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে তাকালেন। সাজ্জাদ বলল, আরাম করে একটা লম্বা ঘুম দাও তো বাবা।

তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার কি হয়েছে?

'তোমার মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশন হয়েছে। ঝড় দেখে ভয়ে তোমার পিলে চমকে গেছে। সেখান থেকে হার্ট এ্যাটাক।'

ছেলে রসিকতা করছে কি-না তিনি বুঝতে পারছেন না। হার্ট এ্যাটাক কোন আনন্দজনক ব্যাপার না যে হাসিমুখে সংবাদটা দিতে হবে।

'এটা কোন হাসপাতাল?'

'সোহরাওয়ার্দি হাসপাতাল। তোমাকে জায়গামতই এনে ফেলেছি। ভয় পাচ্ছ?'

'না।'

'ভেরী গুড। তোমার এ্যাটাকটা মাইল্ড টাইপের — ভালমন্দ কিছু হবার কথাও না। ঘুমের অষুধ দেয়া হয়েছে। টানা একটা ঘুম দাও। সকালে এসে তোমাকে বাড়িতে নিয়ে যাব।'

'আমি এখানে একা থাকব?'

'একা কোথায়? শত শত রোগী আছে তোমার সঙ্গে।'

'আমাকে ফেলে চলে যাবি?'

'বাড়তি লোক থাকার কোন ব্যবস্থা নেই বাবা। তোমাকে কেবিন দেয়া হয়নি। কেবিন দিলে মেঝেতে চাদর বিছিয়ে শুয়ে থাকতাম।'

'কেবিন দেয়নি?'

'না।'

'তুই আমার পরিচয় দিস নাই?'

'পরিচয় দেব না কেন? তোমার নাম বলেছি, বাড়ির ঠিকানা বলেছি।'

হোসেন সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, আর কিছু বলিসনি?

'আর বলার কি আছে?'

বিস্ময়ে হোসেন সাহেবের বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। কি বলছে এই ছেলে! নাম আর বাড়ির ঠিকানা। এর বাইরে তার নাকি আর বলার কিছু নেই? তার এই গাধা ছেলে কি জানে না তাঁর হার্ট এ্যাটাক হয়েছে এই খবরটা প্রচার হলে আধঘন্টার মধ্যে খুব কম করে হলেও তিনজন মন্ত্রী ফ্ল্যাগ গাড়ি নিয়ে চলে আসবেন? প্রধানমন্ত্রী নিজে টেলিফোনে তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজ নেবেন। দেশের প্রতিটি প্রধান দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় ছবিসহ তার সংবাদ ছাপা হবে। গাধা ছেলে কি পত্রিকায় খবর দিয়েছে? মনে হয় না। যে ছেলে মনে করে শুধু নাম আর ঠিকানাতেই তার পরিচয়, তার কাছ থেকে এরচে বেশি কি আশা করা যায়?

তিনি চারদিকে তাকালেন — হলঘরের মত একটা ঘরে তাঁকে ফেলে রেখেছে। চারপাশে গিজ গিজ করছে রোগী। এতদিন তাঁর মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল — হার্টের ব্যামো শুধু বিত্তবানদেরই হয় —। এই ধারণা তাঁর এখন ভেঙেছে। তার চারপাশে আজেবাজে টাইপের লোক। একজন তাঁর চোখের সামনে নাকের সর্দি ঝাড়ল। সর্দি মাখা আঙ্গুল নির্বিকার ভঙ্গিতে নিজের শার্টে মুছে ফেলল। এখন সে আবার পানের কৌটা খুলে সর্দি ভেজা নোংরা হাতে পান বানাচ্ছে। ওহ্ গড! একটা টেলিফোন করা দরকার।

খুবই দরকার। এই ওয়ার্ডে কি কোন ডাক্তার নেই? ডাক্তারকে বলে একটা টেলিফোন করানো যায় না?

পাশের বেড থেকে এক বৃদ্ধ বলল, কি খুঁজেন চাচা মিয়া?

হোসেন সাহেব জবাব দিলেন না। এরা কথা বলার মত কেউ না। তিনি ভেবে পেলেন না — রাস্তার সব ফকির ধরে এরা হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে কি–না। কেউ একা আসেনি। সবার সঙ্গে একজন–দু'জন করে আত্মীয় আছে। এরা রোগীর পাশে জায়গা করে দিব্যি গুটিশুটি মেরে ঘুমুবার আয়োজন করছে। একজন আবার চার–পাঁচ বছরের বাচ্চা নিয়ে এসেছে। বাচ্চাটা পুরোপরি উদোম। কোমরে শুধু কালো ঘুনশি। বাচ্চাটার হাতে পাউরুটি। সে পাউরুটির টুকরা কামড় দিয়ে ছিড়ছে এবং থু করে মেঝেতে ফেলছে। একজন আবার সঙ্গে সঙ্গে মেঝে থেকে সেই টুকরা তুলে বিছানায় জমা করছে। এক সময় নিশ্চয়ই এই টুকরাগুলি খাওয়া হবে। হোসেন সাহেব আবার বিড় বিড় করে বললেন, ওহ গড!

হোসেন সাহেব বিছানায় উঠে বসলেন। ঘরের এক মাথায় চেয়ার–টেবিল পেতে দু'জন তরুণ–তরুণী বসে আছে। তরুণীর গায়ে এপ্রন দেখে মনে হচ্ছে সে ডাক্তার। হোসেন সাহেব হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। মেয়েটি তা দেখেও উঠে এল না। সে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করেই যেতে লাগল।

পাশের বেডের বুড়ো আবার বলল, আপনের কিছু লাগব চাচা মিয়া? আমারে কন দেহি। আমার লোক আছে। সংগ্রহ কইরা দিব।

সবারই লোক আছে। রাস্তার ভিক্ষুকের মত দেখতে বুড়োও বলছে তার লোক আছে — অথচ তাঁর কেউ নেই। তাঁর ছেলে তাকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে চলে গেছে। পরিচয় হিসেবে শুধু নাম আর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে গেছে। কাউকে বোধহয় টেলিফোন করেও খবর দেয়নি। খবর দিলে এতক্ষণে ভিজিটাররা আসতে শুরু করতো। হাসপাতালের টনক নড়ে যেত।

তরুণী ডাক্তারনি এতক্ষণে তাঁকে দেখল। সে উঠে আসছে। বিরক্ত মুখে উঠে আসছে। এত বিরক্ত হবার কি আছে? হোসেন সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

'কি হয়েছে আপনার?'

'একটা টেলিফোন করব।'

'টেলিফোন করবেন কেন? কোন সমস্যা হচ্ছে?'

'জ্বি না।'

'সমস্যা না হলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন। রেস্ট নিন। বসে থাকবেন না। শুয়ে পড়ুন।'

হোসেন সাহেব শুয়ে পড়লেন। মেয়েটি তাঁর লোহার খাটের পায়ের কাছ থেকে একটা কার্ড নিয়ে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ দেখল। তারপর যে রকম বিরক্ত ভঙ্গিতে এসেছিল সে রকম বিরক্ত ভঙ্গিতে চলে গেল। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন নার্স হাতে একটা ট্যাবলেট এবং পানির গ্লাস নিয়ে উপস্থিত হল। ঘুমের অষুধ। ডাক্তার মেয়েটি বোধহয় পাঠিয়েছে।

তিনি অষুধ খেয়ে নিলেন। এখনো ঘুম আসছে না। আসবে বলেও মনে হচ্ছে না। না আসাই ভাল। ভিজিটাররা আসবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। সাজ্জাদ কাউকে কিছু না জানালেও নীতু জানাবে। একজন কেউ জানলেই সেটা ছড়িয়ে পড়বে। খবরের কাগজ থেকেও লোকজন আসতে পারে। তাদের সঙ্গে দু'-একটা হালকা এবং মজার ধরনের কথা বলতে হবে। সে কথাগুলি আগে গুছিয়ে রাখলে ভাল হয়। হার্ট বিষয়ক ইন্টারেস্টিং কোন কথা।

"মানুষ তার আবেগ, ভালবাসা, ঘৃণার জন্ম ও অবস্থানের জন্যে যে স্থান নির্ধারিত করেছে সেটা হল হৃদপিণ্ড। হার্ট। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের ধারণা — যাবতীয় ইমোশনের জন্ম-মৃত্যু হৃদপিণ্ডে। এর কারণ কি জানেন? এর কারণ হল – মানুষের শরীরের এই একটি অংশই দিবারাত্রি স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দন কখনো থামে না।"

হার্ট সম্পর্কে আরো কিছু বলতে পারলে ভাল হত। মনে পড়ছে না। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকাটা হাতের কাছে থাকলে দেখে নেয়া যেত। টেলিফোন করতে পারলে নীতুকে বলে দিতেন ড্রাইভারকে দিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়াটা পাঠিয়ে দিতে। আর ফ্লাস্কে করে ঠাণ্ডা পানি। এখনো তাঁর পানির পিপাসা হয়নি। তবে হবে। যদি হয় এখানকার পানি তিনি মরলেও খেতে পারবেন না।

হোসেন সাহেব আবার উঠে বসলেন। ডাক্তার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করলেন। টেলিফোন করা তাঁর অসম্ভব জরুরী। সাজ্জাদের কাল ইন্টারভ্যু আছে। ব্যবস্থা সবই নেয়া হয়েছে। সাজ্জাদ শুধু উপস্থিত হলেই হবে। প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাপারে টেলিফোন করবেন কি-না তাঁর সন্দেহ ছিল। তবে তিনি খবর পেয়েছেন — প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন করেছেন। এখন গাধামার্কা ছেলে — বোর্ডের সামনেই হয়ত উপস্থিত হবে না।

ডাক্তার মেয়েটি উঠে আসছে। এবার সে একা আসছে না — সঙ্গে ছেলেটিও আসছে।

'আপনার কি ব্যাপার বলুন তো?'

'একটা টেলিফোন করার দরকার ছিল।'

'আপনার যা দরকার তার নাম ঘুম। টেলিফোন না। কাকে টেলিফোন করতে চান?'

হোসেন সাহেব দ্রুত ভাবছেন — কাকে টেলিফোন করার কথা শুনলে এরা ভড়কে যাবে? ডাক্তাররা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে? সমাজ কল্যাণ না-কি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়? স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই হবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এখন কে? মোবারক না? উহুঁ, মোবারক আছে যুব অধিদপ্তরে . . .

ডাক্তার ছেলেটি বলল, বুড়ামিয়া ঘুমানোর চেষ্টা করুন। শুয়ে পরুন তো। শুয়ে শুয়ে পাঁঠার সংখ্যা গুণতে থাকুন। হাজারখানিক পাঁঠা গুণতেই ঘুম চলে আসবে।

হোসেন সাহেব ছেলেটির অভদ্রতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই ছেলেটিকে কঠিন কোন শিক্ষা দেয়া দরকার। ছেলেটার ডিউটি কতক্ষণ কে জানে। ডিউটিতে থাকতে থাকতেই তাঁর ভিজিটাররা চলে এলে মাইল্ড একটা শিক্ষা হবে। যদিও যে অভদ্রতা সে করেছে তাতে মাইল্ড ধরনের শিক্ষা দিলে চলবে না।

তার ভিজিটাররা এখনো আসছে না কেন? এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে আর বাসা থেকে কাউকে খবর দেয়া হয়নি, বিশ্বাস করা কঠিন। ছেলেটা গাধা, মেয়েটা তো গাধা না।

'শুনুন বুড়োমিয়া। চোখ বন্ধ করে থাকুন। ঘুমের অষুধ আপনাকে দেয়া হয়েছে। অষুধকে কাজ করার সুযোগ দিন। চোখ বন্ধ করে থাকুন।'

হোসেন সাহেবের নিজেকে চোখ বন্ধ করতে হল না। আপনাতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। তিনি অসহায় বোধ করছেন। ভিজিটাররা আসবে, তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন — কে আসবে কে যাবে বুঝতেই পারবেন না। এর কি কোন মানে হয়। ওরা ফুল টুল নিয়ে আসবে। ফুল রাখারই বা জায়গা কোথায়? কেবিন হলে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যেত।

ভিজিটার কেউ আসছে না এও একদিক দিয়ে ভাল। তারা এসে দেখতো তিনি একদল ফকির মিসকিনের সঙ্গে পড়ে আছেন। লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার মত অবস্থা হত। এই নরক থেকে উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত টেলিফোন করা যাবে না। কবে উদ্ধার পাওয়া যাবে? সাজ্জাদ কি যেন বলে গেছে সকালে? সকালে এলেই ইন্টারভ্যুর কথাটা মনে করিয়ে দিতে হবে। কে জানে তাঁর নিজেরই হয়ত মনে থাকবে না।

হার্ট এ্যাটাকের পর স্মৃতি শক্তি কমে যায়। ঠিকমত রক্ত না পাওয়ায় মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁরটা অবশ্য মাইল্ড এ্যাটাক। হয়ত তাঁর মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। ওঁয়া ওঁয়া শব্দে কে কাঁদছে। আশ্চর্য কাণ্ড, নবজাত শিশুর কান্না আসছে কোত্থেকে? এটাতো মেটার্নিটি ওয়ার্ড না। হোসেন সাহেব প্রাণপণ চেষ্টা করলেন চোখ মেলতে। মেলতে পারছেন না। ওঁয়া ওঁয়া কান্না শুনতে শুনতে তিনি গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন।

কবি

সাজ্জাদ ইন্টারভ্যু দিতে ঘরে ঢুকেছে। প্রায় হলঘরের মত বড় ঘর। নিশ্চয়ই ছোটখাট কনফারেন্স টনফারেন্স হয়। ঘরের মাঝখানে কনফারেন্স টেবিলের মত গোল টেবিল। একটা পাশ বুড়ো এবং আধবুড়োরা দখল করে আছেন। এঁরাই ইন্টারভ্যু নেবেন। সাজ্জাদ চট করে গুণে ফেলল — সাতজন। একটা করে প্রশ্ন করলেও সাতটা প্রশ্ন। সাতজনই চেষ্টা করবে এমন প্রশ্ন করতে যেন প্রশ্ন শুনে শুধু যে সাজ্জাদই ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাবে তা না — ইন্টারভ্যু বোর্ডের অন্য মেম্বারেরাও ভ্যাবাচেকা খেয়ে যাবেন। প্রশ্নকর্তার গভীর জ্ঞান, গভীর প্রজ্ঞায় অভিভূত হবেন। দু' একজন থাকবে যাদের ধারণা তারা মহা রসিক। তারা চেষ্টা করবে মজার মজার প্রশ্ন করতে।

সাজ্জাদ মাঝখানে বসা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, স্লামালিকুম। তার কাছে মনে হল আজকের এই ইন্টারভ্যু বোর্ডের তিনিই প্রধান। ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন, এবং বললেন, সিট ডাউন ইয়ং ম্যান। তুমি যে বললে স্লামালিকুম এটা কি ঠিক হল? শব্দটা আমি যতদূর জানি — আসসালামু আলাইকুম। যার অর্থ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। স্লামালিকুমের অর্থ কি?

সাজ্জাদ লক্ষ্য করল প্রশ্নটা করতে পেরে ভদ্রলোক আনন্দিত। প্রথম প্রশ্নতেই শত্রু ঘায়েলের আনন্দ। সাজ্জাদ মনে মনে বলল — "অফ যা বেকুব।"

'ইয়াং ম্যান, বল বিকৃত শব্দ বলার মানে কি? এই শব্দ দিয়ে তুমি কি বুঝাতে চাইছ? আনসার মি।'

সাজ্জাদ হাসিমুখে বলল, এই শব্দের মানেও আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমরা মূল শব্দটাকে একটু ছোট করে নিয়েছি। এরকম আমরা সব সময় করি। রবার্টকে বলি বব। রবার্ট কেনেডির জায়গায় বলি বব কেনেডি। বাংলা শব্দের অনেক উদাহরণও আমি দিতে পারব। শব্দ ছোট করায় আমার বলতে সুবিধা হচ্ছে। এটাই আসল কথা। আমি জানি এই শব্দ দিয়ে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি — আপনিও জানেন। কাজেই সমস্যা হচ্ছে না। আপনি যদি আরবের অধিবাসী হতেন তাহলে স্লামালিকুম শুনে হকচকিয়ে যেতেন, এর অর্থ ধরতে পারতেন না — কিন্তু আপনি তো আরবের লোক না।

ইন্টারভ্যু বোর্ডের চেয়ারম্যানের চোখ সরু হয়ে গেল। তাঁর এটি খুবই প্রিয় প্রশ্ন। সবাইকে তিনি এই প্রশ্ন দিয়ে কাত করেন এবং শেষে মধুর ভঙ্গিতে বলেন — এখন থেকে বিকৃত ভঙ্গিতে সালাম দেবে না। ঠিক আছে? এই প্রথম একজনকে পাওয়া গেল

যে নিজেকে ডিফেন্ড করল এবং বলা যেতে পারে ভালভাবেই করল। ডিফেন্সের পদ্ধতি যদিও খুবই উগ্র। তিনি গলা খাকাড়ি দিয়ে বললেন — ইয়াং ম্যান, তুমি যুক্তি ভালই দিয়েছ তবে নিজের ফাঁদে নিজে পা দিয়েছ। এক্ষুণি তোমাকে মহাবিপদে ফেলে দিতে পারি — যাই হোক, I spared you the trouble, আপনাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে জিজ্ঞেস করুন।

বোর্ডের দ্বিতীয় ব্যক্তি গলা লম্বা করলেন। সাজ্জাদের মনে হল, একটা শুকনা হলুদ রঙের কচ্ছপ তার খোলের ভেতর থেকে মাথাটা বের করল। অনেকখানি বের করল।

'সাজ্জাদ হোসেন সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'বাংলাদেশকে আপনি কি আন্ডার ডেভেলপড কান্ট্রি বলে মনে করেন?'

'করি স্যার।'

'আমাদের দেশের অনগ্রসরতার পেছনে কারণ কি বলে আপনার ধারণা?'

'কারণ তো একটা না, অনেক।'

'কারণ অনেক হলেও মূল কারণ কিন্তু একটি — সেটা কি?'

'মূল কারণ একেকজন একেকভাবে চিহ্নিত করবেন। আমার নিজের ধারণা অশিক্ষা।'

'সাজ্জাদ সাহেব, আপনি কি মনে করেন এই দেশের সব মানুষ যেদিন ইন্টার্মিডিয়েট পাশ করবে সেদিন দেশ অনেকদূর অগ্রসর হয়ে যাবে?'

বোর্ডের সবাই হো হো করে হেসে উঠল। প্রশ্নটার ভেতর হাসির কি আছে সাজ্জাদ ধরতে পারল না। সে মনে মনে বলল ব্যাটা কচ্ছপ তোর পানির ভেতর থাকার কথা — তুই এখানে কি করছিস? তুই তোর কচ্ছপিকে নিয়ে নদীর পাড়ে চলে যা। কচ্ছপি ডিম পাড়বে। বালির ভেতর ডিম লুকিয়ে রাখবে। তুই সেই ডিম পাহারা দিবি।

'সাজ্জাদ সাহেব, আমাদের ধারণা হয়ে গেছে — নানান সরকারী প্রপাগান্ডার জন্যেই ধারণা হয়েছে যে, অশিক্ষাই সব কিছুর মূলে। আসলে তা না। মুল ব্যাপার হল স্বপ্নের অভাব।'

'কিসের অভাব বললেন?'

'স্বপ্নের। আমাদের নেতারা এখন আর স্বপ্ন দেখতে পারছেন না। তারা রিয়েলিটি নিয়ে ব্যস্ত। আপনার কি মনে হয় না যে এই সময়ের নেতাদের কোন স্বপ্ন নেই?

'আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। স্বপ্ন খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। নেতাদের স্বপ্ন আছে কি নেই তা তাদেরই শুধু জানার কথা।'

'সাজ্জাদ সাহেব, আপনার নিজের কি কোন স্বপ্ন আছে?'

'জ্বি স্যার, আছে।'

'বলুন দেখি, কি স্বপ্ন।'

'আপনাদের শুনতে ভাল লাগবে না।'

'ভাল না লাগলেও শুনি। একজন মানুষকে সত্যিকারভাবে জানার উপায় হচ্ছে তার

স্বপ্নটা জানা। শুনি, আপনার স্বপ্নটা কি শুনি।'

সাজ্জাদ একটু ঝুঁকে গেল। কচ্ছপের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর হাসিমুখে বলল — আমার স্বপ্ন হচ্ছে আশ্রম করা। বর্ষা আশ্রম।

'কি আশ্রম?'

'বর্ষা আশ্রম।'

'সেটা কি?'

'অনেকখানি জায়গা নিয়ে নদীর পাড়ে একটা আশ্রম। আশ্রম ভর্তি কদম গাছ। ঘোর বর্ষায় সেই আশ্রমে বর্ষা উৎসব হবে। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী বর্ষার নবধারা জলে ভিজতে ভিজতে নাচবে। নগ্ন নৃত্য।'

'নগ্ন নৃত্য?'

'জ্বি, নগ্ন নৃত্য।'

'তাতে লাভ কি?'

'স্বপ্ন কি স্যার লাভ লোকসান দেখে চলে? রিয়েলিটি লাভ-লোকসান বিবেচনা করে। স্বপ্ন করে না।'

বোর্ড মেম্বারদের মুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব অকারণে কয়েকবার গলা খাকাড়ি দিলেন। সাজ্জাদ বসে আছে চুপচাপ। "স্যার আজ তাহলে আসি" এই বলে বিদায় নেয়াটা অভদ্রতা হবে কি-না বুঝতে পারছে না। বোর্ডের শেষ মাথার এক ভদ্রলোক নড়াচড়া করছেন। জ্ঞানগর্ভ কোন প্রশ্ন করার প্রস্তুতি বলে মনে হচ্ছে। সাজ্জাদ তাকালো তাঁর দিকে। ইনি সম্ভবত সায়েন্সের প্রশ্ন করবেন। বোর্ড মেম্বারদের একজন থাকেন সায়েন্টিস্ট। তিনি বিজ্ঞানের জটিল প্রশ্ন হাসিমুখে করেন। তাকে একবার একজন জিজ্ঞেস করেছিল — হাইজেনবার্গের আনসারটিনিটি প্রিন্সিপ্যালটা কি? এমনভাবে জিজ্ঞেস করল যেন সে নিজেই হাইজেনবার্গ।

'সাজ্জাদ সাহেব।'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি যেতে পারেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

সাজ্জাদ হাসিমুখে বের হয়ে এল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরে ঢুকে চেয়ারম্যান সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, আপনাদের বাথরুমটা কোন্ দিকে? আমার একটু বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন।

চেয়ারম্যান সাহেব হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে তিনি গভীর বেদনা বোধ করছেন। যে বেদনার উৎস সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই।

বিকেলে আতাহার সাজ্জাদ বাসায় ফিরেছে কি-না জানতে এসে হকচকিয়ে গেল। বিশাল আম গাছ সাজ্জাদদের বাড়িতে পড়ে আছে। জানালার কাচ ভেঙ্গে একাকার।

আতাহার বিস্মিত হয়ে নীতুকে বলল, ব্যাপার কিরে?

নীতু বলল, ঝড়ে গাছ পড়ে গেছে?

'ঝড় কখন হল যে গাছ পড়ে যাবে?'

'বলেন কি আপনি, কাল প্রচণ্ড ঝড় হল না?'

'বৃষ্টি হয়েছে — সামান্য বাতাসও হয়ত হয়েছে — এটাকে ঝড় বললে তো ঝড়ের অপমান। তোর হাতে ব্যাণ্ডেজ কি জন্যে। ঝড় কি হাতের উপর দিয়েও গেছে?'

'হুঁ।'

'হুঁ মানে কি?'

'হুঁ মানে জানালা ভাঙা কাচে হাত কেটে গেছে।'

'বলিস কি? বিনা মেঘে বজ্রপাত, এখন দেখছি বিনা মেঘে রক্তপাত।'

'সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

'সাজ্জাদ। সাজ্জাদের কোন খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'ভাইয়া এসেছে। ইন্টারভ্যু দিতে গেছে।'

'ইন্টারভ্যু দিয়ে কি বাসায় ফিরবে, না উধাও হয়ে যাবে?'

'সে তো আর আমি জানি না। ভাইয়া জানে। আপনি কি অপেক্ষা করবেন ভাইয়ার জন্যে?'

'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি।'

'আপনাকে একা একা অপেক্ষা করতে হবে। আমি একটু হাসপাতালে যাব।'

'হাসপাতালে কেন?'

'বাবা হাসপাতালে। উনাকে নিয়ে আসতে যাব।'

'উনি আবার হাসপাতালে কখন গেলেন?'

'আপনার এত প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না। আপনি বসে অপেক্ষা করুন। ভাইয়ার ঘরে গিয়ে বসুন। আপনাকে চা দিতে বলি।'

'হাসপাতালে যাচ্ছিস তো এমন সাজগোজ করেছিস কেন? মনে হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছিস।'

নীতু আহত গলায় বলল, সাজগোজের কি দেখলেন? ইস্ত্রি করা একটা শাড়ি শুধু পরেছি। আমার চেহারা খারাপ বলে আমি একটা ভাল শাড়িও পরতে পারব না? আমাকে সব সময় ময়লা আর কম দামী শাড়ি পরে ঘুর ঘুর করতে হবে?

একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলতে গিয়ে নীতুর গলা ধরে গেল। তার চোখও ভিজে আসছে। আতাহার হকচকিয়ে গেল। কি বলবে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। মেয়েটা যতই বড় হচ্ছে ততই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠছে। এর সঙ্গে আর ঠাট্টা-তামাশা করা ঠিক হবে না। সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার। এই জাতীয় মেয়েরা বড় ভাইয়ের বন্ধুদের সঙ্গে প্রেম করার জন্যে পেখম মেলে থাকে। নীতুও হয়ত পেখম মেলে আছে। ভাবভঙ্গি সেরকমই। আগেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মনে হয় দেরি হয়ে গেছে।

প্রথমে ছিল টিউমার। বেনাইন টিউমার — এখন ক্যানসারাস হয়ে যাচ্ছে।

অপারেশন করে কেটে বাদ দিতে হবে। কিংবা শক্ত ঝাঁকি দিতে হবে। প্রেম-প্রেম ভাব ঝেঁটিয়ে বিদেয় না করলে পরে সমস্যা হবে। আতাহার ধমকের গলায় বলল, কাঁদছিস কেন?

'কাঁদলেও আপনাকে কৈফিয়ত দিতে হবে?'

'কৈফিয়ত দেয়াদেয়ির কিছু না — কথায় কথায় ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ — চেহারা তো এম্নিতেই খারাপ, তার উপর যদি স্বভাব-চরিত্র খারাপ করিস, তা হলে তো বিয়েই হবে না। পেকে ঝানু হয়ে যাবি, বিয়ে হবে না।'

'এমন অশালীন ভাষায় কথা বলেন কেন?'

'যা সত্যি তাই বলি — শালীন-অশালীন কিছু না। কোন ছেলের দায় পড়েনি ফ্যাঁচফ্যাঁচালি মেয়ে বিয়ে করবে।'

'আমার বিয়ে নিয়ে তো আপনাকে ভাবতে বলিনি। না-কি বলেছি? না-কি আপনার ধারণা হয়েছে আমি আপনার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? আমি দেখতে সস্তা ধরনের হতে পারি — আমার প্রেম সস্তা হবে কেন?'

'ওরে বাপরে, তুই তো ভয়াবহ ডায়ালগ দিচ্ছিস।'

'ভাল ভাল ডায়ালগ শুধু আপনি দিতে পারবেন? আমার দায়িত্ব শুধু শুনে যাওয়া? আপনার দোষ কি জানেন আতাহার ভাই? আপনার দোষ হচ্ছে নিজেকে আপনি মহাজ্ঞানী ভাবেন। মহাবুদ্ধিমান ভাবেন। আপনি মহাজ্ঞানীও না, মহাবুদ্ধিমানও না।'

'আমি তাহলে কি?'

'আপনি অতি সাধারণ একজন মানুষ। অপদার্থ ধরনের মানুষ। এম. এ. পাশ করে বসে আছেন। কাজকর্ম কিছুই জোগাড় করতে পারেননি। সিন্দাবাদের ভূতের মত এখনো বাবার ঘাড়ে চেপে আছেন। মনে মনে ধারণা করছেন যে আপনি বিরাট কিছু — মহাকবি। আসলে কিছুই না। আপনি নিজে আসলে কি তা নিজে জানলে পৃথিবীতে বাস করতে পারবেন না। যেহেতু আপনার ধারণা আপনি বিরাট সৃষ্টিশীল একজন মানুষ, সেহেতু বেঁচে আছেন।'

'তুই তো বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেললি।'

'বক্তৃতা শেষ হয়নি — সবটা শুনুন। আপনি মানুষ হিসেবেও তুচ্ছ। তুচ্ছ কেন বলছি জানেন? সব মানুষের নিজের স্বাধীন সত্তা বলে একটা জিনিস থাকে। আপনার সেটা একেবারেই নেই। আপনার অভ্যাস হল অন্যের হুকুমে চলা। আমি ব্যাপারটা খুব ভালভাবে লক্ষ্য করেছি। ভাইয়া এবং আপনি যখন একসঙ্গে থাকেন, তখন ভাইয়া যা বলে আপনি রোবটের মত পালন করেন। আপনার মধ্যে আছে হুকুম তামিল করা স্বভাব। আমি নিশ্চিত, আপনার নিজের বাড়িতেও আপনার একই অবস্থা। আপনি হলেন "ইয়েস স্যার" টাইপ মানুষ। আরো খারাপ ভাবে বলতে বললে বলব, আপনি নিম্নশ্রেণীর চামচা।

'নিম্নশ্রেণীর বলছিস কেন? চামচার আবার জাতিভেদ আছে না-কি?'

'অবশ্যই আছে। প্রথম শ্রেণীর চামচা হচ্ছে যারা স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে চামচার ভাব

ধরে থাকে। আর তৃতীয় শ্রেণীর চামচা হচ্ছে তারাই যাদের জন্মই হয়েছে চামচা হিসেবে। আপনি হচ্ছেন তৃতীয় শ্রেণীর চামচা।'

'বলিস কি !'

'সত্যি কথা বললাম। হয়ত মনে কষ্ট পেয়েছেন। কষ্ট পেলেও কিছু করার নেই। অনেকদিন থেকেই ভাবছিলাম আপনাকে কথাগুলি বলব — সুযোগ হচ্ছিল না। আজ হল। যাই আতাহার ভাই।'

'চলে যাচ্ছিস ?'

'হ্যাঁ। আপনার কিছু বলার থাকলে দু'-তিন মিনিট অপেক্ষা করতে পারি।'

'সাজ্জাদের ঘর কি খোলা আছে ?'

'হ্যাঁ, খোলা আছে। যান, অপেক্ষা করুন। আপনাকে যেন সময়মত চা-টা দেয় বলে যাচ্ছি।'

'তোর কি আসতে দেরি হবে ?'

'আমার আসা দিয়ে আপনার দরকার কি ?'

'কোন দরকার নেই, জিজ্ঞেস করলাম।'

'আমার আসতে দেরি হবে না। যাব আর বাবাকে নিয়ে চলে আসব। তারপরেও অনেকখানি সময় পাবেন — এই সময়ে ভেবে-টেবে বের করুন কি করলে আমি কষ্ট পাব। আমার চেহারা খারাপ এটা বলে বেশি সুবিধা করতে পারবেন না। অসংখ্য মানুষের কাছে অসংখ্যবার শুনেছি। এখন আর শুনতে খারাপ লাগে না।

'এ রকম মাস্টারনী টাইপ কথা কার কাছে শিখেছিস ?'

'নিজে নিজেই শিখেছি। কেউ শেখায়নি। যাই আতাহার ভাই।'

নীতু শাড়ির আঁচলে কপালের ঘাম মুছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই গ্যারেজের দিকে গেলো। গ্যারেজে একটা দড়ির খাটিয়া পাতা আছে। তাদের ড্রাইভার সেই খাটিয়ায় সারাক্ষণ ঘুমিয়ে থাকে।

সাজ্জাদের ঘর ছবির মত গোছানো। তার প্রধান কারণ সাজ্জাদ তার এই ঘরে কমই থাকে। এ বাড়িতে তার অনেকগুলি শোবার জায়গা। প্রধান শোবার জায়গা হচ্ছে ড্রয়িংরুমের সোফা। একটা লম্বাটে সোফা আছে জানালার পাশে। এই সোফায় শুয়ে থাকলে তার কাছে না-কি মনে হয় ট্রেনের বেঞ্চে শুয়ে আছে। ট্রেনের দুলুনিও না-কি টের পাওয়া যায়। একটাই সমস্যা — মশা। সাজ্জাদ সেই সমস্যার সমাধান তার নিজস্ব পদ্ধতিতে করেছে। পদ্ধতিটা সহজ — অডিকোলন স্প্রে করা একটা দড়ির মাথায় আগুন ধরিয়ে সেই দড়ি জানালার দিকে ঝুলিয়ে দেয়া। দড়ি পুড়ে অডিকোলন এবং ধোঁয়ার একটা মিশ্র গন্ধ বের হয়। সেই গন্ধ না-কি মশাদের খুব প্রিয়। সব মশা সেই গন্ধের লোভে ভিড় করে। কাছেই যে মানুষটা শুয়ে থাকে তার দিকে নজর থাকে না।

সাজ্জাদের দ্বিতীয় পছন্দের শোবার জায়গা হচ্ছে ছাদের চিলেকোঠার ঘর। সেই

ঘরের একটাই দরজা, জানালা–টানালার কোন বালাই নেই। একটা চৌকি এবং চৌকির উপর শীতল পাটি বিছানো। জোছনা রাত কিংবা বৃষ্টির রাতে সাজ্জাদ ঐ চৌকিতে শুয়ে থাকে। কাজেই নীতু প্রচুর সময় পায় সাজ্জাদের ঘর গুছিয়ে রাখার। যে যত্ন এবং আগ্রহ নিয়ে সে এই ঘর গোছায় সেই যত্ন এবং আগ্রহ বোধহয় সে নিজের ঘর সাজানোর সময়ও বোধ করে না।

এই ঘরে জুতা পরে যাওয়া নিষেধ। দরজার সামনে জুতা খুলে রেখে ঢুকতে হবে। সিগারেটের ছাই ঘরের মেঝেতে ফেলা যাবে না। ঘরের আসবাবপত্র টানাটানি করে তাদের নির্ধারিত জায়গা থেকে সরানো যাবে না। এই মর্মে হাতে লেখা একটা নোটিশ দরজায় সাঁটা আছে। আতাহার নোটিশের তিনটি নিষেধাজ্ঞাই অমান্য করেছে। জুতা পায়ে ঘরে ঢুকে জুতার ময়লা মেঝেতে মাখিয়েছে। ঘরে ঢুকেছে বেশিক্ষণ হয়নি — এর মধ্যেই দু'টা সিগারেট খেয়ে তার ছাই মেঝেতে ছড়িয়েছে। সাজ্জাদের কাবার্ড খুলে লুঙ্গি বের করে পরেছে। ফুল স্পীডে ফ্যান ছেড়ে এখন সে বিছানায় কাত হয়ে আছে। পা রাখার জন্যে ভাল জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। সোফা টেনে এনে বিছানার সঙ্গে লাগিয়ে পা রেখেছে। তাতেও তার ঠিক আরাম হচ্ছে না। মনে হচ্ছে — পায়ের লেভেল সমান না হয়ে উঁচু-নিচু থাকলে আরাম হত। তার হাতে হ্যারল্ড পিন্টারের An Anthology of 100 poems by 100 poets. বইটা বালিশের কাছে রাখা ছিল বলেই সে হাতে নিয়েছে।

বইটির অনেক কবিতাই সবুজ এবং লাল মার্কারে দাগ দেয়া। কিছু কবিতার নিচে পেন্সিলে লেখা — বোগাস। সাজ্জাদের হাতের লেখা। বোঝাই যাচ্ছে বইটা তার খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া।

আতাহার চোখের সামনে যে কবিতাটি ধরে আছে তা উইলিয়াম ব্লেকের লেখা — The mental traveller. কবিতার উপর সাজ্জাদের লেখা নোট — "মন্দ নয়। বঙ্গ ভাষায় ট্র্যান্সফার করা যেতে পারে।"

I travelled thro' a Land of men,
A Land of Men and Women too,
And heard and saw such dreadful things
As cold Earth wanderers never knew . . .

কি রকম হতে পারে এর বঙ্গানুবাদ, আতাহার চোখ বন্ধ করে ফেলল — গদ্য হলে আক্ষরিক অনুবাদের প্রশ্ন উঠতো, যেহেতু কবিতা — মূলের কাছাকাছি থাকতে পারলেই যথেষ্ট। ভাবটা ধরা নিয়ে কথা।

মানবের মাঝে আমি পথ হাঁটিয়াছি
সেই পথে মানবীও ছিল।
শুনিয়াছি দেখিয়াছি যাহা . . .

হচ্ছে না। জীবনানন্দ টাইপ হয়ে যাচ্ছে। "পথ হাঁটিতেছি" "মানব-মানবী" এইসব জীবনানন্দ ব্যবহার করে করে লেবু কচলে শুধু তিতা না বিষ বানিয়ে ফেলেছেন — নতুন কিছু করতে হবে। জীবনানন্দের কেঁথা পুড়ি। বার্ন দ্যা ব্লাঙ্কেট অব জীবনানন্দ। কবিতা হবে আতাহারানন্দের মত।

"প্রান্তরের পথে ছিল মানব ও মানবী।"

উহুঁ, হচ্ছে না। মূল কবিতায় পর্যটকের ক্লান্তি টের পাওয়া যায়। কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় — কবি ক্লান্ত — সেই ক্লান্তি অনুবাদে উঠে আসতে হবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই জিনিস ঠিক করা যাবে না। পথে পথে হাঁটতে হবে। কবির ক্লান্তি নিজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। আতাহারের মেজাজ খারাপ হচ্ছে। মেজাজ খারাপের প্রধান কারণ হল — মাথার ভেতর উইলিয়াম ব্লেকের এই কবিতার লাইনগুলি বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

একটা সুন্দর এবং ভাল অনুবাদ না হওয়া পর্যন্ত লাইনগুলি মাথা থেকে সরানো যাবে না। কবিতার বইটা হাতে নেয়া বড় রকমের বোকামি হয়েছে।

'আতাহার ভাই! আপনার চা।'

আতাহার বই নামিয়ে রাখল। বিরক্ত মুখে বলল, তোর না হাসপাতালে যাবার কথা, যাসনি?

'গিয়েছি। বাবাকে নিয়ে ফিরেও এসেছি। বাবা আপনাকে ডাকছেন। চা খেয়ে নিচে যান।'

'মাই গড! আমার খুব জরুরি কাজ আছে — বুঝলি নীতু, সাতটার মধ্যে না গেলেই না।'

'বাবাকে সেটা বুঝিয়ে বলে সাতটার মধ্যে চলে যাবেন। অসুবিধা কি?'

'উনার কাছে গেলে তিন-চার ঘণ্টার আগে ছাড়া পাব না। তুই আমাকে উদ্ধার করে দে। দরকার হলে তোর পা ধরতে রাজি আছি।'

'বেশ তো, পা ধরুন।'

আতাহার ঝট করে নিচু হয়ে নীতুর পায়ের পাতায় হাত রাখল। নিতু হতভম্ব হয়ে গেল। হতভম্ব ভাব কাটতেই শীতল গলায় বলল, ছিঃ আতাহার ভাই! ছিঃ! এইসব কি?

আতাহার নিজেও এখন খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। কাণ্ডটা অনুচিত হয়েছে। এবং এমন একটি অনুচিত অস্বাভাবিক কাণ্ড সে কেন করলো নিজেই বুঝতে পারছে না। অপ্রস্তুত ভাবটা কাটানোর জন্যে কি করা উচিত তাও বুঝতে পারছে না।

নীতু থর থর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে মেয়েটা খুব ভয় পেয়েছে। বাচ্চা একটা মেয়েকে ভয় পাওয়ানোর কোন মানে হয়?

নীতু বলল, চা খেয়ে নিচে যান। বাবা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। সাতটা বাজলে উঠে চলে যাবেন। বাবা তো আপনাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবেন না যে উঠতে পারবেন না। নীতু চায়ের কাপ চেয়ারে নামিয়ে রেখে চলে গেল। চা দিয়ে নীতু এভাবে

কখনো যায় না। দাঁড়িয়ে থাকে। চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটি দেয়ার পর জিজ্ঞেস করে, চিনি–টিনি সব কি ঠিক আছে? আজ কিছুই জিজ্ঞেস করল না। বিষণ্ণ ও মন খারাপ ভাব করে ঘরে থেকে বের হয়ে গেল।

হোসেন সাহেব মেরুদণ্ড সোজা করে সোফায় বসে আছেন। তাঁর দু'টি হাত সোফার দুই হাতলে রাখা। তাঁর বসার ভঙ্গিতেই মনে হচ্ছে তিনি খুব আনন্দে আছেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার আনন্দে তিনি এই মুহূর্তে অভিভূত। হাসপাতালের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা কাউকে এখনো বলতে পারছেন না, এটা আরাম করে বলার মত বিষয়। সমস্যা হয়েছে টেলিফোনটা নষ্ট। ঝড়ে টেলিফোনের লাইনে কিছু হয়েছে। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে টেলিফান থাকবে না এটা তো জানা কথাই।

আতাহার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, চাচা, এখন আপনার শরীর কেমন?

হোসেন সাহেব তৃপ্ত মানুষের মত হাসলেন। তারপর গলার স্বরে যথাসম্ভব দার্শনিক ভাব নিয়ে এসে বললেন, টিকে যে আছি এটাই একটা মিরাকল। লোকে মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে আসে। আমি দরজার ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম — সেখান থেকে ফেরত এসেছি। বাবা বোস — সামনের সোফাটায় বোস — অভিজ্ঞতার কথা শোন। তুমি প্রথম ব্যক্তি যাকে বলছি . . .।

আতাহার বিমর্ষ মুখে বসল। সে একটা ব্যাপার ভেবে পাচ্ছে না, হোসেন সাহেবের মত নিতান্ত ভালমানুষ এমন ভয়ংকর বোর কি করে হন। ভদ্রলোক কথা সুন্দর করে বলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর, কখনো রাগ করেন না। আতাহারকে দেখেন নিজের ছেলের মতই, তারপরেও ভদ্রলোকের সামনে বসতে হবে মনে হলেই হাত–পা অবশ হয়ে আসে কেন? এর রহস্যটা কি?

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

'তোমরা কবি–সাহিত্যিকরা হৃদপিণ্ডটাকে এত গুরুত্ব কেন দিয়েছ?'

'গুরুত্ব তো চাচা দেইনি।'

'দিয়েছ। তোমরা মনে কর — মানুষের আবেগের আবাসস্থল হচ্ছে — হৃদপিণ্ড, হার্ট। এর কারণ কি জান? এর কারণ হচ্ছে শরীরের এই মাংসপিণ্ডটাই সারাক্ষণ কাঁপে। আমৃত্যু ধুক ধুক করছেই। মানুষ এই কম্পন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।'

আতাহারের হাই উঠছে। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাই তুলবে, না সরাসরি অভদ্রের মত হাই তুলবে তা বুঝতে পারছে না।

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

'হৃদপিণ্ডের এই ধুকধুকানি বন্ধের ব্যাপারটা যে কি তা টের পেলাম। অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা।'

'আপনার এই অভিজ্ঞতার কথা সময় নিয়ে শুনতে হবে। আরেকদিন এসে আরাম করে শুনব চাচা।'

'তোমার কি কোন কাজ আছে?'

'সাতটার সময় খুব জরুরি একটা কাজ আছে। তবে জরুরি হলেও আপনার কথা শোনার চেয়ে জরুরি নয়। আপনার কথা এখন শুনতে চাচ্ছি না — কারণ আপনার এখন দরকার রেস্ট। কমপ্লিট রেস্ট। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে বই পড়ুন — কিংবা টিভি দেখুন। শরীর সুস্থ হলেই একদিন এসে আপনার কথা শুনব।'

'শরীর এখন সুস্থই আছে।'

'আপনি বললে তো চাচা হবে না। হার্টের সমস্যা নিয়ে হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসেছেন। আপনার মনের জোর অসাধারণ বলে আপনি বলছেন শরীর সুস্থ আছে। আমি তো বুঝতে পারছি . . . '

'মনের জোরের কথা বলায় একটা ঘটনা মনে পড়ল — নাইনটিন সিক্সটি টু'র কথা। আমি আর তোমার চাচী ঢাকা থেকে রংপুর যাচ্ছি — তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব খারাপ। ফোর হুইলার একটা জোগাড় হয়েছে। ড্রাইভারের নাম — কিসমত। চব্বিশ পরগনায় বাড়ি। চল্লিশের মত বয়স, তবে স্ট্রং এণ্ড স্টাউট। ঢাকা থেকে রওনা হয়েছি ভোর ছ'টায়। কার্তিক মাস — কুয়াশা পড়েছে . . . '

আতাহার হাই তুলল। গল্পের মাঝখানে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বিদেয় হয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব না। বসে বসে গল্প শোনাও সম্ভব না।

'আমরা আরিচা পর্যন্ত নির্বিঘ্নে গেলাম। আরিচা ঘাটে পৌছার পর কিসমত বলল, তার পেটে সামান্য ব্যথা করছে। একটা সোডা খাবে। সোডা খেলে ব্যথা কমবে। তখন দেশে কোক, সেভেন আপ এইসব ছিল না। সোডা পাওয়া যেত — আট আনা করে দাম। আমি তাকে একটা টাকা দিলাম সোডা কিনতে।'

অন্য সময় নীতু তাকে উদ্ধার করত। আজ করবে না। শুধু আজ কেন, ভবিষ্যতেও হয়ত করবে না। আতাহারকে অনন্তকাল ধরে গল্প শুনে যেতে হবে।

'ফেরি চলে এসেছে। সবাই গাড়ি নিয়ে ফেরিতে উঠছে। কিসমতের দেখা নেই। আমি তোমার চাচীকে গাড়িতে বসিয়ে কিসমতের খোঁজে বের হলাম। কোথাও নেই। একটা জলজ্যান্ত লোক তো ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে না — তাই না?'

'তা তো ঠিকই।'

'আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। তখন একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল . . . '

হোসেন সাহেব অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা বলতে যাবেন এই সময় নীতু সরবতের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। হোসেন সাহেবের সামনে সরবতের গ্লাস নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, বাবা, আতাহার ভাই তাঁর এক আত্মীয়কে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে যাবেন — তুমি তাঁকে আটকে রেখেছ।

'সরি সরি। ভুল হয়েছে। খুব ভুল হয়েছে। নীতু মা, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল। ড্রাইভার তাকে এয়ারপোর্ট দিয়ে আসুক।'

'চাচা, কোন দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে। এই মুহূর্তে আমার গাড়ির প্রয়োজনও নেই। আমি তো আর কোথাও যাচ্ছি না। আমি বলতে গেলে গ্রাউন্ডেড। নীতু মা, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল।'

'উনি নিতে চাচ্ছেন না যখন, থাক। আমি গাড়ি নিয়ে ছোট খালার কাছে যাব।'

'গাড়ি ফিরে এলে তুই যাবি। ইমার্জেন্সি তো না। যা, ড্রাইভারকে বলে দে।'

নীতু ড্রাইভারের খোঁজে গ্যারেজের দিকে যাচ্ছে। আতাহার যাচ্ছে তার পেছনে পেছনে। গাড়ির আইডিয়াটা আতাহারের এখন ভাল লাগছে। মন্দ কি — খানিকক্ষণ ঘোরা যাক গাড়ি নিয়ে। এয়ারপোর্টে যাবে — ফিরে আসবে। গাড়ি থেকে নামবে না। হাইওয়েতে ফুল স্পীডে গাড়ি নিয়ে ঘোরা আনন্দদায়ক হবার কথা।

গাড়ি নিয়ে ময়না ভাইয়ের কাছেও যাওয়া যায়। প্রতিদিন একবার করে খোঁজ নিতে বলেছেন। গত দু'দিন কোন খোঁজ নেয়া হয়নি। তবে পাসপোর্ট করা হয়েছে এবং পাসপোর্ট তাঁর কাছে জমা দেয়া হয়েছে। দুই লাখ টাকার এখনো কোন ব্যবস্থা হয়নি। ব্যবস্থা হবার কোন রকম সম্ভাবনাও সে দেখছে না।

নীতু আতাহারের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, আতাহার ভাই, আজ আপনাকে খুব কঠিন কঠিন কথা বলেছি। আমার খুব খারাপ লাগছে।

'বলেছিস ভাল করেছিস। কথায় কথায় এ রকম খারাপ লাগলে চলবে?'

'আপনি যদি মনে কষ্ট পেয়ে চলে যান তাহলে সারারাত আমার ঘুম হবে না।'

আতাহার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, তোর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি মোটেই সুবিধার লাগছে না। ঠিক করে বল তো — তুই কি আমার প্রেমে পড়ে গেছিস?

নীতু আতাহারকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলল, হ্যাঁ।

আতাহার ভীত গলায় বলল, ভয়াবহ এই ঘটনাটা ঘটল কবে?

নীতু তার জবাব দিল না। ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে সে প্রায় পালিয়ে গেল।

গাড়িতে উঠে আতাহারের ঘুম পেয়ে গেলো। ভাল ঘুম। চোখের পাতা মেলে রাখা যাচ্ছে না এমন অবস্থা। এয়ারপোর্টের রাস্তাটা সুন্দর করেছে। দু'পাশে বিদেশী কোন গাছ লাগিয়েছে। ফার্মের মুরগির মত ফর্মের গাছ দ্রুত বড় হচ্ছে। কি নাম এই গাছগুলির? . . . বিদেশী জিনিসপত্রের মত বিদেশী গাছপালাতেও দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। আম-কাঁঠালের গাছ এখন আর কেউ রাস্তার দু'ধারে লাগায় না। আম-কাঁঠালের সংস্কৃতি হচ্ছে — গ্রাম্য সংস্কৃতি। এখন দেবদারু, পাইন এবং উইলী বৃক্ষের সংস্কৃতি চর্চা হবে। নতুন সংস্কৃতির কথা ভাবতে ভাবতে আতাহার ঘুমিয়ে পড়ল।

কবি

পাক্ষিক সুবর্ণ বের হয়েছে। চার রঙের ঝকঝকে কভার। সাত টাকা দাম। এই সংখ্যাতেই আতাহারের কবিতা থাকার কথা। গনি সাহেব সে রকমই বলেছেন। কাজেই সাত টাকা খরচ করে পত্রিকা কেনার মানে হয় না। সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে দু'কপি সে পাবে। পত্রিকার তৃতীয় পাতায় বড় বড় করে লেখা — প্রকাশিত প্রতিটি লেখার জন্যে সম্মানী দেয়া হয়। এটা অবশ্যি ডাহা মিথ্যা কথা। গনি সাহেব এখন পর্যন্ত কোন লেখার জন্যে সম্মানী দেননি। তবে সৌজন্য সংখ্যা দেন।

আতাহার সাত টাকা দিয়ে সুবর্ণ কিনল। নিজের কবিতা আছে কি-না এক্ষুণি দেখার দরকার নেই। আপাতত পত্রিকা পাঞ্জাবির পকেটে থাকুক। পরে শান্তিমত দেখা যাবে। সে দশ টাকা নিয়ে বের হয়েছিল — সাত টাকা পত্রিকা কিনতে গেল, দু'টাকা গেল সিগারেটে। শুধু মাত্র এক টাকা সম্বল করে ঢাকা শহরে ঘোরা যায় না। আতাহার কি করবে বুঝতে পারছে না। টাকার সন্ধানে বাড়িতে ফিরে যাওয়া এই মুহূর্তে অর্থহীন। রশীদ সাহেব আজ ভোর ছ'টা থেকে তুর্কি নাচ নাচছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পরীক্ষা দেয়নি এই খবর তিনি আজ ভোরবেলা পেয়েছেন। কে তাঁকে খবর দিয়েছে সেটা একটা রহস্য। আতাহার দেয়নি, মিলিও দেয়নি। এক হতে পারে, কালপ্রিট নিজেই দিয়েছে। তারপর দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ভোর ছ'টায় আতাহারের ঘুম ভেঙেছে তার বাবার চিৎকারে।

'বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেব। আগুন দিয়ে ছারখার করে দেব। আমার প্রতিটি পয়সা অনেস্ট পয়সা। রক্ত পানি করা পয়সা। এই বৃদ্ধ বয়সে গাধার মত পরিশ্রম করছি। আর আজ — এই তার প্রতিদান? না, আমি কিছু রাখব না। আগুন দিয়ে সব জ্বালিয়ে দেব।'

বক্তৃতা দিতে দিতেই তিনি ফরহাদের দরজায় প্রচণ্ড লাথি দিলেন। লাথির সঙ্গে সঙ্গে হুংকার — আইনস্টাইন হয়েছে। সহজ প্রশ্ন দেখে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আয় এখন কঠিন প্রশ্ন দেখ। তোর চামড়া আজ আমি খুলে নেব। জুতাপেটা করব। বাটা কোম্পানীর জুতা কত শক্ত আজ পরীক্ষা হয়ে যাবে।

রশীদ সাহেব চিৎকার করেন, দরজায় লাথি দেন এবং দু' হাতে প্রবলবেগে কড়া নাড়েন। আতাহারের ইচ্ছে করছে ছোট ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে, তবে এ রকম বিপদসংকুল অবস্থায় দরজা খোলার কোন মানে হয় না। আতাহার বাসি মুখে সিগারেট ধরিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ হবার কামনা করতে লাগল। মা বাসায় থাকলে সমস্যার

সমাধান হয়ে যেত। তবে মিলি আছে। সে বাবাকে সামলাবার চেষ্টা করবে। এখনো করছে না কেন তা বোঝা যাচ্ছে না।

মনে হয় ঝড়ের প্রথম ধাক্কাটা পার হবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

রশীদ সাহেবের হৈ-চৈ হঠাৎ বন্ধ হয়। পশ্চিম রণাঙ্গন পুরোপুরি নিশ্চুপ। আতাহারের ধারণা হল মিলি তাঁকে তাঁর ঘরে ঢুকিয়ে ফেলেছে। এই ফাঁকে ঘর থেকে বের হয়ে আজ দিনের মত ভ্যানিশ হয়ে যাওয়া দরকার। আজ আর কিছুতেই বাবার সামনে পড়া ঠিক হবে না।

আতাহার দরজা খুলে বের হল। বারান্দা ফাঁকা। সে মোটামুটি নিশ্চিন্ত মনে রান্নাঘরের দিকে গেল। মতির মা বা মিলি রান্নাঘরে থাকলে চা পাওয়া যাবে।

মিলি রান্নাঘরে ছিল। আতাহার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, চা-টা কিছু হবে না। বাবার মেজাজ খুব খারাপ। হৈ-চৈ করে এখন শরীর খারাপ করেছে। বুক ধড়ফড় করছে। শুয়ে আছেন। তুই বাইরে কোথাও চা খেয়ে নে। আজ নাশতা-টাশতা কিছু বানাব না। মা'কেও দেখতে যেতে হবে। মা'র অবস্থা ভাল না।

'বলিস কি !'

'মা বার বার তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। একবার মনে করে দেখতে যাবি।'

'আচ্ছা যাব। ফরহাদ করছে কি? বাবার ঠেলা খাবার পর তার অবস্থা কি?'

'সে তার মতোই আছে। পড়ছে।'

'সাব্বাস ! মনে হচ্ছে বাপকা বেটা।'

'রসিকতা করিস না ভাইয়া। আমার মন-টন ভাল না।'

যেখানে বাসার এই পরিস্থিতি সেখানে টাকার সন্ধানে বাসায় যাওয়া যায় না। সবচে' ভাল বুদ্ধি হাসপাতালে চলে যাওয়া। মা'র সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে উঠে দাঁড়ানো মাত্র মা বালিশের নিচ থেকে একটা নোট বের করে তার পকেটে গুঁজে দেবেন। সেটা একশ টাকার সবুজ নোট হতে পারে যা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দেবে। আবার পঞ্চাশ টাকার লাল নোটও হতে পারে যা মনে করিয়ে দেবে প্রভাতের সূর্যোদয়ের কথা। সমস্যা একটাই — হাসপাতালে যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। ভোরবেলা খালি পেটে হাঁটতে পারেন শুধু স্বাস্থ্য-প্রেমিকরা। যাঁরা দীর্ঘ দিন নিরোগ দেহে বাঁচতে চান। সে নিজেও দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকতে চায়, তবে তার জন্যে খালি পেটে মাইলের পর মাইল হাঁটতে চায় না।

হাসপাতালের মেইন কলাপসিবল গেট বন্ধ। টুল পেতে দু'জন দারোয়ান বসে আছে। দু'জনেরই মনে হয় খারাপ ধরনের জণ্ডিস হয়েছে। চোখ গাঢ় হলুদ। আতাহার গেটের কাছে দাঁড়াতেই একজন বলল, পাস। পাস আছে?

দিনের শুরুতেই মিথ্যা বলা ঠিক হবে না ভেবে আতাহার বলল, পাস নেই।

'পাস ছাড়া ঢোকা যাবে না।'

'পাস কে দেয়?'

'অফিসে গিয়ে খোঁজ করেন।'

'অফিস কোথায়?'

'জানি না।'

'হাসপাতালের কাজ করেন আর আপনাদের অফিস কোথায় জানেন না?'

'গেইটের মুখে ঝামেলা কইরেন না। পাস ছাড়া ঢুকামু না। সোজা কথা। পাস দেখান — ভিতরে ঢুকেন।'

আতাহার ফিরে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে শুধুমাত্র কবিদের জন্যে একটা বিশেষ পাস থাকা উচিত — ইউনিভার্সেল পাস। যে পাস দেখিয়ে যে কোন জায়গায় যাওয়া যাবে। বঙ্গভবনের গেটে পাস দেখালে মিলিটারী পুলিশ এটেনশান হয়ে স্যালুট দেবে। সিনেমা হলে পাস দেখালে হলের ম্যানেজার নিজে এসে ডিসিতে বসিয়ে দেবে। ইন্টারভ্যালের সময় হাতে কোকের বোতল ধরিয়ে দেবে।

রাস্তায় যেতে যেতে আতাহারের মনে হল সুবর্ণতে তার কবিতা খুব সম্ভব ছাপা হয়নি। আজ দিনটা অশুভ। এই দিনে কবিতা প্রকাশিত হবার মত শুভ কিছু হবে না। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গনি সাহেবের এন্টাসিড কিনে দিয়েও ফল হয়নি। আতাহার পাঞ্জাবির পকেট থেকে পত্রিকা বের করল। যা ভেবেছিল, তাই। তার কবিতা নেই। তার মন ভয়ংকর খারাপ হয়ে গেল। পত্রিকাটা কুচি কুচি করে ছিড়তে পারলে রাগ কমার সম্ভাবনা আছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে পত্রিকা ছেঁড়া ঠিক হবে না। লোকজন আড়চোখে তাকাবে। কাগজ ছেড়ার সঙ্গে পাগলামির একটা সম্পর্ক আছে। প্রাথমিক স্তরের পাগলরা কাগজ ছিড়তে পছন্দ করে।

আতাহার সুবর্ণ ছিড়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করল না, তবে নর্দমার দিকে ছুঁড়ে দিল। পেটের খিদে এই মুহূর্তে ভালই জানান দিচ্ছে। সরকার থেকে কবিদের যদি "খাদ্য পাস" দিত তাহলে চমৎকার হত। সেই পাস যে কোন রেস্টুরেন্টে দেখালেই রেস্টুরেন্টের মালিক একগাল হেসে বলবে — স্যার, বসুন। কি খাবেন বলুন।

'কি আছে আপনার এখানে?'

'অনেক কিছুই আছে। আপনার কি খেতে ইচ্ছে বলুন দেখি।'

'ডুবা তেলে গোটা দশেক লুচি ভাজুন। ভুনা গরুর গোশত দিন। এক প্লেট কলিজি, আর এক প্লেট মুরগির মাংস। সিরকায় ভিজিয়ে বড় বড় পেঁয়াজ দিন। ইন্ডিয়ান মিষ্টি পেঁয়াজ না, বাংলাদেশী পেঁয়াজ। ঝাঁঝ আছে এ রকম পেঁয়াজ। ভুটানের কাঁচামরিচের আচার আছে? থাকার কথা না। ঐ আচার আনিয়ে দিন। নাশতার পর পর তিন কাপ চা খাব। রেডি রাখবেন। চায়ের সঙ্গে রথম্যান সিগারেট। দেখবেন যেন ড্যাম্প না হয়। নাশতার সঙ্গের সিগারেট ড্যাম্প হলে নাশতাটাই মাটি।'

'স্যার, আরাম করে বসুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব এসে যাচ্ছে। এই ফাঁকে একটু তেহারী কি চেখে দেখবেন? এই মাত্র হাড়ি নেমেছে। আপনাকে দিয়ে বিসমিল্লাহ করি।'

'দিন, খেয়ে দেখি আপনাদের তেহারী। সঙ্গে ঝাল কাঁচামরিচ দেবেন। কাঁচামরিচ

মিষ্টি হলে, খবর্দার, তেহারী খাব না।'

সারা পথ খাওয়াদাওয়ার কথা চিন্তা করতে করতে আতাহার সাজ্জাদদের বাড়িতে উপস্থিত হল। গতকালের ভাঙা গাছ এখনো বাড়ির ওপর পড়ে আছে। তবে গাছ থেকে ঝরে পড়া ডাল, লতাপাতা, ভাঙা জানালার কাঁচের টুকরা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা গাছ বাড়িতে ভেঙে পড়ে আছে এই দৃশ্য এখন দেখতে ভালই লাগছে। এ বাড়িতে কোন ছেলেপুলে থাকলে গাছ বেয়ে ছাদে উঠে মজা করতে পারত। তার নিজেরই গাছ বেয়ে ছাদে উঠতে ইচ্ছে করছে।

বাড়ির দারোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল সাজ্জাদ আছে। সুসংবাদ, বলাই বাহুল্য। যাবতীয় সুসংবাদের সঙ্গে সামান্য হলেও দুঃসংবাদ মিশে থাকে। জানা গেল হোসেন সাহেব মাঝের ঘরে বসে আছেন। দোতলায় সাজ্জাদের ঘরে যেতে হলে মাঝের ঘর দিয়ে যেতে হবে। হোসেন সাহেবকে ডিঙ্গিয়ে সাজ্জাদের কাছে যাওয়া সম্ভব হবে না। সে কি ফিরে যাবে? ফিরে যাবেই বা কোথায়? ক্ষিদেয় প্রাণ যাচ্ছে। বাড়ির উপর হেলে পড়ে থাকা আমগাছটা সেদ্ধ করে দিলে খেয়ে ফেলতে পারে এমন অবস্থা।

নীতু বারান্দায় ফুলের টবে পানি দিতে এসে আতাহারকে দেখল। তার চোখে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই দেখা গেল না। আতাহার বলল, ক'টা বাজে রে নীতু?

নীতু সঙ্গে সঙ্গে বলল, ন'টা চল্লিশ। ঘড়ি দেখল না বা দ্বিধা করল না। মনে হচ্ছে কম্পিউটারের মত তার নিজের ভেতর ঘড়ি ফিট করা আছে।

'তোদের নাস্তা করা হয়ে গেছে?'

'আপনি আবারো নাশতা না করে এসেছেন?'

'হুঁ। লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়েছি বলতে পারিস।'

'ভাইয়ার ঘরে বসুন। নাশতা পাঠিয়ে দেব।'

'রোবটের গলায় কথা বলছিস কেন? মানুষের মত কথা বল।'

'মানুষের মতই কথা বলার চেষ্টা করছি। আপনার কাছে হয়তো বা রোবটের মত শুনাচ্ছে।'

'আমার উপর কোন কারণে কি রেগে আছিস?'

'রাগ-অভিমান এইসব উচ্চ শ্রেণীর ব্যাপার আমার মধ্যে নেই। আমি আসলেই খানিকটা রোবট।'

'রোবট না, তুই হলি 'রোবটী' — রোবটের স্ত্রীলিঙ্গ রোবটী।'

'আমার সঙ্গে কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। দয়া করে ভাইয়ার ঘরে চলে যান।'

'যাব কিভাবে? সিঁড়ির গোড়ায় পাহারাদার।'

'বাবা ঘুমুচ্ছেন। চুপি চুপি সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাবেন। বাবা টের পাবেন না।'

'থ্যাংকস ফর দা টিপ। নাস্তা একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিস নীতু। খিদেয় মারা যাচ্ছি।'

নীতু জবাব দিল না। ঝাঝড়ি দিয়ে টবে টবে পানি দিতে লাগল। তার চোখ-মুখ

কঠিন হয়ে আছে। ঐ দিনের ঘটনার পর সে ঠিক করে রেখেছে আতাহারের সঙ্গে আবার দেখা হলে সে খুব খারাপ ব্যবহার করবে। এবং এক ফাঁকে জানিয়ে দেবে প্রেমে পড়ার ব্যাপারে ঐ দিন যে কথা বলেছিল সেটা আসলে অভিনয়। সে আতাহারের প্রেমে পড়েছে এটা শোনার পর আতাহারের মুখের ভাব কেমন হয় এটা দেখাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য।

সাজ্জাদ হাত–পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তার গায়ে পাতলা চাদর। চোখ লাল। সাজ্জাদের গায়ে জ্বর। কিছুক্ষণ আগে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখা হয়েছে। একশ' তিন। সাজ্জাদের ধারণা, থার্মোমিটারে কোন সমস্যা আছে। এতটা জ্বর তার নিজের কাছে মনে হচ্ছে না। গা খানিকটা ম্যাজ ম্যাজ করছে, চোখ জ্বালা করছে এ পর্যন্তই। একশ' তিন জ্বর হলে ঘরে আটকা পড়ে থাকতে হবে। ব্যাপারটা ভয়াবহ।

আতাহারকে দেখে সাজ্জাদ বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসল। আতাহার বলল, জ্বর না–কি?

'হুঁ।'

'মুরগি–বসন্ত না তো? মুরগি–বসন্ত চারদিকে হচ্ছে। গায়ে কি র‍্যাশ বের হয়েছে?'

'না তো।'

'বের হবে। শুরুতে হেভি জ্বর আসে, তারপর র‍্যাশ ট্যাশ বের হয়ে ছেরাবেড়া। ভাইরাসের বেশ কিছু চেঞ্জ হয়েছে। মুরগি–বসন্তের মুরগি ভাব নেই — এখন রীতিমত শক্তিশালী। ঘোড়ার মতই শক্তিশালী। চিকেন পক্স নাম পাল্টে হর্স পক্স রাখার পাঁয়তারা হচ্ছে।'

'ভয় দেখাচ্ছিস না–কি?'

'ভয় দেখাব কেন? যেটা সত্যি সেটা বললাম। তোর জ্বর কি এখন একশ' তিন?'

'হুঁ।'

'যা ভেবেছি তাই। প্রথম দু'–তিনদিন জ্বর তিন–চারে উঠানামা করবে। তোর এখানে বেশিক্ষণ বসাও নিরাপদ না — আমি নাশতা খেয়েই বিদেয় হচ্ছি।'

'যাবি কোথায়?'

'গনি ভাইয়ের কাছে একটু যাব। কয়েকটা মিষ্টি কথা উনাকে বলব।'

'এই সংখ্যায় তোর কবিতা যাওয়ার কথা ছিল?'

'না, যায়নি। ঝড়–বৃষ্টির মধ্যে এন্টাসিড–ফিড কিনে দিয়েছি — ছাগলটা বলেছিল এই সংখ্যায় যাবে।'

'পত্রিকা অফিসে যাবি?'

"হুঁ।'

'পত্রিকা অফিসে যাওয়া ঠিক হবে না। হৈ–চৈ হবে। লোক জানাজানি হবে। সন্ধ্যার পর চল বাসায় গিয়ে ধরি।'

'তুই যাবি ?'

'অবশ্যই যাব।'

'জ্বর গায়ে যাবি ?'

'শুয়ে শুয়ে জ্বরকে প্রশ্রয় দেয়ার কোন মানে হয় না। গ্রেট গনিকে একটা শিক্ষা দিতে হবে।'

'কিভাবে শিক্ষা দিবি ?'

সাজ্জাদ চোখ–মুখ উজ্জ্বল করে বলল, বড় এক বালতি 'গু' ওর বারান্দায় ঢেলে রেখে আসব।

আতাহার তাকিয়ে রইল। মনে হচ্ছে জ্বর সাজ্জাদের মাথায় উঠে গেছে। আবোল–তাবোল বকছে। সাজ্জাদ অবশ্যি আবোল–তাবোল বকার মানুষ না।

সাজ্জাদ আতাহারের দিকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, বিশ–পঁচিশ সের টাটকা গু ফেলতে পারলে আর দেখতে হবে না। জন্মের শিক্ষা হয়ে যাবে।

'বিশ–পঁচিশ সের টাটকা গু তুই পাবি কোথায় ?'

'পাওয়া যাবে। ঢাকায় মেথর পট্টি বলে একটা জায়গা আছে। স্যুইপার, মেথররা পরিবার নিয়ে থাকে। ওদের সাথে আমার ভাল খাতির। আমাকে পীরের মত জানে। ঠিকানা দিয়ে এলে ওরাই ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনবোধে প্রতি পনেরো দিন অন্তর অন্তর গু–চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। যেদিন সুবর্ণ বের হবে সেদিনই তিন বালতি গু।'

আতাহার সাজ্জাদের গায়ে হাত রাখল। সে যা ভেবেছিল তাই — জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। যা বলছে জ্বরের ঘোরে বলছে। তাকে বরফ–পানিতে চুবিয়ে রাখা দরকার।

সাজ্জাদ বলল, জ্বর কেমন দেখলি ? খুব বেশি ?

'হ্যাঁ।'

'আমারো তাই ধারণা — মাথার বল বিয়ারিং সব লুজ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে — মাথা ঘুরছে। সিগারেট ফেলে দে তো — সিগারেটের গন্ধ অসহ্য লাগছে।'

আতাহার সিগারেট ফেলে দিল। সাজ্জাদ বলল, তুই নিজেও বিদেয় হ। তোকে দেখতেও অসহ্য লাগছে।

'নীতু আমার জন্যে নাশতা আনতে গেছে। নাশতা খেয়ে তারপর চলে যাব। এখনো কিছু খাইনি।'

'নিচে গিয়ে নাশতা–ফাসতা যা খাবার খা। নাশতার গন্ধে আমি বমি করে দেব।'

'তোর মাথায় মনে হয় পানি ঢালা দরকার।'

'কিচ্ছু ঢালার দরকার নেই। আমি চাচ্ছি জ্বরটা ভালমত উঠুক। জ্বরতপ্ত মাথায় একটা কবিতা লিখব। ইন্টারেস্টিং এক্সপেরিমেন্ট। নিজে অসুস্থ হলে — চারপাশের জগৎটাকেও অসুস্থ মনে হয় — সেই সময়ের সৃষ্টিও অসুস্থ হবার কথা। অসুস্থ কবিতা কেমন হয় দেখি।

আতাহার চিন্তিত মুখে উঠে দাঁড়াল। সাজ্জাদ চোখ বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। আতাহার বলল, ডাক্তার–টাক্তারের ব্যবস্থা করা দরকার না ?

'কোন কিছুরই ব্যবস্থা করতে হবে না। ও আচ্ছা, একটা কাজ করতে পারবি?'

'কি কাজ?'

'কণাকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবি।'

'কণাটা কে?'

'খুবই সাদামাটা ধরনের মেয়ে — তবে অসাধারণ। সাদামাটা বলেই অসাধারণ। মেয়েটাকে আমি মোটেই গুরুত্ব দেইনি। কাল রাতে প্রচণ্ড জ্বর এল, তখনই শুধু মেয়েটার কথা মনে পড়তে লাগল। এখন জ্বর আসছে, এখন আবার তার কথা মনে পড়ছে।'

'কণা থাকে কোথায়?'

'থাকে কোথায় জানি না। খুঁজে বের করবি।'

'খুঁজে বের করব কি ভাবে?'

'ঋতু নামে একটা পেইনটিং-এর দোকান আছে। তার পাশে একটা বড় ফার্মেসী। কণার স্বামী সেই ফার্মেসীর সেলসম্যান।'

'ঋতু পেইন্টিং-এর দোকানটা কোথায়?'

'আমি জানি না কোথায়। খুঁজে বের কর। Use your brain."

'খোঁজে বের করব কি ভাবে?'

'আরে, তুই তো গাধার মত কথা বলছিস। পাঁচ মিনিটে খুঁজে বের করা যায়।'

'কিভাবে?'

'যে কোন একটা পেইনটিং-এর দোকানে যাবি। এক দোকান অন্য দোকানের খোঁজ রাখে। ওদের বললেই ঋতু কোথায় বের হয়ে পড়বে।'

'কণার স্বামীর নাম কি?'

'কণার স্বামীর নাম জানি না। তার সম্পর্কে শুধু এইটুকু জানি — সে চিড়িয়াখানা পছন্দ করে না।'

'তোর নাম বললে চিনবে?'

'না — আমাকে চিনবে না। আমাকে চেনার দরকারও নেই — কনার চিড়িয়াখানা দেখার শখ। ওকে চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনবি। বিকল্প ট্যাক্সি ভাড়া করে নিয়ে যাবি। তোর কাছে ট্যাক্সি ভাড়া আছে?'

'আমার কাছে একটা টাকা আছে।'

'তুই তো দেখি ফকিরেরও অধম হয়ে গেছিস। নীতুর কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে যা। হা করে তাকিয়ে আছিস কেন? আলজিব দেখা যাচ্ছে। মোটেই ইন্টারেস্টিং দৃশ্য না। মুখ বন্ধ করে চলে যা — গেট লস্ট।'

আতাহার চিন্তিত মুখে নিচে নামল। সাজ্জাদকে নিয়ে চিন্তা, তারচেয়েও বেশি চিন্তা সিঁড়ির গোড়ায় হোসেন সাহেব বসে আছেন। ঘুমুচ্ছিলেন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুম ভেঙেছে। তবে আজ দিনটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। বুড়ো মানুষ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দিনে একবার ঘুমিয়ে পড়লে সহজে জাগার কথা না। বিড়ালের মত নিঃশব্দে নেমে যেতে হবে। প্রয়োজনে

হামাগুড়ি দিয়ে পার হতে হবে।

'কে, আতাহার না?'

'জ্বি চাচা।'

' এ রকম পা টিপে টিপে নামছ কেন?'

'আপনি ঘুমুচ্ছিলেন — পায়ের শব্দে আবার ঘুম ভেঙে যায় কি–না।'

'ঘুমুচ্ছিলাম না। ঝিম ধরে পড়েছিলাম। কাল সারারাত বলতে গেলে অঘুমা কেটেছে।'

'কেন?'

'সাজ্জাদের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে রাত এগারোটা বেজে গেল। সে ঘরে ফিরেছে এগারোটা দশে। জ্বর নিয়ে ফিরেছে। এমন জ্বর যে শরীরে ধান রাখলে — ধান ফেটে খই বের হবে। বাথটাবে পানি দিয়ে — বরফ দিয়ে জ্বর কমাতে কমাতে তিনটা বেজে গেলো। কাল রাতে খুবই চিন্তায় পড়েছিলাম। গ্লোবাল এটমসফিয়ার চেঞ্জ হচ্ছে। নানান ধরনের নতুন নতুন ভাইরাসের জন্ম হচ্ছে। নিউ ভাইরাস, নিউ ডিজিজ। পত্রিকায় পড়েছ "ফ্লেশ ইটিং" ভাইরাসের কথা?'

'জ্বি না।'

'ভয়াবহ ধরনের ভাইরাস। সরাসরি মাংস খেয়ে ফেলে। ভবিষ্যতে আরো কত কি হবে! দাঁড়িয়ে আছ কেন বাবা — বোস।'

আতাহার মাথা চুলকে বলল, একটা খুব জরুরি কাজ আছে চাচা।

'জরুরি কাজ তো থাকবেই। পৃথিবীর সব কাজই জরুরি — কার্লাইলের একটা কথা আছে — "Most trivial job — is the most important job."

আতাহার বসবে কি বসবে না, মন স্থির করতে পারছে না। তাকে আরো কিছুক্ষণ এ বাড়িতে থাকতে হবে। নাশতা না খেয়ে সে বেরুতে পারবে না। খিদের চোটে এখন মাথা ঘোরা শুরু হয়েছে। নাশতা তৈরি হলে নীতু তাকে আলাদা ঘরে নিশ্চয়ই ডেকে নিয়ে যাবে। তখন মুক্তি পাওয়া যাবে। আশা করা যায়, নাশতা ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে। দু'টা পরোটা ভাজতে তিন ঘণ্টা লাগার কথা না।

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

'আউট অব দ্যা ট্রেক তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি — কিছু মনে করো না। কণা মেয়েটি কে?'

'কার কথা বললেন?'

'কণা। কাল রাতে জ্বরের ঘোরে সাজ্জাদ কণা কণা বলে চেঁচাচ্ছিল। তার পছন্দের কেউ থাকলে তুমি আমাকে বলতে পার। ফ্যামিলি ব্র্যাকগ্রাউন্ড যদি ভাল হয় — আমার দিক থেকে কোন সমস্যা নেই। এইসব ব্যাপারে আমি খুবই লিবারেল। যুগ পাল্টাচ্ছে — যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও পাল্টাতে হবে। আমাদের সময় আর এখনকার সময় তো এক না। তোমার চাচীকে যখন বিয়ে করি তখন তার বয়স ছিল ওনলি

থ্যারটিন। বিয়ের আগে আমি তাকে চোখেও দেখিনি। আমার এক মামা-শ্বশুর মুনশি সদরুদ্দিন পাশা — খুলনার নাম করা উকিল, সুফি মানুষ। তিনি আমাকে বললেন, হোসেন, সারা জীবনের জন্যে একটা মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছ — একবার চোখের দেখাও দেখবে না? মেয়ে ফর্সা না কালো, কানা না খোঁড়া, জানার দরকার না? আমাদের ধর্মে বিবাহের আগে কন্যা দেখার বিধান আছে। আমি বললাম, মামা, আপনারা তো দেখেছেন। আমার দেখার কোন দরকার নেই। বিয়ে হয়ে গেল। তোমার চাচীকে প্রথম দেখলাম বাসর রাতে। সে এক অভিজ্ঞতা। চল্লিশ বছর আগের কথা, এখনো মনে হয় এই তো সেদিন . . .।'

আতাহার নীতুর জন্যে অপেক্ষা করছে। এত দেরি করছে কেন মেয়েটা? কতক্ষণ লাগে দু'টা পরোটা বানাতে?

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

'বাসর রাতের ঘটনাটা শোন। খুবই ইন্টারেস্টিং — বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দই শ্রাবণ। ইংরেজি ১৯৪০ সন — বৃটিশ পিরিয়ড। বিয়ের আসরে খুলনার কালেক্টর মিস্টার কেলভিন সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। কেলভিন সাহেবের স্ত্রীর নাম — এলেনা, অনিন্দ্য সুন্দরী। অল্প অল্প বাংলা জানেন। অতি মিশুক স্বভাব . . .'

পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নির্ঘাৎ নীতু। আতাহার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। এক্ষুণি মুক্তি পাওয়া যাবে। এখন ডাবল আগ্রহের সঙ্গে বৃদ্ধ ছাগলের বিয়ের গল্প শোনা যেতে পারে। যদিও বন্ধুর বাবাকে বৃদ্ধ ছাগল বলা ঠিক হচ্ছে না। মানুষটা খারাপ না। তাঁর গল্পগুলি খারাপ। দুনিয়ার ডালপালা নিয়ে গল্প শুরু করে। গল্প বলা শিখানোর কোন স্কুল থাকলে এই ছাগলাকে সে নিজ খরচে ভর্তি করিয়ে দিত।

'আতাহার ভাই, আপনার নাশতা দেয়া হয়েছে। আসুন।'

হোসেন সাহেব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন — যাও যাও, নাশতা খেয়ে আস। তারপর জমিয়ে আড্ডা দেব। হার্টের উপর একটা ধাক্কা চলে যাবার পর ঘরেই বসে থাকি। আমার বাসররাতের গল্প একটা অসাধারণ গল্প। তুমি ছেলের বয়েসী, তোমাকে বলা ঠিক হচ্ছে না। তবু শুনে রাখ — সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে . . . কি যেন শ্লোক — দ্বাদষ বর্ষেতু পুত্র . . . মনে পড়ছে না। স্মৃতি বিভ্রাট হচ্ছে। নীতু মা, আমাকে চিনি-দুধ ছাড়া এক কাপ চা।

আতাহার খুব আশা করেছিল নাশতায় পরোটা-গোশত থাকবে। তার আশা ভঙ্গ হল। রুটি, মাখন, কলা, একটা সিদ্ধ ডিম। ছোট্ট গ্লাসে হলুদ রঙের কি যেন দেখা যাচ্ছে — মনে হচ্ছে কমলার রস — ইংলিশ ব্রেকফাস্ট।

মিস রোবটী মুখ কালো করে নাশতার টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অন্যদিনের চেয়েও গম্ভীর। আতাহার বলল, নীতু, সাজ্জাদের শরীর-টরীর কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। ওকে বরফের মধ্যে চুবাতে হবে।

নীতু জবাব দিল না। মনে হচ্ছে এই সংবাদ সে জানে।

'আর শোন, আমাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে। ভাবিস না যে আমার নিজের জন্যে দরকার। আর যাই করি, বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ধার করি না। সাজ্জাদের জন্যেই টাকা দরকার। আমার কথা বিশ্বাস না হলে সাজ্জাদের কাছ থেকে ভেরিফাই করতে পারিস।'

নীতু বলল, আপনাকে এত কথা বলতে হবে না। নাশতা খান — আমি টাকা এনে দিচ্ছি।

'টাকাটা কি জন্যে দরকার শুনতে চাস না?'

'আপনার বলার ইচ্ছা হলে বলতে পারেন। আমি আগ বাড়িয়ে শুনতে চাই না।'

'কণা নামের একটা মেয়েকে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানার বাঁদর দেখিয়ে আনতে হবে।'

'কণাটা কে?'

'জানি না কে। চাঁদের কণা হবে।'

'আপনি সত্যি জানেন না কে?'

'না।'

'জ্বরের ঘোরে কাল রাতে ভাইয়া কণা কণা বলে চেঁচাচ্ছিল। আমার ধারণা, খুব খারাপ ধরনের কোন মেয়ে — ভয়ংকর খারাপ। ভাইয়া আজেবাজে জায়গায় যায়। আপনিও হয়ত যান। ঐ মেয়ে সেই সব জায়গার।'

'হতে পারে — কবি চণ্ডিদাস বলেছেন —

'যেথা যার মজে মন
কিবা হাড়ি কিবা ডোম॥'

নীতু ভুরু-টুরু কুঁচকে বলল, এই জাতীয় একটা মেয়ের সঙ্গে ভাইয়ার পরিচয়ে আপনি মনে হয় খুব খুশি।

'আমার খুশি-অখুশি কোন ব্যাপার না। সাজ্জাদ খুশি হলেই আমি খুশি। তাছাড়া তুই যা ভাবছিস তা না, কণা মেয়েটা খুবই ভদ্র একটা মেয়ে। কারোর বিবাহিতা লক্ষ্মী টাইপ স্ত্রী। যার সংসার আছে — পুত্রকন্যা আছে।'

'আতাহার ভাই, প্লীজ, আপনার বকবকানি শুনতে আর ইচ্ছা করছে না। বাবার সঙ্গে থেকে থেকে আপনারও বিশ্রী কথাবলা রোগ হয়েছে।'

আতাহার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, টাকাটা নিয়ে আয় — আমি ব্যাক ডোর দিয়ে খালাস হয়ে যাই।

'এখন কি আপনি কণার কাছে যাবেন?'

'না, এখন আমি যাব দি গ্রেট গনি ভাইয়ের কাছে। ব্লাফার অব দি সেঞ্চুরী। সুবর্ণ পত্রিকার মালিক। কবিতা ছাপবে বলে কথা দিয়ে ছাপেনি।'

'ভাল হয়নি বলে ছাপেনি।'

'কি বলিস, ভাল হয়নি! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা। শুনবি? আমার মুখস্থ আছে।'

'মাফ করুন — কবিতা শুনব না। টাকা এনে দিচ্ছি — বিদেয় হোন।'

নীতু খামে ভরে তিনটা পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে এল। একটা বাড়তি নোট কেন

আনল সে জানে না। সে কি আতাহার ভাইকে উপহার দিচ্ছে? গোপন উপহার? আতাহার ভাই খাম খুলে তিনটা নোট দেখে ভাববেন — ভুলে চলে এসেছে। তারপর নীতুর সেই ভুলের জন্যে তিনি আনন্দিত হবেন। নীতু জানে, তাঁর টাকার খুব দরকার। বেচারার দু'টা পাঞ্জাবি, একটা শার্ট। গত এক বছরে সে এই তিনটা কাপড়ই আতাহার ভাইকে ঘুরে-ফিরে পরতে দেখছে। তার মধ্যে একটা পাঞ্জাবির অবস্থা ভাল না। রং-টং জ্বলে বিশ্রী হয়ে আছে। তাঁর বোধহয় সেটাই পছন্দ। আজও সেটাই পরে আছেন। গত ঈদের পর নীতুর ধারণা হয়েছিল, আতাহার ভাই নিশ্চয়ই নতুন কোন শার্ট বা পাঞ্জাবি পরে আসবেন। রোজার ঈদে সবাই নতুন কাপড় পরে। কিন্তু আতাহার ভাই ঈদের দেখা করতে এলেন সেই কুৎসিত পাঞ্জাবিটা পরে। নীতু সেদিন যে শাড়িটা পরেছিল তার দাম ন'হাজার টাকা। শাড়িটা খুবই সুন্দর — হালকা সবুজের উপর সোনালী কাজ। সবুজ এবং সোনালী রঙ এক সঙ্গে যায় না। কিন্তু শাড়িটাতে সোনালী কাজ সুন্দর ফুটেছিল।

শাড়ি যত সুন্দরই হোক নীতুর গায়ে মানায়নি। কোন ভাল কাপড়ই তার গায়ে মানায় না। আয়নায় নিজেকে দেখেই সে বুঝেছে তাকে দেখাচ্ছে গেছো পেত্নীর মত। লম্বা কোন বাঁশগাছের মাথায় পা ঝুলিয়ে বসে থাকলেই তাকে মানাবে। অন্য কোথাও মানাবে না। ঈদের শাড়ি খুলে ফেলা যায় না বলে সে খোলেনি। আতাহার ভাইয়ের সামনে এই শাড়ি পরে বের হবার সময় সে লজ্জায় প্রায় মরে যাচ্ছিল। আতাহার ভাই তাকে দেখে বিদ্রুপ মাখা কঠিন কোন কথা অবশ্যই বলবেন। হো হো করে হাসতে হাসতে বলবেন, "এই শাড়ি পরে তোকে তো পেত্নীদের রানীর মত লাগছে রে।"

মজার ব্যাপার হচ্ছে, আতাহার ভাই সেদিন তাকে দেখে মুগ্ধ গলায় বলেছিলেন — তোকে তো সম্রাজ্ঞীর মত লাগছে রে নীতু। প্রথমে নীতু ভেবেছিল ঠাট্টা। যখন টের পেল ঠাট্টা না, তখন আনন্দে তার চোখে পানি এসে যাবার মত হওয়ায় সে দ্রুত সরে গেলো।

ঈদের দিনের সেই শাড়ি সে আর পরেনি। যত্ন করে তুলে রেখেছে। শুধু শাড়িটা না, সেদিন সে যা যা পরেছিল সবই তুলে রেখেছে। চুল বেঁধেছিল সাদা ফিতায় — সেই ফিতা, স্ট্রাইপ দেয়া জুতা সব তোলা আছে। কোন এক বিশেষ উপলক্ষে সে আবার পরবে। কে জানে হয়ত আতাহার ভাইয়ের বিয়ের দিনই পরবে।

নীতু গম্ভীর মুখে আতাহারকে খাম এনে দিল। তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল যখন সে দেখল আতাহার ভাই খাম পকেটে না ঢুকিয়ে টাকা বের করে গুনতে বসেছে।

আতাহার বিরক্ত গলায় বলল, নীতু, তোর টাকা বেশি হয়ে গেছে। পাঁচশ' টাকা বেশি দিয়েছিস।

'দিয়েছি যখন রেখে দিন।'

'রেখে দেব মানে ! ধর, নে।'

নীতু নোটটা হাতে নিল। আতাহার বলল, এখন দয়া করে পেছনের দরজা দিয়ে আমাকে বের করে দে। চাচার সামনে পড়তে চাচ্ছি না।

নীতু বলল, আরেক কাপ চা খেয়ে যাবেন?

'না। দি গ্রেট গনিকে ধরতে হবে। দেরি করলে অফিসে পাব না।'

'গনি সাহেবের অফিসটা কোথায়?'

'সেগুনবাগিচায়।'

'আমি ঐ দিকেই যাব। বড় ফুপুর বাসায়। চলুন আপনাকে নামিয়ে দি।'

'বাসায় রোগী ফেলে তুই ফুপুর বাসায় যাবি কি জন্যে? ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত সেবা কর।'

'ভাইয়া কারো সেবা নেবে না। এখন জ্বর মাথায় নিয়ে দরজা বন্ধ করে কবিতা লিখছে। কাজেই আমার থাকা না থাকা সমান।'

গাড়িতে উঠেই নীতু বলল, ঐ দিন আপনার মুখের ভঙ্গি দেখে খুব মজা পেয়েছি আতাহার ভাই।

'কোন দিন?'

'ঐ যে, যেদিন আপনি জিজ্ঞেস করলেন — তুই কি আমার প্রেমে পড়েছিস? আর আমি বললাম — হুঁ।'

'এইসব কথাবার্তা ড্রাইভারের সামনে বলাটা কি ঠিক হচ্ছে?'

নীতু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কোন অসুবিধা নেই। শুনুন আতাহার ভাই, ঐ দিন প্রথম আমি টের পেলাম যে, আসলে আমি খুব বড় মাপের অভিনেত্রী।

'প্রতিটি মেয়েই খুব বড় মাপের অভিনেত্রী। জন্মসূত্রেই তারা অড্রে হেপবর্ণ।'

'আমার অভিনয়-ক্ষমতা তাদের চেয়েও ভাল। কারণ ঐ দিন আপনার সঙ্গে আমি চমৎকার অভিনয় করলাম — চোখে পানি পর্যন্ত নিয়ে এলাম। আপনি বুঝতেও পারলেন না। ভাবলেন সত্যি। চোখ-মুখ কি রকম হয়ে গেল। হি হি হি।

'অভিনয় ছিল না-কি?'

'অভিনয় তো বটেই। আমি শুধু শুধু আপনার প্রেমে পড়তে যাব কেন?'

'প্রেমে তো মেয়েরা শুধু শুধুই পড়ে।'

'আমি পড়ি না। যাই হোক, ঐ দিন আপনার সঙ্গে অভিনয় করাটা ঠিক হয়নি। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

'আচ্ছা বেশ, ক্ষমা করলাম।'

'আপনার কি মন খারাপ লাগছে আতাহার ভাই?'

'মন খারাপ লাগবে কেন?'

নীতু তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে ঠোঁট মুছতে মুছতে বলল, একটা ছেলে যখন শুনে কোন মেয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন সেই ছেলে প্রচণ্ড মানসিক তৃপ্তি লাভ করে। মেয়েটা কালো কুচ্ছিত হলেও কিছু যায় আসে না। মেয়েটা দেখতে কেমন সেটা তখন ছেলেটার মনে থাকে না — তার মনে থাকে শুধু প্রেমের ব্যাপারটা। প্রেমের তো কোন বর্ণ নেই। কালো মেয়ের প্রেম যেমন, রূপবতী মেয়ের প্রেমও একই রকম . . .

'তুই তো দেখি প্রেমবিশারদ হয়ে গেছিস রে নীতু। বকবকানি বন্ধ কর।'

নীতু চুপ করে গেল এবং একটু হকচকিয়ে গেল। আতাহার বলল, তোর অভিনয় ভাল হয়েছে। আমি বুঝতেই পারিনি অভিনয়। বাসায় ফিরে সেই রাতে তোকে স্বপ্নও

দেখে ফেললাম।

'কি স্বপ্ন দেখলেন?'

'তুই কি পাগল হয়েছিস? কি স্বপ্ন দেখলাম — আমি তোকে বলব না-কি? পরে তুই এই নিয়ে হাসাহাসি করবি।'

'আতাহার ভাই, আমি কোনদিন হাসাহাসি করব না।'

'অবশ্যই হাসাহাসি করবি। প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে তুই আমার আক্কেল গুড়ুম করে দিয়েছিস। তোর কাছে স্বপ্ন বলে ধরা খাব না-কি? আমাকে এই রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দে।'

'রাস্তার মোড়ে নামাব কেন? গণি সাহেবের অফিসের সামনেই নামিয়ে দেই।'

'ওখানে গেলে ট্রফিক জ্যামে আটকা পড়বি। আমাকে নামিয়ে দে।'

নীতু ড্রাইভারকে গড়ি থামাতে বলল। সে মূর্তির মত বসে আছে। তার ইচ্ছা করছে চিৎকার করে কাঁদে। কেন সে বলল — অভিনয়। এটা বলে তার লাভটা কি হল?

আতাহার নেমে গেছে। নীতু তাকিয়ে আছে। কিছুতেই সে তার চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। সেও কি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়বে? ছুটে গিয়ে আতাহার ভাইকে বলবে — আতাহার ভাই, গাড়িতে যা করেছি সেটা অভিনয়। আমি আর কোনদিন আপনার সঙ্গে অভিনয় করব না। কোনদিন না।

কবি

গনি সাহেব অফিসেই ছিলেন। পান খাচ্ছিলেন। তিনি এম্নিতে পান খান না, কোন কারণে মেজাজ অত্যন্ত ভাল হলে জর্দা দিয়ে একসঙ্গে দু'টা পান মুখে দেন। আজ তাঁর মেজাজ ভাল। শুধু ভাল না – অত্যন্ত ভাল, বিটিসির ফুল পেজ বিজ্ঞাপন পেয়েছেন। ছ'মাসের কনট্রাক্ট। সরকারি বিজ্ঞাপন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। তিনি লোক লাগিয়েছেন — সরকারি বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থাও হবে। জায়গামত খরচ করার লাইন বের করছেন। এতদিন লাইনটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন পাওয়া গেছে। তাঁর মন ভাল হবার আরেকটি সূক্ষ্ম কারণ হল তাঁর অরুন্ধতি পুরকায়স্থ। প্রুফ দেখার জন্যে সম্প্রতি তিনি এই মেয়েটিকে রেখেছেন। হতদরিদ্র মেয়ে। লাজুক এবং ভীতু ধরনের। সেদিন প্রুফ নিয়ে অরুন্ধতি তাঁর ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, দরজাটা ভিড়িয়ে দাও তো। অরুন্ধতি চোখ-মুখ কালো করে বলল, কেন স্যার? তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, টাইপ রাইটারের খটখট শব্দে মাথা ধরেছে। মাথা ধরা নিয়ে কাজ করতে পারি না। অরুন্ধতি দরজা ভিড়িয়ে দিয়েছে। তিনি গভীর মনযোগে অরুন্ধতি কাটা প্রুফের উপর চোখ বুলিয়েছেন। একবারও মেয়েটির দিকে তাকাননি।

অরুন্ধতি আজ অফিসে আসেনি। তার মায়ের অসুখ। মা'কে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। এই খবর ফোন করে জানিয়েছে। গনি সাহেব দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন। অল্পবয়েসী মেয়েদের অনেক কথা সরাসরি বলা যায় না — টেলিফোনে বলা যায়। গ্রাহাম বেল সাহেবের এটা একটা অসাধারণ আবিষ্কার। টেলিফোনে আজ তিনি অরুন্ধতিকে বলেছেন তাঁর প্রতি তিনি অন্য একধরনের টান অনুভব করেন। ব্যাপারটা প্লাটোনিক। মর্তের ধূলি-কাদার কোন ব্যাপার না। অরুন্ধতি শুধু শুনে গেছে, মাঝে মাঝে শুধু বলেছে, জ্বি জ্বি। অরুন্ধতির সঙ্গে কথা বলা শেষ করেই তিনি জর্দা দেয়া পান আনিয়েছেন। পাঁচটা সিগারেট কিনিয়েছেন। জর্দা বেশি হয়ে গেছে, মাথা অল্প অল্প ঘুরছে, তবে তাঁর ভাল লাগছে।

সুবর্ণর অফিস সেগুনবাগিচায়। সরকারের কাছ থেকে এনিমি প্রপার্টি বন্দোবস্ত নিয়ে অফিস করা। দেয়াল দিয়ে ঘেরা প্রায় এক বিঘার মত জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়ি। বাড়ি ভাঙাচোরা, পলেস্তারা উঠানো। গনি সাহেব ইচ্ছা করেই ঠিক করছেন না। ঠিক করলেই লোকজনের নজরে পড়বে। এনিমি প্রপার্টি দ্রুত হাত বদল হয়। তলে তলে গনি সাহেব অবশ্যি অনেকদূর এগিয়েছেন। ব্যাক ডেটের দলিল, কাগজপত্র জোগাড় করছেন। যে

সব কাগজপত্র প্রমাণ করে যে জনৈকা হরিদাসি এই সম্পত্তি তাঁর কাছে ১৯৫৮ সনে বিক্রি করেছেন। পরে তা বেদখল হয়ে যায়। এইসব কাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ। পুরানো স্ট্যাম্প খাজনার রশিদ পাওয়া মুশকিল। প্রচুর অর্থ লাগে, সময়ও লাগে। গনি সাহেব ধীরে ধীরে এগুচ্ছেন। এক কোটি টাকার একটা প্রপার্টির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা যায় না। এখন কেউ বাড়ি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলে গনি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন — আমার কেনা জমি। সরকার এনিমি প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করে আমার কাছেই লীজ দিয়েছে। মগের মুল্লুকে বাস করলে যা হয়।

কেউ যদি বলেন, মামলা ঠুকে দেন না কেন? তখন গনি সাহেব মুখ করুণ করে বলেন, মামলা–মোকদ্দমা কি করে করতে হয় তাও তো জানি না। পত্রিকা নিয়ে থাকি — এর বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারি না। তুচ্ছ জমিজমা নিয়ে চিন্তা করতে ভাল লাগে না। লীজ নিয়ে আছি, ভাল আছি — যদি সরকার কোনদিন নিয়ে নিতে চায় তখন দেখব।

আতাহারকে ঢুকতে দেখে গনি সাহেব আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, আরে আতাহার, এসো এসো।

'ভাল আছেন গনি ভাই?'

'আমার আর ভাল থাকাথাকি — ওল্ড–এজ ডিজিজ প্রায় সব ক'টা ধরেছে। পাইলসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। চেয়ারে এখন ঠিকমত বসতে পারি না। বাঁকা হয়ে বসতে হয়। চা খাবে তো? খাও, চা খাও।'

গনি সাহেব বেল টিপে আতাহারকে চা দিতে বললেন। আতাহার চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে। তার কবিতা এই সংখ্যায় কেন যায়নি সে প্রসঙ্গ কিভাবে তুলবে বুঝতে পারছে না।

'নতুন কিছু লিখেছ আতাহার?'

'জ্বি না।'

'এই তো তোমাদের সমস্যা। এক–আধটা হাফ ভাল কবিতা লেখ, তারপর ছাপাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়। তোমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয় — তোমরা একটা উদ্দেশ্যেই কবিতা লেখ — ছাপানোর উদ্দেশ্যে। কবিতা লেখা হবে প্রাণের তাগিদে। ছাপা হওয়া না হওয়া পরের কথা।'

'উৎসাহ পাওয়ার জন্যেও তো দু'–একটা কবিতা ছাপা হওয়া দরকার।'

'উৎসাহটা আসতে হবে প্রাণের ভেতর থেকে। ছাপা টাইপ থেকে না।'

'কবিতা না ছাপিয়ে ট্রাংক ভর্তি করে রাখারও তো কোন অর্থ হয় না। জীবনানন্দ দাশ যদি তাঁর কোন কবিতা না ছাপাতেন তাহলে তো আমরা জানতেই পারতাম না — এতবড় একজন কবি আমাদের মধ্যে আছেন।'

গনি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, তোমরা কি পেয়েছ জীবনানন্দ দাশের ভেতর

আমি জানি না। যাই হোক, এই নিয়ে তর্ক করতে চাই না — অন্য কিছু বলার থাকলে বল।

'এই সংখ্যায় আমার একটা কবিতা যাবে বলে বলেছিলেন — বাসর নাম।'

'বলেছিলাম না-কি?'

'জ্বি।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কিছু মনে করো না আতাহার, তুমি চলে যাবার পর কবিতাটা আবার পড়লাম — কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি?'

'যা হয়েছে সেটা না হবার মতই। বুঝতে পারছি মনে কষ্ট পাচ্ছ — তোমরা নিউ জেনারেশন পোয়েটস। তোমাদের উৎসাহ দেয়াও আমার দায়িত্ব। আচ্ছা, আরেকটা কবিতা রেখে যাও, দেখি বর্ষা সংখ্যায় দেয়া যায় কি-না। বর্ষা সংখ্যাটা ভাল মত বের করছি।'

'কবে দিয়ে যাব?'

'যত তাড়াতাড়ি পার। সম্ভব হলে রাতে বাসায় দিয়ে যেও।'

'তাহলে উঠি গনি ভাই?'

'আচ্ছা আচ্ছা। তোমরা আস, কথা-টথা বলি — ভাল লাগে।'

গনি সাহেব আন্তরিক ভঙ্গিতে হাসলেন। আতাহারও প্রাণপণ হাসার চেষ্টা করল। পারল না। হাসিটা কোথায় যেন বেজে গেল। গনি সাহেব বললেন, মুখটা এমন কালো কেন আতাহার? তোমাদের মুখ কালো দেখলে মনে কষ্ট পাই। বললাম তো বর্ষা সংখ্যায় ছেপে দেব। কথা দিলাম — আর কি চাও?

'থ্যাংক য়্যু।'

'তোমার ঐ বন্ধুর খবর কি? সাজ্জাদ না নাম?'

'জ্বি।'

'অনেক দিন তাকে দেখি না। ওকে একটু দরকার ছিল। তোমার সঙ্গে কি দেখা হবে?'

'আপনি বললে এক্ষুণি দেখা করব।'

'তাহলে খুব ভাল হয়। ইন্ডিয়ান দুই লেখক আসছে — আমার বাসায় খেতে বলেছি। ওরা তো আবার জলযাত্রা ছাড়া কিছু বোঝে না। বাংলাদেশে তারা আসেই শুধু হুইস্কির লোভে। সাজ্জাদ আবার জানে এইসব কোথায় পাওয়া যায়।'

'আমি বলব সাজ্জাদকে।'

'বলাবলি না, তুমি এক কাজ কর, সন্ধ্যাবেলা ব্ল্যাক লেবেল একটা নিয়ে চলে এসো। সাজ্জাদের দুই-একটা কবিতা নিয়ে এসো। তোমাদের দুই বন্ধুকে এবার হাইলাইট করে দি। বক্স করে দু'জনের দু'টা করে মোট চারটা কবিতা। তুমি নতুন একটা কবিতা দিয়ে যেও আর দেখি বাসরটা ঠিকঠাক করে কিছু করা যায় কি-না।

আতাহার চুপ করে আছে। গনি সাহেব বললেন, সন্ধ্যায় চলে এসো। দেরি করো না।

'দেরি করব না।'

'আরেকটা কথা শোন — তোমার ভালর জন্যে বলছি — প্রচুর পড়বে। তোমাদের কবিতায় এত ইরোটিক এলিমেন্ট অথচ আমি নিশ্চিত তোমরা বিদ্যাসুন্দর পড়নি। পড়েছ?'

'জ্বি-না।'

'অথচ আমাকে দেখ — আমি তো কবিতা লিখি না কিন্তু আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখস্থ বলে যেতে পারব —

"কি রূপসী অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়ে
প্রাণ দহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে॥
মধ্যে ক্ষীণ কুচ পীণ শশহীন শশী
আস্যবর হাস্যোদর বিম্বাধর রাশি॥"

গনি সাহেব হাসিমুখে চুপ করলেন। আতাহার মনে মনে বলল — শালা বুড়া ভাম, তুই এই চার লাইনই জানিস।

গনি সাহেব আতাহারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আতাহার বলল, শুনতে ভাল লাগছে, আরো বলুন।

'আজ আর না। একদিনে বেশি শুনলে বদহজম হয়ে যাবে। বুঝলে আতাহার, পড়তে হবে, পড়তে হবে। আমাকে দেখ, ওল্ড-এজ ডিজিজ সব ক'টা ধরেছে, তারপরেও কোন রাতে তিন-চারটার আগে ঘুমুতে যেতে পারি না। কাল রাতে ঘুমুতে যাবার সময় শুনি ফজরের আজান পড়ছে।'

'বলেন কি?'

'কাব্বালা বিষয়ে একটা বই পড়ছিলাম — কাব্বালাদের ব্যাপারটা জান তো — মিস্টিক গ্রুপ। শব্দ নিয়ে ওদের খুব অরিজিন্যাল থিংকিং আছে। তাদের ধারণা, শব্দ হচ্ছে সৃষ্টির মতো। সমস্ত জগৎ-সংসার সৃষ্টির মূল হল শব্দ। অবশ্য অন্যান্য ধর্ম এবং আধুনিক বিজ্ঞানও কাব্বালাদের ধ্যান-ধারণা সমর্থন করে। বাইবেলে কি আছে? পরমপিতা ঈশ্বর বললেন, Let there be light. ওম্নি জগৎ সৃষ্টি হল। প্রথমে শব্দ, তারপর সৃষ্টি। এদিকে আমাদের হলি বুক দি কোরান বলছে — আল্লাহ্ বললেন 'কুন', ওম্নি জগৎ সৃষ্টি। বুঝতে পারছ?'

'বড়ই জটিল।'

'পড়াশোনা কর না বলেই জটিল বোধ হয়। কবিমাত্রেরই মিস্টিক কাব্বালাদের সম্পর্কে জানা দরকার। কারণ কবি কাজ করেন শব্দ নিয়ে। কাব্বালাদের কাছে শব্দই সব। আচ্ছা, আজ যাও। আরেকদিন মডার্ন সায়েন্স শব্দ সম্পর্কে কি বলে বুঝিয়ে বলব।'

আতাহার উঠে দাঁড়াল। তার অনেক কাজ — কণাকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর যেতে হবে ব্ল্যাক লেবেলের সন্ধানে।

ঋতু গ্যালারী পাওয়া গেল। গ্যালারীর পাশে নিউমুন ফার্মেসীও পাওয়া গেল। ফার্মেসীর কর্মচারীদের ভেতর কাউকে পাওয়া গেল না, যার স্ত্রীর নাম "কণা"। শামছু নামের একজন কর্মচারীর দিন সাতেক আগে অষুধ চুরির দায়ে চাকরি গেছে। তার স্ত্রীর নাম কণা হতে পারে। তবে কেউ নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারল না। সামছু এখন কোথায় আছে তাও কেউ জানে না।

আতাহার নিশ্চিত বোধ করছে। চিড়িয়াখানা দেখানোর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। এক হাজার টাকা বেঁচে গেলো। ঐ টাকায় একটা হুইস্কির বোতল কিনে দিয়ে আসতে হবে। ঢাকা ক্লাবের কর্মচারিরা ক্লাবের হুইস্কি ব্ল্যাকে বিক্রি করে দেয়। একজন আছে, নাম সিদ্দিক। মুখ ভর্তি দাড়ি, মাথায় টুপি। দেখে মনে হবে বিরাট আল্লাহওয়ালা লোক। তলে তলে তার এই ব্যবসা। এক হাজার টাকায় ব্ল্যাক লেবেল হবে কি-না কে জানে।

সন্ধ্যাবেলা দি গ্রেট গনির কাছে যাবার সময় আবদুল্লাহ সাহেবের লোহালক্কড়ের দোকান হয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোককে দু'টা খবর দেয়ার আছে — এক, ঐদিন বৃষ্টি রাত দশটায় থামেনি। রাত দেড়টা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে। দুই, তাঁর ছাতাটা হারিয়ে গেছে। আবদুল্লাহ সাহেবের দোকানটার কি যেন নাম — কার্ড দিয়েছিলেন। কার্ডে লেখা ছিল — ও হ্যাঁ, লৌহ বিতান। নামটা ভাল হয়নি। লোহাঘর হলে ভাল ছিল। পিঠাঘরের মত লোহাঘর। আবদুল্লাহ সাহেবের বুড়ো কর্মচারিটার নাম যেন কি? ইন্টারেস্টিং বৃদ্ধ।

ইন্টারেস্টিং ধরনের মানুষদের আশেপাশে যারা থাকে তারাও ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে। বুড়াকে নিয়ে লেখা কবিতাটা সুবর্ণকে দিয়ে এলে কেমন হয়?

এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ছিলেন নিজ মনে
　　　　　　আপন ভুবনে
জরার কারণে তিনি পুরোপুরি বৃক্ষ এক।
বাতাসে বৃক্ষের পাতা কাঁপে
তাঁর কাপে হাতের আঙ্গুল।
বৃদ্ধের সহযাত্রী জবুথবু —
পা নেই, শুধু পায়ের স্মৃতি পড়ে আছে . . .

আতাহার সিদ্দিকের খোঁজে বের হয়েছে। ঢাকা ক্লাবের সামনে পানের দোকানে খোঁজ করতে হবে। এইসব কাজ ভাল পারত মজিদ। মজিদ দলছুট হয়ে পড়েছে। নেত্রকোনা গার্লস কলেজে সে এখন ইতিহাসের অধ্যাপক। ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। রুম ভর্তি 'সাজুগুজু' তরুণী। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। মজিদ গম্ভীর গলায় পড়াচ্ছে মোঘল পিরিয়ডে ভারতের অবস্থা। ভাবাই যায় না। এই মজিদ গাঁজা খেয়ে

নেংটো হয়ে সারা রাত দি গ্রেট গনির বারান্দায় বসে ছিল। কবিতা না ছাপা পর্যন্ত কাপড় পড়বে না। গনি সাহেব কবিতা ছেপেছিলেন। শুধু যে কবিতা ছাপিয়েছিলেন তাই না — কবিতার সম্মানী বাবদ পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলেছিলেন — যাও, গাঁজা কিনে খাও। শুধু একটা জিনিস মনে রেখো, গাঁজা খেয়ে কবিতা লেখা যায় না। গাঁজা থেকে যে জিনিস বের হয় তার নাম — 'গাজিতা', কবিতা না।

মজিদ হাসিমুখে বলেছিল, আংকেল, সমাজে যেমন কবিতার দরকার আছে তেমন গাঁজিতারও দরকার আছে। আমি সমাজের দিকে তাকিয়ে কাজটা করছি। কাউকে না কাউকে তো অপ্রিয় কাজটা করতে হবে।

দি গ্রেট গনিকে আংকেল ডাকার দুঃসাহস একমাত্র মজিদেরই ছিল।

মেঘলা দিনে পুরানো বন্ধুদের কথা মনে হয়। আজ আবার মেঘলা করেছে। যে হারে এ বছর বৃষ্টি-বাদল হচ্ছে — ভয়াবহ বন্যা না হয়েই যায় না। পুরো ঢাকা শহর চলে যাবে পাঁচ হাত পানির নিচে। পানির উপর ভেসে থাকবে দালান-কোঠা। ঘরবাড়ির জানালা থেকে আসা টিউব লাইটের আলো পড়বে পানিতে। তরুণীরা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে উদাস চোখে পানি দেখবে। মেয়েদের সঙ্গে পানির গোপন কোন সম্পর্ক আছে। মেয়েরা পানি দেখলেই উদাস হয়। কে জানে পানিও হয়ত মেয়েদের দেখলে উদাস হয়। হৃদয় নামক বস্তু শুধু মানুষের থাকবে, জড় জগতের থাকবে না, তা হয় না।

কবি

অফিসে আজ সাজ্জাদের প্রথম দিন। সে সারা জীবন শুনে এসেছে দশটা–পাঁচটা অফিস। এখানে এসে দেখছে আটটা–চারটা। প্রথম দিনেই দু' ঘণ্টা লেট। প্রথম দিনে অনেক কিছু ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখা হয়। দু' ঘণ্টা দেরিও নিশ্চয় ক্ষমার চোখে দেখা হবে। অফিসে পা দিয়ে কি করতে হবে না করতে হবে হোসেন সাহেব ছেলেকে ভালমত বুঝিয়ে দিয়েছেন — প্রথমেই চলে যাবি অফিসের যিনি প্রধান ব্যক্তি তাঁর ঘরে। নিজের পরিচয় দিবি। তারপর বলবি, Sir, with permission I intend to join today.

'ইংরেজিতে বলতে হবে?'

'ভদ্রলোক বাঙালী হলে বাংলায় বলতে পারিস। তবে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। সম্ভাবনা শতকরা ৯০ ভাগ যে, অফিস–বস হবেন বিদেশী।'

'সে ক্ষেত্রে আমাকে বলতে হবে — Sir, with your kind permission I intend to join today.'

'হ্যাঁ। ভাল কথা, তুই মিটিমিটি হাসছিস কেন?'

'তুমি যেভাবে আমাকে বুঝিয়ে–সুঝিয়ে পাঠাচ্ছ তাতেই হাসি আসছে। আমি স্মার্ট একটা ছেলে। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি।'

হোসেন সাহেব সরুচোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলের কথা তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না — আবার অবিশ্বাসও হচ্ছে না। ছেলেটা দেখতে তার মা'র মত — স্বভাব–চরিত্র মা'র মত নয়। বাবার মতও নয়। অন্য কারোর স্বভাব নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে। অথচ বৈজ্ঞানিক নিয়মে তাঁর অর্ধেক স্বভাব, তাঁর মা'র অর্ধেক স্বভাব পাওয়ার কথা। ছেচল্লিশটা ক্রমোজমের ভেতর তেইশটা আসে মা'র কাছ থেকে, তেইশটা আসে বাবার কাছ থেকে।

সাজ্জাদ বলল, বাবা, আমি রওনা হয়ে যাই।

হোসেন সাহেব বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয় — আমিও বরং তোর সঙ্গে যাই।

'তুমি যাবে কেন?'

'তোকে অফিসে দিয়ে এলাম, তোর অফিসটা দেখলাম। তোর যে বস উনার সঙ্গে এক কাপ চা খেলাম।'

সাজ্জাদ বলল, বাবা, আমার মনে হয় তোমার ব্রেনে শর্টসার্কিট হয়ে গেছে। তুমি

আমাকে হাত ধরে অফিসে নিয়ে যাবে? এই উদ্ভট চিন্তা তোমার মাথায় এল কি ভাবে? আমাকে অফিসে দিয়ে আসবে এটা কখন ঠিক করেছ? কাল রাতে?

'আরে না। এখন মনে হচ্ছে তোর সঙ্গে গেলে মন্দ হয় না।'

'তোমার এখন মনে হয়নি। তুমি জামাই সেজে বসে আছ সকাল থেকে।'

হোসেন সাহেব অস্বস্তির সঙ্গে কাশলেন। সাজ্জাদের সঙ্গে অফিসের ভেতর ঢোকার তাঁর কোন পরিকল্পনা ছিল না। তবে তিনি ভেবে রেখেছিলেন — সাজ্জাদের সঙ্গে গাড়ি করে যাবেন, তাকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে আসবেন।

'বাবা যাই?'

'আচ্ছা। সালাম করে যা। শুভ কাজে যাচ্ছিস, মুরুব্বীদের দোয়া নিবি না?'

'চাকরি করতে যাওয়া কোন শুভ কাজ না বাবা।'

সাজ্জাদ বাবাকে সালাম করল — সঙ্গে সঙ্গে হোসেন সাহেবের চোখে পানি এসে গেল। মাত্র সেদিনের কথা — কত ছোট্ট ছিল সাজ্জাদ! রোগা-ভোগা চেহারা। সামান্য কিছুতেই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠত। প্রথম দিন স্কুলে নিয়ে গেলেন, সাজ্জাদ বাঁদরের বাচ্চার মত গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলতে লাগল। কিছুতেই গলা ছাড়বে না। কান্না না, চিৎকার না, হৈ চৈ না। শুধু গলা জড়িয়ে ধরে থাকা। কাঠি কাঠি হাত। কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি সেই হাতের! অনেক কষ্টে ছেলের হাত ছাড়িয়ে তাকে স্কুলে দিয়ে তিনি স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিনও তাঁর চোখে পানি এসেছিল।

ক্লাস ফোরে যখন পড়ে তখনকার কথা। ভূতের কি একটা বই পড়েছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে। একা ঘুমাবে না — বাবার সঙ্গে ঘুমাবে। বাবার পাশে বালিশে শোবে না। বাবার বুকের উপর শুয়ে থাকবে। হোসেন সাহেব বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, শুয়ে থাক।

সেই ছেলে আজ চাকরি করতে যাচ্ছে। বিরাট বড় পোস্ট। চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে তিনি অনেক ধরাধরি করেছেন এটা ঠিক। তবে তাঁর ছেলে মাকাল ফল নয়, এটাও ঠিক। এই ছেলে রেকর্ড মার্কস নিয়ে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিল। দেশের সব ক'টা খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়েছে। সাজ্জাদের সঙ্গে তাঁর ছবিও ছাপা হয়েছে। তিনি ছেলের গলা জড়িয়ে ধরে বসেছিলেন।

ইন্টারমিডিয়েটে সাজ্জাদ কোন রকমে ফার্স্ট ডিভিশন পেল। লেটার, স্টার কিচ্ছু নেই। তিনি হতভম্ব হয়ে বললেন, সাজ্জাদ বাবা, কি হয়েছে রে? সাজ্জাদ হাসিমুখে বলল, গাড্ডু খেয়েছি।

'গাড্ডু খেলি কেন?'

সাজ্জাদ আবারো হাসল। আনন্দের হাসি। যেন গাড্ডু খাওয়ার মত আনন্দ আর কিছু নেই। হোসেন সাহেব ভয়ংকর মন খারাপ করলেন।

সেই মন খারাপ ভাব দূর হল যেদিন ফিজিক্স অনার্সের ফল বেরুল। সাজ্জাদ আবার মেট্রিকের মত রেজাল্ট করেছে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তবে পত্রিকাওয়ালাদের কাছে এই পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ না। এই পরীক্ষার ফার্স্ট হওয়া ছেলেমেয়ের ছবি ছাপা হয় না। হোসেন সাহেব বিজ্ঞাপন হিসেবে তিনটা পত্রিকায় ছবি ছাপার ব্যবস্থা করলেন। সাজ্জাদ

এম. এসসি. পরীক্ষা দিল না। তার নাকি পরীক্ষা দিতে আর ইচ্ছা করছে না। বড় অদ্ভুত ছেলে ! তাঁর ঘরে এরকম ছেলে কি করে হল কে জানে ?

সাজ্জাদের পরনে সাদা প্যান্ট। গায়ে কমলা রঙের স্ট্রাইপ দেয়া হাফ হাওয়াই শার্ট। সে অফিসে ঢুকেছে হাসিমুখে। অফিসটা তার পছন্দ হয়েছে। সবকিছু ঝকঝক করছে। মেঝেতে নিশ্চয় ফ্লোর পালিশ দেয়া। মেঝে আয়নার মত চকচক করছে। মনে হয় পুরো বাড়ি সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশান্ড। কোথাও কোন ফ্যান দেখা যাচ্ছে না — অথচ শীত শীত লাগছে।

অফিসের চরিত্র বোধহয় এখন পাল্টে গেছে। আগে যে কোন অফিসে ঢুকলে কানে আসত টাইপ রাইটারের খট খট শব্দ, নাকে আসত সস্তা সিগারেটের উৎকট গন্ধ।

সাজ্জাদের কানে টাইপ রাইটারের খট খট শব্দ আসছে না। সিগারেটের গন্ধও নেই। সম্ভবত পুরো বাড়ি ধূমপান মুক্ত। কোথাও অবশ্যি এ জাতীয় কোন সাইনবোর্ড নেই। হোটেলের রিসিপশনের মত একটা কাউন্টারে জনৈক তরুণীকে দেখা যাচ্ছে। তার সামনে এপল ম্যাকিনটোস কম্পিউটার। মেয়েটির সামনের টেবিলে প্লাস্টিকের সাইনবোর্ডে লেখা — **INQUIRY**

সাজ্জাদ মেয়েটির দিকে এগোল। সে কম্পিউটার নিয়ে এতই ব্যস্ত যে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে অস্বস্তি লাগছে। সাজ্জাদ দাঁড়িয়ে রইল। একসময় না একসময় মেয়েটির ব্যস্ততা কমবে, তখন তার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে।

'আপনার প্রয়োজন কি জানতে পারি ?'

সাজ্জাদ হাসিমুখে বলল — এই অফিসের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি।

'প্রধান ব্যক্তি বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন ?'

'যাকে বলে বস।'

'আপনি কি রকিব সাহেবের কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ, রকিব সাহেব হতে পারেন।'

'উনার সঙ্গে কি আপনার কোন এপয়েন্টমেন্ট আছে ?'

'জ্বি–না।'

'এপয়েন্টমেন্ট ছাড়া উনার সঙ্গে দেখা হবে না।'

'তাহলে নেক্সট যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে কি দেখা করা যাবে ?'

'কি জন্যে দেখা করতে চান সেটা কি আমাকে বলা যাবে ? May be I can help.'

'আমার নাম সাজ্জাদ। এরনস ইন্টারন্যাশনালে আমার একটা চাকরি হয়েছে। জয়েনিং রিপোর্ট দিতে চাই। কি ভাবে কি করব বুঝতে পারছি না।'

'স্যার, আপনার নাম কি সাজ্জাদ হোসেন ?'

'জ্বি।'

'কি আশ্চর্য স্যার, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আসুন, আপনাকে রকিব

স্যারের কাছে নিয়ে যাই। উনি আজ সকালেও আপনার প্রসঙ্গে জানতে চাচ্ছিলেন। আপনি জয়েন করছেন না কেন তা নিয়ে উনি চিন্তা করছিলেন। স্যার ভেবেছেন, আপনি বোধহয় এপয়েন্টমেন্ট লেটার পাননি। আমাকে মেইল লিস্ট চেক করতে বললেন।'

'ও, আচ্ছা।'

'স্যার, আসুন আমার সঙ্গে।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দিলেই হবে।'

'জ্বি না স্যার, আসুন।'

অফিসের বস সম্পর্কে যেসব ধারণা থাকে — রকিব সাহেবকে তার কোনটির সঙ্গেই সাজ্জাদ মিলাতে পারল না। একজন বয়স্ক হাসি-খুশি মানুষ। সাজ্জাদের পরিচয় শুনে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন — আরে ইয়াং ম্যান এসো, এসো। আজ সকালেই তোমার কথা হচ্ছিল। লীলাকে বললাম — লীলা, দেখ তো আমাদের নিউ রিক্রুটের কি হল। আমার তো মনে হচ্ছে সে চিঠি পায়নি।

সাজ্জাদ বলল, চিঠি আগেই পেয়েছি। জয়েন করতে দেরি করে ফেলেছি।

'দেরি করলে কেন বল তো? এইসব চাকরির জন্যে সবাই হা করে বসে থাকে। তুমি পেয়েও আসছ না। আশ্চর্য ! চা খাও — নাকি কফি খাবে?'

'একটা হলেই হবে।'

'বেশ, তাহলে কফি খাওয়া যাক। খুব ভাল কফি আছে। দাঁড়াও, দিতে বলছি। তুমি করে বলায় রাগ করছ না তো?

'জ্বি না।'

'তুমি করে বলার আমার রাইট আছে। আমাকে তত বুড়ো না দেখালেও আমি কিন্তু যথেষ্টই বুড়ো। আমার বড় মেয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ায় – ডঃ ইয়াসমিন। কাজেই আমার বয়স আন্দাজ করে নাও। সিক্সটি থ্রি।'

সাজ্জাদ কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমি কিন্তু কোন কাজকর্ম.জানি না। এরনস ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপারটা কি তাও জানি না।

'সবই জানবে। অতি দ্রুত জানবে। এটা একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী। এদের অনেক রকম ব্যবসা — আলপিন তৈরি করা থেকে জাহাজ বানানো সবই করে। ইনসেকটিসাইডের ব্যবসা আছে, ফার্মাসিউটিক্যালস আছে। এরা বাংলাদেশে এসেছে ফার্মাসিউটিক্যালস নিয়ে। অসুখ-বিসুখের দেশ তো, কাজেই অষুধ বিক্রি করতে চায়। দশকোটি মানুষের কাছে অষুধ বিক্রি তো সহজ কথা না। লালে লাল হবার কথা। তুমি কি সিগারেট খাও সাজ্জাদ?'

'জ্বি, খাই।'

'এই অফিসটা টোবাকো ফ্রী। তবে তুমি খেতে পার। আমার ঘরে অনুমতি আছে। আমি চুরুট খাই।'

'সাজ্জাদ সিগারেট ধরালো। রকিব সাহেব চুরুট ধরালেন। গলার স্বর নিচু করে বলতে লাগলেন — মাল্টিন্যাশানাল কোম্পানীতে কর্পোরেট পজিশনে চাকরি করা খুব

আরাম। প্রচুর টাকা। প্রচুর সুযোগ–সুবিধা। বৎসরে একবার কোম্পানীর খরচে ফ্যামিলি নিয়ে ইউরোপ–আমেরিকা যেখানে যেতে চাও যাবে। হলিডে কাটিয়ে আসবে। এরা টাকা চুষে নেয়। সেই চোষা টাকার খানিকটা দিয়ে যায় যারা টাকা চুষতে সাহায্য করে তাদের। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'প্রচুর খাটনি। তবে এরা খাটনি পুষিয়ে দেয়। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে গাড়ি পাবে। ফার্নিসড্ ফ্ল্যাট পাবে। একজন কুক, একজন মালি পাবে। অসুখ–বিসুখে আমেরিকান হসপিটালে চিকিৎসার সুবিধা পাবে। কাশি হয়েছে, সারছে না। চলে যাও সিঙ্গাপুর। সেখানে আমেরিকান হাসপাতাল আছে। এসো আমার সঙ্গে, তোমার ঘর দেখিয়ে দি। ইউনুস সাহেবকে দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছি, ইনি তোমাকে হাতে–কলমে সব বুঝাবেন। খুব এফিসিয়েন্ট লোক।

সাজ্জাদ দুপুর বারোটার মধ্যে নিজের ঘরে স্থায়ী হল। সুন্দর ঘর। ইউনুস সাহেব প্রবল আগ্রহে সব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

'স্যার, এই টেলিফোন। একটা ডিরেক্ট লাইন, আরেকটা পিবিএক্স। ফ্যাক্স এইখানে। আইবিএম কম্পিউটার আছে। অফিসের সব কম্পিউটারের সঙ্গে এটা যুক্ত। তবে আপনার ঘরে কোন প্রিন্টার নেই। ফটোকপিয়ার আছে।'

সাজ্জাদ হাই তুলতে তুলতে বলল, অনেক কিছুই দেখি আছে। কি নেই সেটা বলুন!

ইউনুস সাহেব দাঁত বের করে হাসলেন। যেন অফিসে সব কিছু থাকার পুরো কৃতিত্ব তাঁর।

'ইউনুস সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'দুপুরে খাবার ব্যবস্থা কি?'

'আমাদের ক্যান্টিন আছে। সাবসিডাইজ ফুড সার্ভিস। খুবই ভাল। রান্নাও ভাল। চাইনীজ, ইংলিশ, বেঙ্গলী সব ধরনের খাবার পাওয়া যায়।'

'ভাল। ভেরী গুড।'

'আজ প্রথমদিন আপনি স্যার রিলাক্স করুন। অফিস ঘুরে দেখুন। কাল থেকে ইনশাল্লাহ আমরা কাজ শুরু করব। ইচ্ছা করলে আজ স্যার আপনি বাসায়ও চলে যেতে পারেন।'

'আপনাদের অফিস ছুটি হয় কখন?'

'চারটার সময়। সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটা। মাঝখানে একটা থেকে দু'টা পর্যন্ত লাঞ্চ ব্রেক। শুক্র, শনি এই দু'দিন ছুটি।'

'সপ্তাহে দু'দিন ছুটি? ভালই তো।'

ইউনুস সাহেব আবার দাঁত বের করে হাসলেন। যেন সাপ্তাহিক দু'দিন ছুটির ব্যবস্থা তিনিই করেছেন।

'ইউনুস সাহেব!'

'জ্বি স্যার।'

'আপনি যান, আপনার কাজ করুন। লাঞ্চের সময় এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। দু'জন একসঙ্গে লাঞ্চ করব।'

'জ্বি আচ্ছা স্যার। আপনার পার্সোনাল একজন পিওন আছে। মতি নাম। বেল টিপলেই সে আসবে। চা-টা কিছু লাগলে এনে দেবে।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ইউনুস সাহেব বিদেয় নিলেন। সাজ্জাদ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। অফিসের এই চাকরি সে করতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে। জানালা বন্ধ বলেই কি দমবন্ধ লাগছে? জানালা খোলা যাবে না। সেন্ট্রালি এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ির জানালা খোলা যায় না।

পিঁ-পিঁ করে টেলিফোন বাজছে। সাজ্জাদের কাছে কেউ টেলিফোন করবে না। এই অফিসের নাম্বার কারোর জানার কথা নয়। সে নিজেই জানে না। সাজ্জাদ রিসিভার হাতে নিল।

'হ্যালো।'

'স্যার, আমি রিসিপশান থেকে বলছি — লীলা।'

'ও আচ্ছা, কি ব্যাপার?'

'আপনার একটা টেলিফোন এসেছে। দেব?'

'হ্যাঁ, দিন।'

সাজ্জাদ টেলিফোন কানে নিয়ে বসে আছে। কিছুক্ষণ বাজনা বাজল, তারপর হঠাৎ মনে হল লাইন কেটে গেছে। সাজ্জাদ যখন রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে তখন হোসেন সাহেবের গলা শোনা গেল —

'সাজ্জাদ।'

'জ্বি।'

'জয়েন করেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কেমন দেখছিস?'

'ভাল।'

সবার সঙ্গে পরিচয়-টরিচয় হয়েছে?'

'আস্তে আস্তে হচ্ছে।'

'তারা তোকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করছে তো?'

'সেটা তো বুঝতে পারছি না। তুমি আমার নাম্বার পেলে কোথায়?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস। হয়েছে কি . . . '

'আচ্ছা বাবা, তোমার ইতিহাস বাসায় এসে শুনব।'

'ব্যস্ত আছিস?'

'হ্যাঁ, ব্যস্তই আছি।'

'গুড। ভেরী গুড। জীবনে উন্নতি করতে হলে ব্যস্ত থাকতে হবে। যে যত ব্যস্ত তার জীবন তত উন্নত। ভাল কথা — আতাহারের টেলিফোন নাম্বার জানিস?'

'ওর কোন টেলিফোন নেই।'

'বাসার ঠিকানা?'

'বাসা কোথায় জানি। ঠিকানা জানি না। ওকে দরকার কেন?'

'ভাবছি, তোর চাকরিতে যোগ দেয়া উপলক্ষে কোন ভাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাব। আইডিয়া কেমন?'

'ভাল।'

'তুই কি অফিস থেকে ফেরার পথে ওকে একটা খবর দিয়ে আসতে পারবি?'

'পারব।'

'নীতু অবশ্যি বলছিল ওকে বাদ দিতে। সে চাচ্ছে শুধু নিজেরা নিজেরা যেতে। আমি চাচ্ছি ওকে সঙ্গে নিতে। ছেলেটাকে আমার খুবই পছন্দ। এ ভেরি গুড বয়।'

'বাবা, আমি রাখি।'

'নীতু বলছিল গুলশানে নতুন একটা জাপানি রেস্টুরেন্ট খুলেছে। ওর কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে। বুকিং দিয়ে রাখি?'

'রাখ।'

'কাঁচা মাছ-ফাছ খাওয়ায় কিনা কে জানে। জাপানিরা তো আবার কাঁচা মাছ খাওয়ার ব্যাপারে ওস্তাদ।'

'বাবা, এখন রেখে দেই।'

'আচ্ছা। তুই কিন্তু আতাহারকে একটা খবর দিস। তুই চাকরি শুরু করছিস। আনন্দের একটা ব্যাপার। এই আনন্দ বন্ধু-বান্ধব সবাইকে নিয়ে শেয়ার করা দরকার। সে অবশ্যি মনে কষ্ট পাবে। তোর এত ভাল চাকরি হল তার কিছু হল না। মনে কষ্ট পাবারই কথা। দেখি তার জন্যে কিছু করা যায় কিনা।'

'বাবা, আমি রাখলাম।'

সাজ্জাদ টেলিফোন নামিয়ে রাখল। চুপচাপ বসে থাকতেও ভাল লাগছে না। জানালা খোলা থাকলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা যেত। জানালা বন্ধ। জানালায় ভারি পর্দা টানা। কবিতা লেখার চেষ্টা কি করবে? না, নতুন কিছু লেখা যাবে না। প্রিয় ইংরেজি কবিতার অনুবাদের চেষ্টা করা যেতে পারে। রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। কোন কবিতাই পুরোটা মনে নেই। চার লাইন, ছ'লাইন।

অফিসের একটা র‍্যাক ইংরেজ কবিদের বইয়ে ভর্তি করে ফেলতে হবে। বাংলা কবিতার বই একটাও রাখা যাবে না। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর লোকজন অফিস ঘরে বাংলা কবিতার বই দেখলে সন্দেহজনক চোখে তাকাবেন। ইংরেজি কবিতার বই দেখলে কিছু মনে করবেন না। বরং রুচি, মেধা ও মননের প্রশংসা করবেন।

These pools that, though in forests still reflect
The total sky almost without defect,
And like the flowers beside them, chill and shiver,
Will like the flowers beside them soon be gone,
And yet not out by any brook or river,
But up by roots to bring dark foliage on

'বনের মাঝে মাঝে কাকচক্ষু জলের আভাস
সেই জলে বাস করে পরিপূর্ণ সমগ্র আকাশ।'

আভাসের সঙ্গে আকাশের মিল ঠিক আছে। তবে জলে 'প্রতিফলিত' হয়ের জায়গায় 'বাস করে' বলাটা কি ঠিক হচ্ছে? প্রতিফলন এবং বাস করা কি এক অর্থে নেয়া যায়?

সাজ্জাদ ভুরু কুঁচকে বসে রইল। একটা বেজে গেল। ইউনুস সাহেব দরজা খুলে উঁকি দিলেন। 'স্যার, লাঞ্চের সময় হয়েছে। এখন খাবেন?'

সাজ্জাদ কঠিন গলায় বলল, খবর্দার, বিরক্ত করবেন না। ইউনুস সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তিনি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছেন না।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। কাউকে টেলিফোন করতে ইচ্ছা করছে। কাকে টেলিফোন করবে? এমন কাউকে যার সঙ্গে কথা বললে মাথা ব্যথা কমে যায়। লীলাবতীকে করা যায়। লীলাবতীর নাম্বারটা যেন কি?

সাজ্জাদ কিছুতেই নাম্বার মনে করতে পারল না।

সন্ধ্যা থেকে হোসেন সাহেব সেজেগুজে বসে আছেন। জাপানি রেস্টুরেন্টে চারজনের বুকিং নেয়া হয়েছে। তিনি, নীতু, সাজ্জাদ এবং আতাহার। রেস্টুরেন্টে খেতে বসে কি কি গল্প করবেন মনে তার একটা তালিকাও তিনি তৈরি করেছেন। খেতে বসে হালকা গল্প করতে ভাল লাগে। মজার মজার রসিকতা, এনেকডোটস। আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করা। তাঁর হাতে এক হাজার পৃষ্ঠার বিশাল এক বই। বইটির নাম 'পার্টি জোকস।' অনেকগুলি রসিকতা এর মধ্যেই তিনি পড়ে ফেলেছেন। কোনটিতেই তেমন হাসি আসছে না।

নীতু এসে চা দিয়ে গেল। হোসেন সাহেব বললেন, কি রে, তুই সাজগোজ করলি না? নীতু বলল, ভাইয়া আগে আসুক তারপর সাজব। আমার সাজতে সময় লাগে না। সুন্দর মেয়েরা অনেক সময় নিয়ে সাজে। অসুন্দররা সাজে ঝটপট।

'তুই অসুন্দর কে বলল? তোর গায়ের রঙটা একটু চাপা। সৌন্দর্য মানুষের গায়ের রঙে না। সৌন্দর্য যদি গায়ের রঙে হত তাহলে শ্বেত কুষ্ঠ যারা শরীরে নিয়ে ঘুরছে তারা হত সবচে' সুন্দর মানুষ।'

নীতু বিরক্ত গলায় বলল, সৌন্দর্য নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করছে না বাবা।

'যা, রেডি হয়ে নে।'

'বাবা, আমার মনে হচ্ছে ভাইয়া আসবে না। আটটা বেজে গেছে এখনো যখন আসেনি। আজ বাইরে খেতে যাবার কথা বোধহয় ভুলে গেছে।'

'ভুলবে কেন? দুপুরেই তার সঙ্গে কথা বললাম।'

'তারপরেও ভুলে গেছে। আমার ধারণা সে পথে পথে ঘুরছে। কিম্বা কোন পার্কে বসে কবিতা নিয়ে ভাবছে।'

'তুই কাপড় পর তো মা, ও চলে আসবে।'

নীতু কাপড় বদলাতে গেল। রাত ন'টার সময় হোসেন সাহেব মোটামুটি নিশ্চিত হলেন — সাজ্জাদ আসবে না। তিনি তারপরেও বারান্দায় বসে রইলেন।

একা একা অন্ধকারে বসে থাকা বিরক্তিকর ব্যাপার। মশা কামড়াতে থাকে। ইদানীং মশাদের চরিত্রে পরিবর্তন ঘটেছে — তাদের কামড় আগের মত ভদ্র না। কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ফুলে ওঠে — এবং অনেকক্ষণ ধরে চুলকাতে থাকে। আগে দিনের বেলায় মশা কামড়াতো না, এখন দিনেও কামড়ায়। মশা নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কি রিসার্চ হচ্ছে? রিসার্চ হলে এই ব্যাপারটা নিশ্চয়ই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হত।

হোসেন সাহেব বারান্দায় পা গুটিয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে ছোট্ট একটা টেবিল। এই টেবিলে তাঁর পা রাখার কথা। সেখানে মশা তারানোর স্প্রে। তিনি তাঁর চারদিকে স্প্রে করে মশার অষুধ দিয়েছেন। অষুধে সম্ভবত কোন ভেজাল আছে। মশা আরো বেশি বেশি আসছে। শুধু মশা না — মশার মত দেখতে অন্যান্য পোকারাও আসছে।

পৃথিবীতে হাজারো রকমের ইনসেকটিসাইড। তার পরেও পোকার সংখ্যা এত বাড়ছে কেন? পোকাগুলির বুদ্ধিও মনে হয় বাড়ছে। এক সময় পৃথিবীটা কি পোকাদের দখলে চলে যাবে? পোকারা মানুষ মারার স্প্রে বের করে সমানে মানুষ মারতে থাকবে। এই যে তিনি বারান্দায় বসে আছেন — পোকারা তাকে দেখতে পেয়ে এক বোতল স্প্রে নিয়ে এসে ফুস করে তার নাকে ছেড়ে দিল।

চুপচাপ বসে থাকলে অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা ভাবনা তাঁর মাথায় আসে। এইসব চিন্তাভাবনা নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা করতে ইচ্ছা করে। আলোচনার মানুষ পান না। সবাই মনে হয় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে নীতুকে পাওয়া যায়, তবে সে মনে হয় গল্প গুজব শোনার ব্যাপারে আগ্রহী না। সাজ্জাদকে তো পাওয়াই যায় না। তিনি যখনই খোঁজ নেন তখনি শোনেন বাসায় নেই। ছেলেটাকে ঘরমুখো করার ব্যবস্থা করা দরকার। বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। তার পছন্দের কেউ থাকলে ব্যাপারটা সহজ হত। মনে হচ্ছে পছন্দের কেউ নেই। কণার কথা শুনেছেন। মেয়েটা কে? আতাহারকে জিজ্ঞেস করে জানতে হবে। আতাহারের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় — আসল ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতে মনে থাকে না। সে যদি আজ রেস্টুরেন্টে খেতে যেত তাকে জিজ্ঞেস করা যেত। পার্টিতে হাসি হাসি মুখে অনেক জটিল প্রশ্ন করা যায়।

সাজ্জাদের পছন্দের কেউ যদি না থাকে তাহলে মেয়ে খোঁজার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। তাঁকেই যেতে হবে। তবে এ ব্যাপারে সাজ্জাদের মার একটা মতামত নেয়া যেতে পারে। সেটা দোষের কিছু না। দীর্ঘদিন আগে কি হয়েছিল না হয়েছিল সেসব মনে রেখে লাভ নেই।

হোসেন সাহেবের স্ত্রীর নাম সাবেরা। স্ত্রীর নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে ছেলের নাম রেখেছিলেন সাজ্জাদ। মেয়ের নাম রেখেছিলেন সারা। মেয়ের নাম সারা থেকে কি করে নীতু হয়ে গেল তিনি ঠিক জানেন না। এটা ঠিক হয়নি। মায়ের নামের সঙ্গে মিলিয়েই ছেলে মেয়ের নাম হওয়া উচিত। ডে অব জাজমেন্টের দিন মায়ের নাম ধরেই ছেলেমেয়েকে পুনরোত্থিত করা হবে। বাবার নামে না।

সাবেরার উপর হোসেন সাহেব অসম্ভব খুশি ছিলেন। তাঁর ধারণা এ রকম বুদ্ধিমতী মেয়ে পৃথিবীতে কম জন্মেছে। শুধু বুদ্ধিমতী না, বুদ্ধিমতী এবং ভাল মেয়ে। সাধারণত এই দু'য়ের কম্বিনেশন হয় না। বুদ্ধিমতী মেয়েগুলির ভেতর নানান রকম জটিল প্যাঁচ থাকে। সাবেরার ভেতর এইসব ছিল না। স্বভাবচরিত্র অবশ্যি খানিকটা অদ্ভুত ছিল। যেমন মাঝ রাতে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, তিনি চাদর গায়ে দিয়ে আরাম করে ঘুমুচ্ছেন — সাবেরা তাকে ডেকে তুলে বলবে — এই শোন, ওঠতো, বৃষ্টি হচ্ছে। আমার সঙ্গে একটু ছাদে চল, বৃষ্টিতে ভিজব।

রাত তিনটায় বৃষ্টিতে ভিজা পাগলামী ছাড়া আর কি? তিনি স্ত্রীর সঙ্গে ছাদে যেতেন ঠিকই। চিলেকোঠায় বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সাবেরার বৃষ্টিতে ভেজা শেষ হতই না। ঘুমে তাঁর চোখ জড়িয়ে আসত — আর এদিকে সাবেরা ছাদের এ মাথা থেকে ও মাথায় যাচ্ছে। ছাদে জমে থাকা পানি পা দিয়ে ছিটাচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে চিৎ হয়ে ছাদে শুয়ে পড়ছে। গোসল শেষে হিহি করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে নেমে আসছে। ঠাণ্ডায় ঠোঁট নীল হয়ে আছে। এ জাতীয় পাগলামীকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত না — তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন, কারণ স্ত্রীর মনে কষ্ট দেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। প্রতিদিন কোর্ট থেকে একবার হলেও বাড়িতে টেলিফোন করতেন — তার কারণ একটাই, স্ত্রীর গলা শোনা। টেলিফোনে সাবেরার গলার স্বর শুনতে তাঁর এত ভাল লাগতো যে বলার না।

একবার সাবেরা বলল — সংসার টানতে টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সাত দিনের জন্যে আমি আমার বড় ভাইয়ের কাছে বেড়াতে যাব। একা যাব। এই সাতদিন তুমি সাজ্জাদকে রাখতে পারবে না?

তাঁর মনটা খারাপ হয়ে গেলো। তবু তিনি বললেন, পারব। অবশ্যই পারব। না পারার কি আছে?

'তাহলে তুমি সাজ্জাদকে নিয়ে থাকো। তোমার সমস্যা হলে তুমি তোমার মা'র কাছে রেখে এসো। সেখানে সে খুব ভালই থাকবে। আমি একা একা কয়েকটা দিন থাকব।'

তিনি শুকনো গলায় বললেন, আচ্ছা। স্ত্রীকে চিটাগাং মেলে তুলে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার সময় তাঁর চোখ ভিজে গেলো। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

সাবেরা চলে যাবার পর তিন রাত তিনি এক ফোঁটা ঘুমুতে পারলেন না। চতুর্থ দিনে সাজ্জাদকে তাঁর দাদীর কাছে রেখে চিটাগাং চলে গেলেন।

সাবেরা তাঁকে দেখে খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, কি ব্যাপার ?

তিনি হড়বড় করে বললেন, চিটাগাং–এ খুব জরুরি একটা কাজ পড়েছে। কোম্পানি আইনের একটা মামলা, পার্টি এমন করে ধরেছে — না এসে পারলাম না। ওরা আগ্রাবাদ হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। ভাবলাম তুমি যখন এখানে আছ শুধু শুধু হোটেলে থাকব কেন ?

নীতুর দু' বছর বয়সে সাবেরার কিছু একটা হল যা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। রাতে মাঝে মাঝে বাথরুমে যাবার জন্যে তাঁর ঘুম ভাঙ্গে। তিনি দেখেন তাঁর পাশে সাবেরা নেই। সে বারান্দায় মেঝেতে পা ছড়িয়ে রেলিং–এ হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। তার চোখে–মুখে রাজ্যের ক্লান্তি। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছেন, কি ব্যাপার সাবেরা ?

'কিছু না। ঘুম আসছে না তাই চুপচাপ বসে আছি। তুমি শুয়ে পড় আমি আসছি।'

'ঘুম আসছে না কেন ?'

'ঘুম আসছে না কেন সেটা আমি কি করে বলব ?'

'মাথায় পানি ঢেলে — এক কাপ গরম দুধ·খেলে . . .'

'তুমি ঘুমুতে যাও তো। তোমার ঘুমের ডাক্তার হবার দরকার নেই। ঘরের ভেতর গরম । বাইরে বসে থাকতে আমার ভালই লাগছে।'

'আমি বসব তোমার সঙ্গে ?'

'তুমি বসবে কেন? তোমার তো ঘুমের সমস্যা না। বিছানায় যাওয়া মাত্র তুমি ভুসভুস করে নাক ডাকাবে। বললাম তো আমি আসছি। তুমি শুয়ে পড়।'

তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে নিজে ঘুমিয়ে পড়লেন।. শেষ রাতে জেগে দেখেন — সাবেরা পাশে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। কখন সে বিছানায় এসেছে কে জানে।

তারপর ভয়ংকর ঘটনাটা ঘটল। নভেম্বর মাসের এগারো তারিখ ঠিক এগারোটার সময় হোসেন সাহেব সাবেরার টেলিফোন পেলেন। সে কখনোই তাঁর চেম্বারে টেলিফোন করে না। হোসেন সাহেব অসম্ভব খুশি এবং অসম্ভব অবাক হয়ে বললেন, কি ব্যাপার সাবেরা ?

সাবেরা বলল, তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলব। তোমার কি এখন সময় হবে ?

'আরে কি বল, সময় হবে না কেন ? আমি বাসায় চলে আসছি।'

'বাসায় আসতে হবে না। কথাগুলি টেলিফোনে বলাই ভাল। তোমার আশে পাশে কি কেউ আছে ?'

'না।'

'শোন — তোমার সংসারে আমার মন টিকছে না।'

হোসেন সাহেব হতভম্ব গলায় বললেন, কি বললে ?

'তোমার সংসারে আমার মন টিকছে না। অনেকদিন ছিলাম, খুব কষ্ট করে ছিলাম।'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

হোসেন সাহেব আবারো বললেন, কি বললে?

সাবেরা বললেন, আমি এখন চলে যাচ্ছি— তুমি সাজ্জাদ এবং সারাকে দেখবে। ওদের খানিকটা কষ্ট হবে — কি আর করা।

'কি বলছো সাবেরা?'

'ডিভোর্সের কাগজপত্র তোমার কাছে চলে আসবে। তুমি সই করে দিও। আমি চাইনা ডিভোর্সের মামলা কোর্টে উঠুক।'

'ডিভোর্সের কথা কি বললে?'

'আমার লইয়ারের কাছ থেকে তুমি চিঠি পাবে। সেই চিঠিতে অনেক আজে বাজে কথা তোমার সম্পর্কে লেখা। এইসব ছাড়া না-কি ডিভোর্স মামলা টেকে না। কাজেই বাধ্য হয়ে লিখতে হয়েছে। তুমি কিছু মনে করো না। যে সব অভিযোগ তোমার সম্পর্কে করা হয়েছে তা সবই মিথ্যা। সেটা তুমি যেমন জান, আমিও জানি।

হোসেন সাহেব আবারো বললেন, সাবেরা তুমি কি বলছো?

সাবেরা বলল, রাখি, কেমন?

হোসেন সাহেব দু'ঘন্টার মত চেয়ারে বসে রইলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন। বাসায় ফিরে সাবেরাকে আর দেখলেন না।

উকিলের চিঠি পেলেন তার পরদিন। সাবেরা তার বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ এনেছে। চরিত্রহীনতার অভিযোগ এনেছে। কাজের মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এবং এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বাদী স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের আবেদন করেছে।

এতবড় একটা ঘটনা নিয়ে চিন্তা করার মত সময় হোসেন সাহেব পেলেন না — বাসায় ফিরে শোনেন সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে সাজ্জাদ গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে আছে। তার নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। বাসায় সাবেরা নেই। কাজের লোক, মালি, এরা ছোটাছুটি করছে — কি করবে কিছু বুঝতে পারছে না। পরবর্তী সাতদিন হোসেন সাহেব প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে কাটালেন। ছেলে অচেতন — ডাক্তার সন্দেহ করছে ব্রেইন হেমারেজ। অপারেশন করার মত সাহসও পাচ্ছে না। ছেলের স্বাস্থ্য খুব খারাপ। অথচ অপারেশন করে মস্তিষ্কে জমে যাওয়া রক্ত পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় দিনের দিন অপারেশন হল। সাধারণত যে কোন অপারেশনের পর সার্জন বলেন, অপারেশন সাকসেসফুল। সাজ্জাদের বেলায় বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না। আমার যা করার করেছি, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না। পঞ্চম দিনের দিন সে চোখ মেলে তাকালো। তারপরের দিন বলল — আম্মু কোথায়?

সাবেরা ছিল না। ছেলের এমন ভয়াবহ সমস্যার কথা তার না জানার কথা না। জেনেও সে আসেনি বা যোগাযোগের চেষ্টা করেনি। হোসেন সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সাবেরার উকিল। মোটাসোটা একজন মানুষ। ভালমানুষ টাইপ চেহারা। হাসিখুশি স্বভাব। উকিল সাহেবের বক্তব্য হচ্ছে — মামলা কোর্টে উঠলে নানান সমস্যা হবে। মান সম্মানের প্রশ্ন। মান সম্মান অনেক বড় ব্যাপার।

হোসেন সাহেব বললেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সবই মিথ্যা — কাজেই মানসম্মানের প্রশ্ন আসছে না।

'অভিযোগ মিথ্যা সেটা আপনি জানেন, আপনার স্ত্রী জানেন। কোর্ট তো জানে না। কোর্ট বিচার করবে সাক্ষ্য-প্রমাণ।'

'কি সাক্ষ্য-প্রমাণ?'

'যে কাজের মেয়েটির সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্ক ছিল এবং যে সম্পর্কের কারণে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে সেই মেয়ে সাক্ষ্য দিবে। যে ক্লিনিকে গর্ভপাত করানো হয়েছে — সেই ক্লিনিকের ডাক্তার সাক্ষ্য দেবে। টাকা পয়সা খরচ করলেই আজকাল সাক্ষী পাওয়া যায়। কি করবেন বলুন — সময় বদলে গেছে। এই জন্যেই বলছি মিউচুয়েল এগ্রিমেন্টে চলে আসুন। দু'জন এক সঙ্গে গিয়ে কাগজপত্রে সই করে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলুন।'

'আমি সাবেরার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'উনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান না। উনি কিছুই চান না, চাইল্ড কাস্টডিও চান না। উনার নামে যে বাড়িটা আছে তাও চান না। উনি শুধু চান সম্মানজনক নিষ্পত্তি।'

হোসেন সাহেব দীর্ঘ সময় ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন — আচ্ছা, ঠিক আছে।

উকিল সাহেব পকেট থেকে কাগজের তাড়া বের করে বললেন — স্যার, আপনাকে কোথাও যেতেও হবে না। এইখানে সই করলেও হবে।

হোসেন সাহেব সই করলেন। উকিল সাহেব বললেন, পড়ে দেখবেন না? পড়ে দেখুন — টার্মস এন্ড কন্ডিশানস।

'না, পড়তে হবে না।'

সাবেরার সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ নেই। তিনি জানেন সে ঢাকা শহরেই আছে। কোথায় আছে সেই ঠিকানাও তিনি জানেন। টেলিফোন নাম্বার জানেন। মাঝে মাঝে খুব গোপনে সেই নাম্বারে টেলিফোন করেন। বেশির ভাগ সময় শ্লেষ্মা মিশানো বয়স্ক এক ভদ্রলোকের গলা শোনা যায় — হ্যালো, কে?

তিনি খট করে টেলিফোন নামিয়ে দেন। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধদিন সাবেরা টেলিফোন করে। অতি চেনা গলায় বলে, হ্যালো।

তাঁর খুব বলতে ইচ্ছে করে — কেমন আছ সাবেরা? বলা হয় না। মানুষ তার সবচে' জরুরী কথাগুলিই আসলে কখনো বলতে পারে না।

কবি

বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে।

আতাহারের হাতে ছাতা। লাল–নীল ফুল আঁকা বাহারি ছাতা। মিলির কাছ থেকে নেয়া। মিলি বিস্মিত গলায় বলেছে, মেয়েদের ছাতা নিয়ে রাস্তায় হাঁটতে পারবি?

আতাহার বলেছে, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যদি রাস্তায় হাঁটতে পারি মেয়েদের ছাতা হাতে হাঁটতে অসুবিধা কি। বৃষ্টি নামবে কি না সেটাই হল বিবেচ্য।

'হারাবি না ভাইয়া।'

'না, হারাবো না।'

মেয়েদের রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে হাঁটা শুরুতে যতটা বিপজ্জনক মনে হয়েছিল রাস্তায় বের হয়ে ততটা বিপজ্জনক মনে হল না। কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। যারা তাকাচ্ছে তারা অবাক বা বিস্মিত হচ্ছে না। ঢাকা শহরের চরিত্রে গুণগত একটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। শহরের মানুষরা অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে না। যার যে ভাবে ইচ্ছা চলবে। তাতে কিছুই যায় আসে না।

আতাহারের প্যান্টের পকেটে রবার্ট ফ্রস্টের চারটি কবিতার অনুবাদ। অনুবাদগুলি সাজ্জাদের করা। অফিসে বসে তার প্রধান কাজ হচ্ছে কবিতা অনুবাদ করা। আতাহারের দায়িত্ব পড়েছে চারটা মূল কবিতা অনুবাদসহ গনি সাহেবের কাছে পৌঁছে দেয়া। আতাহার খালি হাতে যাচ্ছে না। কবিতার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে কনিয়াকের একশ' মিলিলিটারের একটা বোতল। সাজ্জাদ গনি সাহেবের কাছে শুধু কবিতা কখনো পাঠায় না।

রবার্ট ফ্রস্টের কবিতার অনুবাদ কেন বাংলা ভাষায় হওয়া উচিত সেই বিষয়ে গনি সাহেবকে কিভাবে বলতে হবে সাজ্জাদ তাও শিখিয়ে দিয়েছে। সাজ্জাদ বলেছে, আতাহার, তুই গম্ভীর গলায় বলবি, কবি রবার্ট ফ্রস্ট খুব ইন্টারেস্টিং একটা দিনে জন্মেছেন — ২৬শে মার্চ। আমাদের স্বাধীনতা দিবস। তাঁর প্রথম দু'টি কবিতার বই কিন্তু নিজ দেশে প্রকাশিত হয়নি — প্রকাশিত হয়েছে ইংল্যান্ডে। এই কবি চারবার পুলিৎজার প্রাইজ পেয়েছেন। এবং তিনি ছিলেন চাষা–কবি। যিনি নগরজীবন পরিত্যাগ করে আক্ষরিক অর্থেই চাষাবাদ করে জীবন কাটাতে চেয়েছেন। খুব গুছিয়ে বলবি। পারবি না?

'পারার তো কথা।'

গনি সাহেব চাইলে আমি কবিতার সঙ্গে ছোট্ট করে রবার্ট ফ্রস্টের জীবনীও লিখে দিতে পারি।

'তোর মাথায় কি এখন রবার্ট ফ্রস্ট ভর করেছে?'

সাজ্জাদ গম্ভীর গলায় বলেছে, আমার মাথায় কিছুই ভর করে না। আমি মাঝে মাঝে অন্যের উপর ভর করি। এই মুহূর্তে সিন্দাবাদের বুড়োর মতো ফ্রস্টের কাঁধে ভর করেছি। এবং মনে হচ্ছে উনি পঁচিশ ক্যারেট গোল্ডের কবি। পৃথিবীর বেশিরভাগ কবিই আঠারো ক্যারেটের। খাদ বেশি। পঁচিশ ক্যারেট কবির সংখ্যা কম।

'শামসুর রাহমান, উনি কত ক্যারেটের?'

'উনারটা এখনো হিসেব করি নি।'

'বাংলা কবিদের ভেতর পঁচিশ ক্যারেটের কারা আছে?'

'অনেকেই আছে। জীবনানন্দ দাশ আছে।'

'আমি কত ক্যারেটের?'

'তুই হচ্ছিস ব্রোঞ্জ-কবি। তোর মধ্যে সোনা নেই, পুরোটাই ব্রোঞ্জ।'

আতাহারের একটু মন খারাপ হল। মন খারাপ ভাবটাকে তেমন পাত্তা দিল না।

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। গনি সাহেবের বাসার সামনে হাঁটুপানি থাকার কথা। অদ্ভুত কোন কারণে বাসার সামনেটা খটখটে শুকনা। ড্রেনেজ সিস্টেমে রাতারাতি কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। গনি সাহেবের বাসার গেটে খাকি পোশাক পরা শুকনা লম্বা এক লোক। মাথায় সবুজ টুপি, পায়ে বুট। প্রথম দর্শনে মনে হয় পুলিশ বা আনসার বাহিনীর কেউ। ভাল করে তাকালে সেই ভুল ভেঙে যায়। সিকিউরিটির লোক। কাঁধে পেতলের ছাঁচে লেখা — সিকিউরিটি গার্ড।

'কার কাছে যাইবেন?'

'গনি সাহেবের কাছে।'

'খাতায় নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার লেখেন। তারপর যান।'

'ব্যাপারটা কি?'

সিকিউরিটি গার্ড ব্যাপার কি সেই ব্যাখ্যায় গেল না। খাতা এবং বল পয়েন্ট কলম বের করে দিল। খাকি পোশাক মানুষের চরিত্র হনন করে। খাকি পোশাক পরলেই লোকজন কম কথা বলে। নাম-ঠিকানা লিখতে লিখতে আতাহারের মনে হল, হোসেন সাহেবকে একটা খাকি পোশাক পরিয়ে দিতে পারলে ভাল হত। উনার কথাবলা রোগ সেরে যেত।

গনি সাহেব দরজা খুলে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আতাহারের দিকে তাকালেন। আতাহার বলল, আপনার বাসায় মিলিটারী পাহারা বসিয়েছেন, ব্যাপার কি?

গনি সাহেব চোখ সরু করে বললেন, ব্যাপার কি তুমি জান না?

'জ্বি-না'

'পুরো ঢাকা শহরের সবাই জানে আর তুমি জান না?'

'জ্বি-না — আমি জানি না।'

'ভেতরে এসে বোস। বলছি। লম্বা ইতিহাস।'

'সাজ্জাদ আপনার জন্যে এক বোতল কনিয়াক পাঠিয়েছে।'

'গুড। বর্ষার স্যাঁতস্যাতে আবহাওয়ায় আমার হাঁপানির মত হয়েছে। কনিয়াকটা কাজে লাগবে। কনিয়াক হাঁপানির ভাল মেডিসিন। ও আছে কেমন?'

' জ্বি, ভাল আছে।'

'অনেকদিন ওকে দেখি না। একদিন নিয়ে এসো। খুবই ফোর্সফুল ছেলে। প্রাণশক্তিতে ভরপুর। কবিতায় লেগে থাকলে ওর হবে। কবিতায় সে কিছু কিছু ইমেজারি এমন ব্যবহার করে যে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তুমি চা খাবে আতাহার?'

'জ্বি-না।'

'খাও এক কাপ চা। চা খেতে খেতে শোন বাড়িতে কেন সিকিউরিটি গার্ড রেখেছি। শুনে যাও, কিন্তু কারো সঙ্গে ডিসকাস করবে না। আমি চাই না এই কদর্য ব্যাপার লোকজন জানুক। অবশ্যি সবাই জেনে গেছে। খুব কম লোকই আছে যে জানে না।'

'ব্যাপারটা কি?'

গনি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তাঁর চোখে-মুখে হতাশ ভাব ফুটে উঠল —

'গত বধুবারের আগের বুধবারের ঘটনা। তুমি তো জান আমি আর্লি রাইজার। যত রাত জেগেই পড়াশোনা করি না কেন — সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠি। হাত-মুখ ধুয়ে দুধ-চিনি ছাড়া এক কাপ চা খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বের হই। সেদিনও তাই করব বলে সদর খুলেছি — দেখি বারান্দা ভর্তি "পুরীষ"। বিকট গন্ধ আসছে।

'পুরীষটা কি?'

'পুরীষ জান না? বাংলা ভাষায় তোমাদের দখল এত কম? আশ্চর্য! পুরীষ হল বিষ্টা। গ্রাম্য ভাষায় গু। মানুষের গু।'

আতাহার হতভম্ব গলায় বলল, বারান্দা ভর্তি পুরীষ?

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে দুই-তিন টন পুরীষ রাতে এসে ঢেলে রেখে গেছে।'

'সে কি?'

'শত্রুতা করে কেউ করিয়েছে।'

'আপনার সঙ্গে কার এমন শত্রুতা থাকবে?'

'সেটাই তো বুঝছি না। আমি নির্বিরোধী মানুষ। লেখাপড়া নিয়ে থাকি। কেউ বলতে পারবে না আমি কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেছি।'

'তা তো বটেই।'

'সারাদিন লাগল আমার এই নোংরা পরিষ্কার করাতে। তিনজন মেথর লেগেছে। ডেটল দিয়ে ধুইয়েছি, ফিনাইল দিয়ে ধুইয়েছি। তারপরেও গন্ধ যায় না।'

'খুবই যন্ত্রণা হয়েছে তো।'

'যন্ত্রণা তো বটেই। যন্ত্রণার চেয়ে বেশি হল হিউমিলিয়েশন। প্রতিবেশীরা সবাই আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকায়। শুকনা মুখে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপারটা কি? কিন্তু তাদের ঠোঁটের কোণার কাছে হাসি।'

'এটা তো হাসির কোন ব্যাপার না।'

'হাসির ব্যাপার নয় তো বটেই। কিন্তু মানুষের হাসি তো তুমি বন্ধ করতে পারবে না। আমি থানায় জি ডি এন্ট্রি করাতে গেলাম, ঘটনা শুনে রমনা থানার ওসি দেখি ভ্যাক ভ্যাক করে হাসে। যাই হোক, ঘটনার এইখানে সমাপ্তি হলে একটা কথা ছিল — তা না, পরের বুধবারে আবার এই ঘটনা।'

'বলেন কি?'

'আমার স্ত্রী তো কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। তিনি এখানে থাকবেন না। ফ্ল্যাট ভাড়া করে সাত-আট তলার দিকে থাকবেন।'

'আমার তো মনে হচ্ছে সেটাই করতে হবে।'

'তুমি কি পাগল হলে? গুণ্ডামি-বদমায়েশীর কাছে নতি স্বীকার করব? ক্যান আই ডু দ্যাট? আমি তো বদমায়েশীর মূল টান দিয়ে বের করব। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য সিকিউরিটি গার্ড রেখেছি। জলের মত পয়সা খরচ হচ্ছে। হোক। আমি ছাড়ব না। আমি সিআইডি দিয়ে ইনভেস্টিগেট করাব।'

'করা তো উচিত।'

'ওরা ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি। আমি নির্বিরোধী লোক — এটা ঠিক আছে। তাই বলে আমাকে নির্বিষ ঢোরাসাপ মনে করার কোন কারণ নেই।'

ঘটনা শুনে আতাহারের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কি সর্বনাশের কথা! সাজ্জাদ যে সত্যি সত্যি গু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে তা তো বলেনি। এই সব ব্যাপার চাপা থাকে না। ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তার ফলাফল খুব শুভ হবার কথা না।

'গনি ভাই, উঠি?'

'উঠবে? আচ্ছা যাও। মন খুলে যে সাহিত্য-টাহিত্য নিয়ে আলাপ করব সে উপায় নেই। মনটা ঐ ঘটনার পর থেকে বিক্ষিপ্ত। যাই হোক, সাজ্জাদকে একদিন নিয়ে এসো। ও যেনো তার রিসেন্ট কিছু কবিতা নিয়ে আসে।'

'কয়েকটা অনুবাদ অবশ্যি সে আমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। রবার্ট ফ্রস্টের অনুবাদ।'

'ভেরী গুড। রেখে যাও। মেজর পয়েটদের কবিতা অনুবাদ করলে হাত খুলে। রবার্ট ফ্রস্ট অবশ্যি মেজর পয়েটদের মধ্যে পড়ে না। তার কবিতায় কথকতার একটা ঢং আছে। পড়তে আরাম, এইটুকুই। টেলিফোনের উপর তাঁর একটা কবিতা আছে। তুমি জান?

'জ্বি-না।'

'একজন প্রধান কবি টেলিফোন নামক যন্ত্র নিয়ে কবিতা লিখছেন, এটাকে তুমি কিভাবে দেখবে?'

'কি লিখেছেন সেটা না জানলে বলা মুশকিল।'

গনি সাহেব তৎক্ষণাৎ পুরো কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। এই প্রথমবারের মত আতাহারের মনে হল, এই লোকের পড়াশোনা আসলেই ব্যাপক।

"When I was just as far as I could walk
From here to-day,
There was an hour
All still
When leaning with my head against a flower
I heard you talk.
Don't say I didn't, for I heard you say —
Do you remember what it was you said?"
"First tell me what it was you thought you heard."

আতাহার বলল, গনি ভাই, কবিতাটা কেমন?

গনি সাহেব বললেন, অসাধারণ।

'আপনি বলেছিলেন উনি একজন মাইনর কবি।'

'মাইনর কবি তো বটেই। মাইনর কবিরাও মাঝে মাঝে দু'-একটা মেজর কবিতা লিখে ফেলে।'

গনি সাহেব আতাহারকে গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিলেন। কেন দিলেন আতাহার জানে না। গেটে দাঁড়িয়ে থাকা সিকিউরিটি গার্ড বুটে প্রচণ্ড শব্দ করে স্যালুট দিল।

কবি

সালমা বানু লজ্জা লজ্জা চোখে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছেন। কেন এমন লজ্জা লাগছে নিজেও বুঝতে পারছেন না। ত্রিশ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর স্বামীকে দেখে তরুণী বয়সের লজ্জা পাবার কোন অর্থ হয় না। অসুখের পর অনেক অর্থহীন ব্যাপার তাঁর মধ্যে ঘটছে। গল্প করার মত কেউ থাকলে এইসব নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতেন। মিলি আসে খুব অল্প সময়ের জন্যে। এসেই কেবিন গোছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আয়াদের অসুখের কথা জিজ্ঞেস করে, তারপর যায় ডাক্তারের খোঁজে। তার সঙ্গে গল্প করার মত সময় বের করা যায় না। মাঝে মাঝে মিলি গম্ভীর হয়ে পা ঝুলিয়ে তাঁর পাশে বসে। তখন মেয়েটার গম্ভীর মুখ দেখেই সালমা বানু কোন কথা শুরু করতে পারেন না। মেয়েটার কি অন্য কোন ঝামেলা হয়েছে? সে এত গম্ভীর কেন? মেয়েটার বিয়ের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে — কোন সম্বন্ধ আসছে না। মিলিকে নিয়ে তাঁর ইদানীং খুবই দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে।

রশীদ সাহেবও ঠিক মিলির ভঙ্গিতেই বসেছেন। পা ঝুলিয়ে বসেছেন, পা দুলাচ্ছেন। হাসপাতালের কেবিনের বেডগুলি উঁচু উঁচু, বসলেই পা ঝুলে থাকে। রশীদ সাহেবের মুখ গম্ভীর। এই গাম্ভীর্যের কারণ সালমা জানেন। ত্রিশ বছর পাশাপাশি বাস করলে একটা মানুষের সব কিছু জানা হয়ে যায়। সালমা বানু জানেন তার স্বামী গম্ভীর হয়ে আছে কারণ বেচারা অনেকক্ষণ সিগারেট খেতে পারছে না। রশীদ সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সালমা, তোমাদের এইসব ঘরে সিগারেট খাওয়া যায় না?'

সালমা বললেন, খেয়ে ফেল কিছু হবে না।

রশীদ সাহেব পকেটে হাত দিলেন। আবার হাত সরিয়ে নিলেন। তাঁর গাম্ভীর্য আরো বাড়ল। হাসপাতাল তিনি সহ্যই করতে পারেন না। ফিনাইলের গন্ধ, তাঁর কাছে মৃত্যুর গন্ধের মত লাগে। মৃত্যুর গন্ধ মনের উপর চাপ ফেলে। এম্নিতেই তিনি নানান ধরণের চাপের মধ্যে থাকেন। বাড়তি চাপ নেয়ার মত অবস্থা এখন তাঁর না।

সালমা বানু ক্ষীণ স্বরে বললেন, চা খাবে?

রশীদ সাহেব বিরক্ত মুখে তাকালেন। সালমা বললেন, চা খেলে বারান্দায় একটা ছেলে আছে তাকে বল, সে চা এনে দেবে।

'হাসপাতালের জীবাণু মাখা চা খাব কেন?'

'হরলিক্স খাবে? ফ্লাস্কে গরম পানি আছে। হরলিক্স বানিয়ে খাও।'

রশীদ সাহেব কঠিন কিছু কথা বলতে গিয়েও বললেন না। তিনি কি হরলিক্স খাওয়ার জন্যে হাসপাতালে এসেছেন? আর এত মেহমানদারিইবা কি আছে? চা খাও — হরলিক্স খাও। তাঁর বসে থাকতে অসহ্য লাগছে। এতদিন পর এসেছেন। এসেই চলে যেতেও মায়া লাগছে। আরো কিছুক্ষণ থাকা দরকার।

সালমা বললেন, বাসার খবরাখবর কি?

রশীদ সাহেব জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে থাকতে খারাপ লাগছে বলে সালমা খবরাখবর জানতে চাচ্ছে। জানার কিছু নেই, মিলি রোজ আসছে। খবরাখবর যা আছে মিলি বলে যাচ্ছে। মেয়েদের কাজই হল খবর চালাচালি করা। সালমা বললেন, ফরহাদকে তুমি বকা ঝকা করনিতো?

'করেছি। জুতা-পেটা যে করিনি এটা তার ভাগ্য। জুতা পেটা করা দরকার ছিল। বাটা কোম্পানীর জুতা দিয়ে শক্ত পেটা।'

'তারতো দোষ কিছু না। ফট করে মাথা ঘুরে গেছে।'

'সহজ প্রশ্ন দেখে যার মাথা ঘুরে যায়, প্রশ্ন কঠিন হলে মাথা কি করত বুঝতে পারছ? মিল্লাত পাখার মত ভনভন করে ঘুরত।'

সালমা হেসে ফেললেন। রশীদ সাহেব কঠিন গলায় বললেন, হাসবে না। হাসার কথা আমি বলি না! তোমার সব ক'টা ছেলেমেয়ে চতুষ্পদ মার্কা। একজন সহজ প্রশ্ন দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যায়, একজন তিন বছরেও একটা দারোয়ানের চাকরি জোগার করতে পারে না। মেয়ে একই রকম। মেয়েদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি একটু ইতঃস্তত করলেন। দু'টা মেয়েই তার অতি প্রিয়। এদের সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে অস্বস্তি লাগে। যদিও অস্বস্তি লাগার কিছু নেই, মেয়ে দু'টিও হাঁদারাম — কিংবা স্ত্রী লিঙ্গে হাঁদিরাম। বড়টা — বিরাট বড় হাঁদি। ছোটটাকে বুদ্ধিমতী মনে হলেও সে আসলে হাঁদি। প্রথম বার বি এ পরীক্ষায় থার্ড ক্লাস পেয়ে কেঁদে বুক ভাসাল। পরের বছর ইমপ্রুভমেন্ট দিয়ে — ফেল। তখন আর চোখে পানি নেই। সে হাঁদিরাম না হলে কে হবে। রিটায়ারমেন্টের পর লোকজন আরাম করে। ইজিচেয়ারে শুয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে। ছেলের বউ এসে জিজ্ঞেস করে — বাবা, চা খাবেন না কফি খাবেন। আর তাঁর সংসারে সব ক'টা হাঁদারাম আর হাঁদিরাম জোটায় বিশ্রাম মাথায় উঠেছে। তিনি এখন চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। নানান অফিস-টফিসে যাচ্ছেন। পার্টটাইম চাকরি কিছু পাওয়া যায় কি-না।

সালমা বললেন, হাসপাতালে বসে থাকতে তোমার বোধ হয় ভাল লাগছে না। চলে যাও।

রশীদ সাহেব একটু নড়েচড়ে উঠলেন — সালমা তাঁর মনের কথা বলছে। রোগীর পাশে খাটে বসে থাকতে তার অসহ্য লাগছে। সালমা বললেন —

'মিলির বিয়ের কোন কথাবার্তা হচ্ছে?'

'না।'

তুমিও তো কোন চেষ্টাচরিত্র করছ না।'

'আমি কি চেষ্টা করব? মাইক নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে যাব?'

'তোমার কাছে মেয়েরা পড়তে আসে, ওদের বললে — ওরা খোঁজ খবর করবে।'

'ওদের তো কোন কাজকর্ম নেই . . . বাজে কথা বন্ধ কর তো। আমি উঠি। মাথা ধরে গেছে।'

রশীদ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। সালমা বললেন, ফরহাদকে আমার কাছে পাঠিও। আতাহারকেও আসতে বলো। দু'জনের কেউই তো আসে না।

না আসাই ভাল। এদের মুখ যত কম দেখবে ততই শুভ। The less you see their faces the better.

'তোমার চুল এত লম্বা হয়েছে, চুল কাটনা কেন।'

রশীদ সাহেব তিক্ত গলায় বললে, আর চুল কাটাকাটি, মাথাই কেটে ফেলে দিব। যাই সালমা।

'আচ্ছা।'

'তোমার শরীর তো আগের চেয়ে অনেক ভাল, তাই না?'

সালমার শরীর আগের চেয়ে মোটেই ভাল না — তবু তিনি বললেন, হ্যাঁ। রশীদ সাহেব বললেন, খামাখা হাসপাতালে থেকে লাভ কি? ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে বাসায় চলে আস। দেখি কাল সকালে আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলব।

সালমা বললেন, আচ্ছা।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললেন, কাল থেকে কেবিনে চায়ের ব্যবস্থা রাখবেন। আয়াকে বলে রাখবেন — সে যেন চট করে চা বানিয়ে দেয়। চা, মিষ্টি পান। কাঁচা সুপারি দিয়ে মিষ্টি পান। রশীদ সাহেবের দাঁতে সমস্যা হয়েছে। শক্ত সুপারি চিবুতে পারেন না। নরম কাঁচা সুপারি ছরতা দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে দিতে হয়। মিলিকে বার বার বলে দিয়েছেন। মিলি এইসব দেখছে কি-না কে জানে। সংসারের শতেক ঝামেলা মেয়েটার উপর পড়েছে। এরমধ্যে ছোটখাট সমস্যা কি মনে থাকবে। বড় সমস্যার দিকে সবার চোখ থাকে। সেইসব সমস্যার সমাধান হয়। ছোট সমস্যা চোখ এড়িয়ে যায়। অথচ সংসারে ছোট সমস্যাগুলিই আসল সমস্যা। যেমন ফরহাদ বেগুন খেতে পারে না। বেগুন খেলেই তার সারা গা চাকা চাকা হয়ে ফুলে ওঠে। শুধু বেগুন না ; বেগুনের তরকারীর ঝোল খেলেও এ রকম হবে। রশীদ সাহেবের অতি পছন্দের তরকারী কচুর লতি। সেই কচুর লতি যদি গরম পানি দিয়ে কয়েকবার ধোয়া না হয় তাহলে রশীদ সাহেবের গলা চুলকায়। কাশি হয়। বারান্দায় ফুলের টবগুলিতে পানি দেবার ব্যাপার আছে। একটা ক্যাকটাসের টব আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন পানি দেয়ার নিয়ম। তিনি শুক্রবার সকালে দিতেন। মিলি কি এইসব মনে করে রেখেছে? বাচ্চা মেয়ে, এত কিছু তার মনে থাকার কথা না। তিনি বাসায় ফিরে যেতে পারলে সব ঠিকঠাক করে ফেলতে পারবেন। ফিরে যেতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

এখন হাসপাতালে এই কেবিনটাকেই তাঁর ঘর বাড়ি বলে মনে হয়। আয়াকে দিয়ে একটা মানিপ্লেন্টের চারা এনে পানির বোতলে রেখেছেন। বোতলটা জানালার কাছে

লোহার শিকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। চারা থেকে শিকড় ছেড়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি নতুন শিকড় দেখতে পান। তাঁর ভাল লাগে। বিকেলে জানালা দিয়ে আলো এসে তেড়ছা করে দেয়ালে পড়ে। সেই আলোও দেখতে ভাল লাগে। গভীর রাতে বারান্দা নিয়ে ট্রলি টেনে নেবার শব্দ, নার্স এবং ইন্টার্নি ডাক্তারদের ব্যস্ত চলাফেরা কানে আসে। এই সব শব্দ তাঁর শুনতে ভাল লাগে। আধো ঘুম আধো জাগরণে মনে হয় — আহা কার আবার কি হল? সকালবেলা আয়ার কাছ থেকে বিস্তারিত শোনেন। হাসপাতালটাকেই এখন তাঁর নিজের ঘর সংসার মনে হয়। এটা বড় ধরনের অলক্ষণ। কোন জায়গাকে ঘর সংসার মনে হলে সেই জায়গায় সংসার হয়ে যায়। এই সত্য পরীক্ষিত সত্য। তিনি ছোটবেলায় তাঁর মামার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। কংশ নদীর তীরে মোহনগঞ্জে তাঁর মামার বাড়ি। দুই মামা, নানা-নানী থাকেন। চার পাঁচদিন মহানন্দে কেটে গেল। একদিন দুপুরে পাড়ার ছোটছোট মেয়েদের সঙ্গে ফুলগুটি খেলছেন। পাঁচটা গুটি দিয়ে খেলা। সুর করে ছড়া পড়তে হয়। তাঁর দান যখন এল তিনি গুটি হাতে নিয়ে ছড়া পড়লেন —

ফুলনা ফুলনা ফুলনা
এক হাতে দুলনা — তেলনা
সুষম সুষম সুষম
আঁটি আঁটি আঁটি
লঙ্গনা লঙ্গনা লঙ্গনা

ছড়া পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে হল — এটাই তাঁর ঘর সংসার। গ্রামের এই বাড়ি, কংশ নদী, বাড়ির পেছনের তেতুল গাছ, সকালবেলা হাঁসের ঝাঁকের পুকুরের দিকে যাত্রা এই সব নিয়েই তাঁর সংসার। হয়েও গেল তাই।

তারা ঢাকা চলে আসবে, রাতের ট্রেন। সন্ধ্যা থেকে গোছগাছ হচ্ছে। তখন তাঁর নানাজান তাঁর মা'কে বললেন — সালমা ছিল বাড়িটা আলো হয়ে ছিল — মেয়েটা আরো কয়েকদিন থাকুক। চিন্তা করিস না, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব। তাঁর মা নিতান্ত অনিচ্ছায় বললেন, আচ্ছা। বেশি দেরি করবেন না বাবা।

'আমি এক সপ্তাহের মধ্যে দিয়ে আসব রে বেটি।'

তিনি থেকে গেলেন। তিন দিনের দিন মা'র মৃত্যু সংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এল। তাঁর আর ঢাকা যাওয়া হল না। নানার বাড়ি থেকে মেট্রিক পাশ করলেন।

তারপর একবার ছোট মামার সঙ্গে বেড়াতে গেলেন — দুর্গাপুর। দিনে দিনে গিয়ে ফিরে আসার কথা। পৌঁছার পর এমন ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। রাস্তাঘাটে পানি জমে গেল। বাস বন্ধ। তাঁরা আটকা পড়ে গেলেন। তিনদিন তিন রাত অপরিচিতি এক ভদ্রলোকের বাড়িতে থাকতে হল। ভদ্রলোক বুড়ো, সাবরেজিস্ট্রার। ঘোরতর ধরনের নামাজি মানুষ। বাড়িতে কঠিন পর্দা প্রথা। মেয়েদের উঁচু গলায় কথা বলার পর্যন্ত নিয়ম নেই। উঁচু গলায় কথা বললে পুরুষ মানুষ শুনে ফেলবে। তাঁর অস্বস্তির সীমা রইল না। বেড়াতে এসে একি বিপদে পড়া গেল। দ্বিতীয় দিনে হঠাৎ করে অস্বস্তি কেটে গেল। সংসারটাকে খুব

আপন মনে হতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির বারান্দায় জলচৌকি পেতে তিনি বসে আছেন। তখনো মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। উঠানে কল কল করছে পানি। ছেলেরা কলাগাছ কেটে — কলাগাছের 'ভোড়া' বানিয়ে উঠোনে নিয়ে এসেছে — তিনি দেখে খুব মজা পাচ্ছেন — এই বাড়ি, বাড়ির মানুষজন, কলাগাছের 'ভোড়া' সবই খুব আপন মনে হচ্ছে, নিজের মনে হচ্ছে। তখন সাবরেজিস্ট্রার নিয়ামত হোসেন মসজিদে নামাজ পড়ার জন্যে ঘর থেকে বের হলেন, তাঁকে দেখে বিরক্ত মুখে বললেন — মা, শোন। সন্ধ্যাবেলা মাথায় কাপড় না দিয়ে বসে আছ। এটা ভাল না। মাথায় কাপড় দাও।

তিনি লজ্জিত হয়ে দ্রুত মাথায় কাপড় দিলেন। সেই রাতেই নিয়ামত হোসেন তাঁর মামাকে ডেকে বললেন — আল্লার ইশারা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। এই যে আপনি অচেনা অজানা একজন মানুষ মেয়েটাকে নিয়ে মহাবিপদে পড়ে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন এটাও আল্লাহ্‌র ইশারা।

তাঁর মামা লজ্জিত মুখে বললেন, জ্বি জ্বি।

নিয়ামত হোসেন বললেন, আপনার ভাগ্নিকে আমাদের সবার খুবই পছন্দ হয়েছে। অতি সুলক্ষণা মেয়ে। আমি লোক মারফত আপনাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছি। খবর যা পেয়েছি তাতেও অতি আনন্দিত হয়েছি। আপনাদের শরাফত ভাল।

তাঁর মামা, কিছু না বুঝেই আবারো বললেন, জ্বি জ্বি।

নিয়ামত হোসেন বললেন — এখন আপনার ভাগ্নির বিষয়ে আমার একটা আব্দার আছে : রাখা না রাখা আপনার ব্যাপার। আমার বড় ছেলের নাম রশীদ। ভাল ছেলে বলে আমার বিশ্বাস। এ বছর বি এ পাশ করেছে। চাকরি বাকরি কিছু পায় নাই। তবে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবে। ছেলে থাকে ময়মনসিংহ। তাকে আসতে খবর পাঠিয়েছি। ছেলেটাকে দেখেন। যদি পছন্দ হয় তাহলে ভাগ্নিকে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেন। আমাদের কোন দাবি নাই। এক হাজার একটাকা কাবিনে বিবাহ হবে। কন্যার নামে আমি দশ একর ধানী জমি রেজিস্ট্রি করে দিব। এখন আপনাদের বিবেচনা।

মামার চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, জ্বি জ্বি। রাতে মামা ভাগ্নি এক ঘরে শুয়েছে। মামা থমথমে এবং চাপা গলায় বললেন, ফাজলামীর জায়গা পায় না। জোর করে বিয়ে দিয়ে দেবে। সালমা তুই কোন চিন্তা করিস না। বাস চালু না হলেও — নৌকা চলাচল শুরু হয়েছে। আমি খোঁজ নিয়েছি। কাল সকালে নৌকা করে চলে যাব। জোর করে মেয়ে রেখে দেয়া — বদমায়েশের বদমায়েশ। মোহনগঞ্জের বাজারে পেলে জুতাপিটা করুম। শালা ধান্ধাবাজ।

সালমা বলল, জোর করে তো বিয়ে করিয়ে ফেলতে চাচ্ছে না। তোমাকে প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাব অপছন্দ হলে তুমি বলবে — 'না।'

'প্রস্তাবই বা দিবে কেন? প্রস্তাব দিতে হলে — মোহনগঞ্জ যাবে — তারপর প্রস্তাব দিবে। বদমায়েশের দল।'

সালমা হাসতে হাসতে বলল — কথায় কথায় তুমি বদমায়েশ বলছ কেন? এত রাগ করছ কেন?

'রাগ করব না। শেষ রাতে বলতে গেলে ঘাড় ধরে ঘুম থেকে তুলে দেয়। ফজরের নামাজ পড়তে হবে। নামাজ পড়ি না পড়ি সেটা আমার ব্যাপার। তুমি জোর করার কে? তাও ঘরে নামাজ পড়লে হবে না — প্যাঁক, কাদা, পানি পার হয়ে তিন মাইল দূরের মসজিদে যেতে হবে। আমি মরে গেলেও এই বাড়িতে তোর বিয়ে দেব না। এইখানে বিয়ে দিলে এরা তোর জীবন শেষ করে দেবে। সকালটা হোক — বিদায় হয়ে যাব। নৌকা না পাওয়া যায় সাঁতরে চলে যাব।

সকালবেলা হোসেন আলি সাহেবের বড় ছেলে, স্যুটকেস হাতে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে উপস্থিত। সালমা ঢেঁকি ঘরের বারান্দায় দাড়িয়ে তাকে প্রথম দেখল। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার চোখ নামিয়ে নিতে পারল না। মুহূর্তের মধ্যে বুক ব্যথা শুরু হল। কোত্থেকে একটা কান্নার দলা গলার কাছে এসে মাছের কাঁটার মত আটকে গেল। সুখের মত ব্যথা বোধ হতে লাগল। তার মনে হল — না থাক, কি মনে হল তা তিনি এখন আর ভাবতে চান না। তাঁর বড়ই অস্বস্তি লাগে। মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি যে কাণ্ডকারখানা করেছেন তা ভাবলে তাঁর লজ্জায় গায়ে কাঁটা দেয়। এ যুগে মেয়েদের নানান সাহসিকতার গল্প তিনি শোনেন। শুনতে শুনতে মনে হয় — তাঁর নিজের সাহসও তো এদের তুলনায় কম ছিল না। বরং অনেক বেশীই ছিল।

মামা তখন স্যুটকেস গুছিয়ে ফেলেছেন। চলে যাবেন। দুর্গাপুর-ধিরাই লঞ্চ সার্ভিস শুরু হয়েছে। দুপুর বেলাতেই লঞ্চ ছাড়বে। হোসেন সাহেবকে বলেছেন — বিয়ের আলাপ তো এভাবে হুট করে হয় না। দিন তারিখ ঠিক করে মোহনগঞ্জ আসেন। কথাবার্তা হবে। কপালে থাকলে বিয়ে হবে। মানুষের ইচ্ছায় তো বিয়ে শাদী হয় না। আল্লাহর ইচ্ছায় হয়।

সালমার মামা যখন চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত তখন একটা কাণ্ড হল। তিনি ভাগ্নিকে বললেন, যাও বাড়ির মেয়ে ছেলে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস। সালমা ইতঃস্তত করে বলল, মামা একটা কথা।

সালমার মামা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, কি কথা?

'ছেলেটাকে আমার পছন্দ হয়েছে?'

'কি বললি।'

সালমা কোন রকম লজ্জা বা সংকোচ না করে আবার বলল — ছেলেটাকে তার পছন্দ হয়েছে।

সালমার মামা হতভম্ব গলায় বললেন, আমার তো মনে হয় এরা তোকে তাবিজ করেছে। অবশ্যই তাবিজ করেছে। না হলে নিজের মুখে কোন মেয়ে এ কথা বলতে পারে। পছন্দ হলে পরে দেখা যাবে। যা, অন্দরের মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আয়।

সালমা অন্দরে গেল। হোসেন আলি সাহেবকে কদমবুসি করল।

হোসেন আলি সাহেব বললেন, তোমাকে মা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এত পছন্দ এই জীবনে কাউকে হয় নাই। যাই হোক, আমি যাতে তোমাকে এই বাড়িতে রেখে দিতে

পারি সেই চেষ্টা করব। প্রস্তাব নিয়ে যাব — বাকি আল্লাহর ইচ্ছা।

সালমা তখন বলল, বেশ স্পষ্ট করে বলল — আমি মামার সঙ্গে যাব না। আমি এই বাড়িতে থাকব।

সেই রাতেই কাজি ডাকিয়ে বিয়ে পড়ানো হল। বাসর রাতে সালমা স্বামীর সঙ্গে যে সব কাণ্ডকারখানা করল এই যুগের অতি আধুনিক অতি সাহসী মেয়েরাও তা করতে লজ্জা পাবে।

বিয়ের পর মামার বাড়ির সঙ্গে তার সব রকম সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। মামাদের ধারণা সালমা পরিবারের মাথা হেঁট করেছে। পরিবারের সম্মান ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে। তার মামারা জানিয়ে দিলেন, সালমা যেন আর কোনদিন মোহনগঞ্জ ফিরে না আসে।

সালমা ফিরে যায়নি। সে তার শ্বশুরের মৃত্যু পর্যন্ত দুর্গাপুরেই ছিল। এখন জীবনের শেষ অংশ কাটাচ্ছে হাসপাতালে। হাসপাতালটাকে ঘরবাড়ি মনে হচ্ছে। এই ঘর বাড়ি ছেড়ে তিনি তাঁর আগের বাড়িতে ফিরে যাবেন তা মনে হয় না।

কবি

সুবর্ণের বর্ষা সংখ্যা বের হয়েছে। প্রচ্ছদে কদম গাছের ছবি। ফটোগ্রাফকে কি কায়দা করেছে, দেখে মনে হয় জলরঙে আঁকা ছবি। আতাহারের মনে হল, লোকজন প্রচ্ছদ দেখেই পত্রিকা কিনে ফেলবে। হু হু করে সুবর্ণ বিক্রি হয়ে যাবে। আতাহার সূচিপত্রে চোখ বুলাল —

আবু কায়সার : রবীন্দ্রনাথের বর্ষা।

বুকের ভেতর আতাহার নিঃশ্বাস চাপল। আবার রবীন্দ্রনাথ? এই বুড়োর হাত থেকে কি নিস্তার নেই?

মনিরুল হাসান : জীবনানন্দের বর্ষাবিদ্বেষ।

জীবনানন্দের বর্ষাবিদ্বেষ ছিল না-কি? হেমন্ত, শীত, এইসব নিয়ে ভদ্রলোকের মাতামাতি আছে — তার মানে এই না যে তাঁর বর্ষা বিদ্বেষ ছিল। বাঙালী ছেলের বর্ষাবিদ্বেষ থাকলে বুঝতে হবে সে অসুস্থ। তার ভাল চিকিৎসা হওয়া দরকার।

বর্ষায় নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ :

বেশ কটি কবিতা আছে। আতাহারের বুক ধ্বক ধ্বক করছে। কখন তার নিজের নামটা পাওয়া যাবে। নাম নেই। আশ্চর্য কাণ্ড তো — নাম থাকবে না কেন? তরুণদের কবিতা কি আলাদা কোন শিরোনামে যাচ্ছে? আতাহার দ্রুত পুরো সূচিপত্রে চোখ বুলাল। তারপর পড়ল আস্তে আস্তে — দ্রুত চোখ বুলালে অনেক সময় চোখ এড়িয়ে যায়। আতাহার বা সাজ্জাদ দু'জনের কারো নামই নেই।

এমন অবশ্যি হতে পারে যে, ভুলে সূচিপত্রে নাম আসেনি। তরুণ কবি, তরুণ গল্পকারদের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ভুল হয়। তাদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। ভেতরে কবিতা ঠিকই ছাপা হয়েছে, শুধু সূচিপত্রে নাম নেই।

আতাহার একটা একটা করে পাতা উল্টাল। না, কবিতা ছাপা হয়নি। গনি সাহেব তাদের ডজ দিয়েছেন। নিউজ স্ট্যান্ডের ছেলেটা বলল, কিনবেন স্যার? আতাহার বলল, টাকা থাকলে কিনতাম। টাকা নেই। পত্রিকা ঘাঁটাঘাঁটি করেছি এই বাবদ তুই বরং একটা টাকা রেখে দে। ছেলেটা রাগী চোখে তাকাল। তবে আতাহারের সঙ্গে অন্য যে ভদ্রলোক গভীর মনযোগে একটার পর একটা খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছেন, তিনি মজা পেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলেন। আতাহারের মনে হল বর্ষার এই সকালটা একজনকে গভীর আনন্দ দানের মাধ্যমে শুরু হল। কবিতা ছাপা না হবার পরেও হয়ত আজকের দিনটা

ভাল যাবে। যদিও তার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় উঠোনের তারে একটা কাক বসে থাকতে দেখা গেছে। কাকযাত্রা অসম্ভব অশুভ।

কাক বলে কা কা
চার পাশ খা খা॥

শিয়ালযাত্রা শুভ। ঢাকা শহরে শিয়াল কোথায় পাওয়া যাবে? গ্রামেই শিয়াল নেই আর ঢাকা শহরে শিয়াল।

শিয়াল বলে হুক্কাহুয়া
তার কাছে জগৎ ভুয়া॥

আজ হচ্ছেটা কি? ব্যর্থ কবি ছড়াকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। মাথার ভেতর একের পর এক ছড়া তৈরি হচ্ছে। আতাহার রিকশা নিয়ে নিল। সে যাবে মুগদাপাড়া। কণার ঠিকানা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। সে থাকে মুগদাপাড়ায় আটার কলের পশ্চিম পাশে। ইউনানী দাওয়াখানার দোতলায়। নম্বর-টম্বর কিছু নেই। খুঁজে বের করতে জীবন বের হয় যাবে। জীবন বের হলে বের হবে। ব্যর্থ কবির জীবন এমন কিছু মূল্যবান নয়।

কণাকে চিড়িয়াখানা দেখানোর জন্যে সময়টা ভাল না। প্যাচপ্যাচে বর্ষা। এখন বৃষ্টি হচ্ছে না, তবে যে কোন সময় বৃষ্টি নামবে। আকাশ ঘন কালো হয়ে আছে। বর্ষায় পশুপাখি দেখতে ভাল লাগার নয়। বর্ষায় দেখতে হয় গাছপালা —। বৃষ্টি নামলে এদের যাবার উপায় নেই — এদের নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে। পশুপাখি চেষ্টা করবে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার। সম্পূর্ণ দু'রকম ব্যাপার।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল, মনে হচ্ছে সেই কণা। কালো রোগা একটা মেয়ে, চোখ দুটি বিষণ্ণ। চোখ বিষণ্ণ নাও হতে পারে। ব্যাপারটা হয়ত তার কল্পনা। মেয়েটি এলোমেলো ভঙ্গিতে হালকা নীল একটা শাড়ি পরেছে। নীল শাড়ি পরা মেয়েদের চোখ বিষণ্ণ দেখায়। শাড়ির ছায়া পড়ে চোখে।। মেয়েটি বলল, কে?

আতাহার বলল, আমাকে চিনবেন না। আমার নাম আতাহার। সাজ্জাদ আমাকে পাঠিয়েছে। ওর সঙ্গে একদিন মাত্র আপনার দেখা হয়েছে। জানি না ওর কথা আপনার মনে আছে কিনা।

কণা উৎফুল্ল গলায় বলল, আরে, সাজ্জাদ ভাইজানের কথা মনে থাকব না? আপনে যে কি বলেন!

'উনি বলেছিলেন, আপনাকে আর আপনার স্বামীকে চিড়িয়াখানা দেখাবেন।'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন।'

'আমাকে পাঠিয়েছেন। বললে আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসি।'

'এখন?'

'আপনাদের অসুবিধা না থাকলে আমি এখনি নিয়ে যাব। চিড়িয়াখানা সকাল ন'টা থেকে খুলে। এখন বাজছে এগারোটা।'

আতাহার লক্ষ্য করল, মেয়েটার চোখে চাপা আনন্দ ঝলমল করছে। আনন্দের চেয়ে কৌতূহল এবং বিস্ময় থাকাটা উচিত ছিল না? কথা নেই বার্তা নেই, একটা লোক চিড়িয়াখানা দেখানোর ব্যবস্থা করছে এতে বিস্মিত হবার কথা, মেয়েটা বিস্মিত হচ্ছে না।

কণা বলল, আমার স্বামীরে একটু জিজ্ঞেস করা লাগবে ও এখন যাবে কিনা।

'জিজ্ঞেস করুন।'

'সে তো ফার্মেসিতে কাজে আছে।'

'আমি শুনেছিলাম ফার্মেসির চাকরি চলে গেছে।'

'একটা গেছে। আরেকটা পেয়েছে। ফার্মেসির কাজ যারা জানে তাদের কাজের অসুবিধা হয় না।'

'উনার ফার্মেসিটা কোথায়?'

'কাছেই রাস্তার মাথায়।'

আতাহার বলল, আপনি কি জিজ্ঞেস করে আসবেন, না আমিই গিয়ে জিজ্ঞেস করব?'

'চলেন দুইজনে মিলে যাই।'

আতাহার মেয়েটির বিশেষত্বগুলি ধরার চেষ্টা করছে। চোখে পড়ার মত বিশেষত্ব থাকতেই হবে। সাজ্জাদের মত ছেলে কোন কারণ ছাড়া হুট করে মেয়েটাকে চিড়িয়াখানা দেখানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তা হয় না। অনেক উদ্ভট উদ্ভট কাণ্ড সে করে, তবে তার প্রতিটি উদ্ভট কাণ্ডের পেছনে ভাল লজিক থাকে। এই মেয়েটির ক্ষেত্রেও আছে, তবে তা আতাহারের চোখে ধরা পড়ছে না। কণাকে আর দশটা সাধারণ মেয়ের মতই লাগছে। তবে কথাবার্তা বলছে সহজ ভঙ্গিতে। অচেনা পুরুষের সঙ্গে কথা বলার আড়ষ্টতা তার মধ্যে নেই। না থাকারই কথা। যে শিল্পীর সামনে মডেল হয়ে পোজ দেয় সে অচেনা পুরুষের সামনে লজ্জায় জড়সড় হবে না, এটাই স্বাভাবিক।

কণার স্বামী থলথলে ধরনের বেঁটে একজন মানুষ। কয়েক রাত ঘুম না হলে চোখে যে ঘোর ঘোর ভাব চলে আসে তার চোখেও তাই চলে এসেছে। মনে হচ্ছে সুযোগ-সুবিধা মত অষুধ বিক্রি করতে করতে সে খানিকটা ঘুমিয়ে নেবে। চিড়িয়াখানায় যাবার প্রস্তাবে সে বিস্মিত হল না। হাই তুলতে তুলতে বলল, কাজকর্ম ফেলে চিড়িয়াখানা কি? ছুটির দিনে আসেন। শুক্রবার দোকান একবেলা ছুটি থাকে। শুক্রবার সকালে আসেন্।

আতাহার অত্যন্ত আনন্দিত হবার ভঙ্গিতে হেসে বলল, জ্বি আচ্ছা।

'এই শুক্রবার না, তার পরের শুক্রবারে আসেন। এই শুক্রবারে কাজ আছে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

কণা-সমস্যার সমাধান হবার পর আতাহার স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মানুষ

খোঁজার ঝামেলা থেকে আপাতত মুক্তি পাওয়া গেছে। সাজ্জাদ জিজ্ঞেস করলে সে এখন বলতে পারবে — কণাকে পাওয়া গেছে। এতে সাজ্জাদের আগ্রহও খানিকটা কমে যাবার কথা। পাওয়া না গেলেই আগ্রহ বাড়তে থাকে — একবার পাওয়া গেলে আগ্রহ কমে যায়।

মডার্ন ফার্মেসি থেকে বের হয়েই আতাহার কণার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তাহলে যাই।

কণা হাসিমুখে বলল, জ্বি আচ্ছা।

'এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার গাড়ি নিয়ে চলে আসব।'

'ইনশাল্লাহ্ বলেন। ইনশাল্লাহ না বললে একটা বেড়াছেড়া হয়।'

'ইনশাল্লাহ।'

কণা বলল, আমি একটা পান খাব। মিষ্টি পান। রাস্তার মোড়ে পান সিগারেটের দোকান।

আতাহার কণাকে মিষ্টি পান কিনে দিল। এবং মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হল মেয়েটি স্মার্ট। আতাহার বলল, আমি আমার বাড়ির ঠিকানা তোমাকে লিখে দিয়ে যাচ্ছি। যদি তোমরা অন্য কোথাও চলে যাও আমাকে জানিও।

কণা হাসিমুখে বলল, জ্বি আচ্ছা। বলেই সে ঠোঁট গোল করে ফুটপাতে লাল পানের পিক ফেলল। আগের চেয়ে অনেক বেশি হাসিখুশি গলায় সে বলল, ভাইজান, প্রথম আপনি আমারে আপনে কইরা বলতেছিলেন। এখন তুমি বলতেছেন। করণটা কি?

আতাহার হকচকিয়ে গেল। কারণ, কেন সে তুমি বলা শুরু করেছে সে নিজেও জানে না। কণা হাসছে। আতাহারের হকচকানোয় মনে হয় সে খুব মজা পাচ্ছে। কণা আবারো রাস্তায় পিচ করে পিক ফেলল। অতাহারের মনে হল, মেয়েদের পান খেয়ে রাস্তায় পিক ফেলার দৃশ্যটাও তো সুন্দর। খুব সুন্দর। আমরা কখনো তুচ্ছ ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করি না। বিভূতিভূষণ কিংবা মাণিকবাবু কি তাঁদের কোন গ্রন্থে লিখে গেছেন, জগতের সুন্দরতম দৃশ্যের একটি হচ্ছে রাস্তায় মেয়েদের পানের পিক ফেলা?

'কণা, আমি যাই?'

'কই যাইবেন?'

'যাবার অনেক জায়গা আছে। কোন এক জায়গায় চলে যাব।'

আতাহার বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগুচ্ছে। তার পেছনে পেছনে আসছে কণা। সে মনে হচ্ছে তাকে বাস পর্যন্ত এগিয়ে দেবে। বাস না, শেষ পর্যন্ত আতাহার একটা রিকশা নিল। দিনটা মেঘলা। মেঘলা দিনে ভালবাসার বাস বের হয়। কাজেই বাসের গাদাগাদি ভিড়ে এবং মানুষের গায়ের বিষাক্ত ঘামের গন্ধে দিনটা নষ্ট করা ঠিক না। রিকশাওয়ালা বলল, কই যাইবেন? আতাহার বলল, চল না দেখি। রিকশা চলছে — কণা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা দিনের রিকশাযাত্রায় কণার মত একটি মেয়ে পাশে থাকলে কেমন হত? দু'জনে মিলে আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যেত। এখন পর্যন্ত আতাহার কোন তরুণীকে পাশে বসিয়ে আকাশ দেখেনি।

ময়না ভাই আতাহারকে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, তোকে বলেছিলাম না আঠারো তারিখ টাকা নিয়ে আসতে? এসেছিলি?

'না।'

'না কেন?'

'টাকার জোগাড় করতে পারিনি।'

'সামান্য দুই লাখ টাকা জোগাড় হল না?'

'দুই লাখ টাকা সামান্য না। আমার কাছে না।'

'টাকা জোগাড় করতে পারবি না আগে বললি না কেন?'

'আগে ভেবেছিলাম পারব। বড় আপার ফ্ল্যাট বিক্রি হবে, সেখান থেকে ধার নেব। ফ্ল্যাট এখনো বিক্রি হয়নি।'

'তোর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমন কেউ ছিল না যে টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পারে?'

'সাজ্জাদ দিতে পারত . . . কিন্তু . . .

'কিন্তু কি?'

আতাহার হাসল। ময়না ভাই রাগী গলায় বললেন, হাসবি না। খবর্দার, হাসবি না। তোর হাসি দেখে আমার মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে। তোকে আমি স্নেহ করি। আমি তোর একটা উপকার করতে চেয়েছিলাম। টাকা জোগাড় হচ্ছিল না — আমাকে তো এসে বলবি। একটা কিছু ব্যবস্থা করতাম।

'জাপানের ভিসা কি হয়েছে?'

'অবশ্যই হয়েছে। ময়না মিয়া কাচা কাজ করে না। সাতটা ছেলের গতি করে দিয়েছি, শুধু তোর কিছু করতে পারলাম না। আফসোস! বড়ই আফসোস! চা-নাশতা কিছু খাবি?'

'পানি খাব।'

'পানি তো খাবি। তুই কপাল করে এসেছিস পানি খাবার। আমি খুব কম মানুষকে স্নেহ করি। তুই সেই কম মানুষগুলির একজন। সিনসিয়ারলি তোর একটা উপকার করতে চেয়েছিলাম . . . ।'

ময়না ভাই বিরক্ত মুখে সিগারেট ধরালেন। আতাহার পানির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ময়না ভাই নিউ মুভিজ অফিসের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। বসার ভঙ্গি আগের মত। টেবিলের উপর পা তোলা। তাঁর পায়ে লাল মোজা। মোজা এক জায়গায় ছেঁড়া। সেই ছেঁড়া দিয়ে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল বের হোয়ে আছে। ময়না ভাই সেই আঙুল আবার একটু পর পর নাড়াচ্ছেন।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'ছবিতে অভিনয় করবি?'

'ছবিতে অভিনয়?'

'হ্যাঁ। করলে বল, ব্যবস্থা করে দেই। তোর চেহারা সুন্দর আছে। চোখের এক্সপ্রেশনও ভাল। শুধু দাড়ি-টারি চেঁছে ফেলতে হবে। ডাইরেক্টর মনসুর আলি আমার বন্ধুমানুষ। নতুন নায়ক খুঁজছে। তুই চাইলে তোকে ওর কাছে নিয়ে যেতে পারি। ফার্স্ট ছবি হিট করলে — ধাই ধাই করে উঠে যাবি। নায়িকাদের কোলে হাত রেখে এসি দেয়া ঠাণ্ডা গাড়িতে ঘুরতে পারবি।'

'ছবির নাম কি?'

'ছবির নাম দিয়ে তোর দরকার কি? কমার্শিয়াল ছবির নাম-কাহিনীতে কিছুই যায় আসে না। তোর ইচ্ছা আছে কিনা বল। আমি মনসুর আলিকে বললে ও আমার কথা ফেলবে না। ওর লেজ আমার কাছে বাঁধা। ভেবে দেখ করবি কিনা।'

'করব।'

'গুড। জীবন সম্পর্কে তোর তাহলে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অধিকাংশ সময় তোর বয়েসী যুবকরা হতাশায় ডুবে যায়। ফেনসিডিল খাওয়া শুরু করে। তোর এইসব অভ্যাস নেই তো?'

'না।'

'একসেলেন্ট। যে দেশের তরুণ সমাজ কফ সিরাপ খেয়ে নেশা করে সেই দেশের ভবিষ্যৎ কি? ভবিষ্যৎ হচ্ছে — খক খক করে কাশা। বুঝলি, তোদের সোনার বাংলার ভবিষ্যৎ হচ্ছে খক খক করে কাশা।'

পিওন পানি এনেছে। অফিসে মনে হচ্ছে পানি খাওয়ার গ্লাস নেই। চায়ের কাপে করে পানি এনেছে। এক কাপ পানি খেয়ে আতাহারের তৃষ্ণা বেড়ে গেল। দ্বিতীয় কাপ পানির জন্যে বলতে ইচ্ছা করছে না। পিওনের হাবভাব ভাল না। সে তাকাচ্ছে কঠিন দৃষ্টিতে।

ময়না ভাই চেয়ার থেকে পা নামিয়েছেন। পকেট থেকে নোটবই বের করেছেন। নোটবই ভর্তি দুনিয়ার মানুষের টেলিফোন। মনসুর আলির টেলিফোন নাম্বার বের করতে সময় লাগল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, ম্যানেজার, দেখি মনসুরকে টেলিফোনে ধর। প্রথমে এই নাম্বারটা ট্রাই কর। এখানে না পেলে পেজার লাগাও। তিনি আতাহারের দিকে, তাকিয়ে বললেন, তোর কাজ নেই তো? বোস আরাম করে। যা করার আজকের মধ্যেই করতে হবে। কাল সারাদিন ব্যস্ত থাকব। পরশু যাচ্ছি জাপান।

আতাহার ধৈর্য ধরে বসে রইল। ময়না ভাই অনেক চেষ্টা করেও মনসুর আলিকে ধরতে পারলেন না।

বর্ষা মনে হয় এ বছর আগে আগে চলে এসেছে। দুপুর থেকে ঝুম বৃষ্টি। এ রকম বৃষ্টিকেই ইংরেজিতে হয়ত বলে ক্যাটস এন্ড ডগস। তবে আজ বৃষ্টি যা নেমেছে তাকে ক্যাটস এন্ড ডগস বলা ঠিক হবে না। একে বলা উচিত হর্স এন্ড এলিফেন্ট।

এ রকম বৃষ্টি দেখতে হলে হয় বৃষ্টিতে ভিজতে হয় কিংবা নিজের ঘরের বিছানায় কাঁথামুড়ি দিয়ে বসে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। মাঝামাঝি কোন পথ নেই। আতাহার তার বাসার খুব কাছাকাছি আছে। হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট লাগবে। বৃষ্টিতে হেঁটে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তাকে যেতে হবে দৌড়ে — দু'মিনিটের বেশি লাগবে না। কেন জানি যেতে ইচ্ছা করছে না। সে 'মমতা' ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বসে আছে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে একগাদা মানুষ। এরা বৃষ্টি দেখে দোকানে আশ্রয় নিয়েছে। তারা বৃষ্টি দেখছে ভয়াবহ বিতৃষ্ণা নিয়ে।

আতাহার মমতা জেনারেল স্টোরের মালিকের ভাগ্নেকে বলল (সে এই স্টোরের ক্যাশিয়ার। আতাহারের সঙ্গে তার ভাল খাতির আছে। শুধু যখন আতাহার টেলিফোন করতে চায় তখন তার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে যায়), মোবারক, একটা টেলিফোন করব।

মোবারক বিরক্ত মুখে টেলিফোন সেট বের করল। টেলিফোনের তালা খোলার চাবি বের করল।

আতাহার ঢাকা শহরে মাত্র একজনের টেলিফোন নাম্বারই জানে, সাজ্জাদের নাম্বার। এই নাম্বারে আতাহার পারতপক্ষে টেলিফোন করে না। কারণ টেলিফোনটা হোসেন সাহেবের ঘরে। রিং বাজামাত্রই তিনি টেলিফোন ধরেন এবং অতি মধুর গলায় বলেন, হ্যালো। কে কথা বলছেন? কথা যিনিই বলুন তিনি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে টেলিফোন ছাড়েন না। আতাহার এখন আর রিস্ক নেয় না। হোসেন সাহেবের গলা শোনামাত্র খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখে। আজও সে ধরেই নিয়েছিল হোসেন সাহেব টেলিফোন ধরবেন। তাকে বিস্মিত করে দিয়ে টেলিফোন ধরল নীতু। আতাহার খুশি খুশি গলায় বলল, তোদের ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে নাকি রে নীতু?

নীতু বলল, হচ্ছে।

'এ রকম শুকনো গলায় 'হচ্ছে' বললি কেন? তোর গলা শুনে মনে হচ্ছে বৃষ্টি হওয়াটা খুব খারাপ। গলায় আনন্দ নেই কেন?'

'আমি তো আর ব্যাঙ না যে বৃষ্টি হলেই আনন্দে লাফাব।'

'গলার স্বরটা তো ব্যাঙের মতই লাগছে। সর্দি বাঁধিয়েছিস?'

নীতু কঠিন গলায় বলল, আপনি কি ভাইয়ার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ।'

'ধরে থাকুন, ভাইয়াকে দিচ্ছি।'

'এ রকম বৃষ্টিতে সে ঘরে বসে আছে? বৃষ্টিতে ভিজছে না? আশ্চর্য তো।'

'ভাইয়া ছাদে। তার চিলেকোঠার ঘরে। তাকে খবর দিয়ে আসতে একটু দেরি হবে। আপনি ধরে থাকুন।'

'তুই যা, খবর দে। আমি ধরে আছি। আমার কোন কাজকর্ম নেই। প্রয়োজনে আমি অনন্তকাল টেলিফোন ধরে বসে থাকতে পারি।'

আতাহারকে বেশিক্ষণ বসে থাকতে হল না। সাজ্জাদ এসে টেলিফোন ধরে বিরক্ত গলায় বলল, তোকে কতবার বলেছি কখনো আমাকে টেলিফোন করবি না। টেলিফোনে

কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। চট করে বল কি ব্যাপার?'

'কণার ঠিকানা জোগাড় করেছি। এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার তাকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে যাব।'

'আর কিছু বলবি?'

'সুবর্ণ বের হয়েছে।'

'তোর কবিতা ছাপা হয়নি?'

'না।'

'গু-চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। গু-চিকিৎসা ছাড়া কাজ হবে না। মেথরপট্টিতে গিয়ে আমি ব্যবস্থা করব। তুই কি আর কিছু বলবি?'

'না।'

'কণা মেয়েটিকে কেমন দেখলি?'

'চমৎকার। বুঝতে পারছি না কি জন্যে চমৎকার লাগল। পান খেয়ে রাস্তায় পিক ফেলছিল — এই দৃশ্য দেখে হঠাৎ মনে হল মেয়েটা চমৎকার।

'তুই ঠিকই ধরেছিস। মেয়েটার মধ্যে সহজ একটা ব্যাপার আছে। জলের মত সহজ। এ হল সহজিয়া নারীগোত্রের একজন। সচরাচর দেখা যায় না বলেই তোর ভাল লাগছে। যাই হোক, আমি এখন আর কথা বলব না। ছাদে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজব। নে, তুই বাবার সঙ্গে কথা বল। বাবা তোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।'

আতাহার টেলিফোন রিসিভার হাতে নিয়ে আতংকে প্রায় জমে গেল। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তাঁর ছোটখাট কোন স্ট্রোকের মত হচ্ছে।

'কে, আতাহার?'

'জ্বি চাচা?'

'তুমি কেমন আছ?'

'জ্বি, ভাল আছি।'

'অনেক দিন তোমাকে দেখি না।'

'পরশু দিনই আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে। দুই ঘণ্টার মত কথা হল। খুনের মামলা নিয়ে কথা বলছিলেন।'

'ও হ্যাঁ, জামশেদ ভার্সাস স্টেট। অসাধারণ একটা মামলা। আইনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।'

'জ্বি জ্বি।'

'আতাহার, তুমি কি আগামীকাল কিংবা পরশু একটু আসতে পারবে?'

'কেন বলুন তো চাচা?'

'সাজ্জাদ এত বড় একটা চাকরি পেয়েছে সেলিব্রেট করবো বলে ভাবছি। কোন একটা ভাল হোটেলে গিয়ে সামান্য খাওয়া-দাওয়া . . . '

'সাজ্জাদ চাকরি পেয়েছে নাকি?'

'তুমি জান না?'

'জ্বি না।'

'তুমি হচ্ছ তার বেস্ট ফ্রেন্ড, আর তুমি জান না? আশ্চর্য! অবশ্যি আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর স্বভাবটি এই রকম। আমিই কিছু জানতাম না। বিদ্যুৎ এবং জ্বালানীমন্ত্রী টেলিফোন করায় জানলাম। সাজ্জাদ অবশ্যি একমাস আগেই এপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়েছে। চাকরিতে জয়েনও করেনি, আমাকেও কিছু জানায়নি।'

'এখন কি চাকরিতে জয়েন করবে?'

'করবে তো বটেই। না করে পথ কি? কিছু একটা করে তো খেতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজা আর জোছনা গায়ে মেখে বেড়ালে তো হবে না — তাই না?'

'জ্বি, তা তো বটেই।'

'সাজ্জাদ–নীতু দু'জনের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। শরীরের অবস্থা তো ভাল না। হার্টের উপর দিয়ে একটা ঝড় গিয়েছে। দ্বিতীয়বার সামলাতে পারব বলে মনে হয় না। ঠিক বলছি না?'

'জ্বি।'

'সাজ্জাদের তো একটা গতি হল। বাকি আছে নীতু। ওর বিয়ের কথাবার্তা চালাচ্ছি।'

'বাচ্চা মেয়ে, এখনি কিসের বিয়ে?'

'বাচ্চা কোথায়? এই ডিসেম্বরে কুড়ি হবে। নীতুর মা'কে আমি যখন বিয়ে করি তখন নীতুর মা'র বয়স ছিল বিলো সেভেনটিন।'

'দিন বদলাচ্ছে।'

'এই তো আতাহার তুমি ভুল বললে। দিন ঠিকই আছে, মানুষ বদলাচ্ছে। সেই বদলানোটা কি ঠিক তা বিচারের সময় এসে গেছে। নীতু কিছুতেই বিয়েতে রাজি না — এইসব যুক্তি দিয়ে তাকে বুঝিয়েছি।'

'এখন কি সে রাজি?'

'তাই তো মনে হয়। একটা ছেলে পাওয়া গেছে। আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ছেলে ভাল, সারাজীবন ফার্স্ট–সেকেন্ড হয়েছে। দরিদ্র ফ্যামিলির ছেলে, টাকাপয়সার লোভে রাজি হয়েছে বলে আমার ধরাণা — নীতু দেখতে তো আবার তেমন ইয়ে না। আমার মত হয়েছে। ওর মা'র মত হলে কোন চিন্তা ছিল না। নীতুর মা'র চেহারা পেয়েছে সাজ্জাদ।'

রিসিভার ধরে রাখতে রাখতে আতাহারের হাত ব্যথা করছে। এ কি যন্ত্রণার মধ্যে পড়া গেল — টেলিফোনের এই দীর্ঘ কথাবার্তা মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে চলবে। শেষ বিচারের আগে ইস্রাফিল যখন শিঙ্গা ফুঁকবে তখনই শুধু হোসেন সাহেব বলবেন, আতাহার, একটু ধর তো কে যেন বিকট শব্দে বাঁশি বাজাচ্ছে — ব্যাপারটা কি দেখে আসি।

কবি

একজন মানুষের নানা রকম পরিচয় থাকে।

রশীদ আলি সাহেবের ব্যাপারে এটা খুবই সত্যি। ঘরে তিনি এক মানুষ, বাইরে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। অতি ভদ্র, অতি বিনয়ী। কেউ তাঁকে উঁচু গলায় একটা কথা বলতেও শুনেনি। একবার ফার্মগেটের সামনে এক রিকশাওয়ালা তাঁর পায়ে রিকশার চাকা তুলে দিল। তিনি প্রচণ্ড ব্যথায় রাস্তার উপরই বসে পড়লেন। রিকশাওয়ালাকে কিছু বললেন না, শুধু আহত চোখে একবার তাকালেন। "চাচামিয়া কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলে তাঁর চারপাশে লোক জমে গেল। তিনি বহু কষ্টে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "কিছু হয় নাই।"

সেই রশীদ আলিকে আজ তাঁর বাড়িওয়ালা কাটা কাটা কিছু কথা শুনিয়ে দিল। তিনি মাথা নিচু করে শুনে গেলেন। তিনি রাগ করছেন বা মনে কষ্ট পাচ্ছেন এটা তাঁর চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। আলাপ-আলোচনার শেষ পর্যায়ে রশীদ আলি হাসিমুখে বললেন, ভাই সাহেব, আজ তাহলে উঠি।

রশীদ আলির বাড়িওয়ালা মুসলেম উদ্দিনের নানান রকম ব্যবসা। তার মধ্যে প্রধান ব্যবসা ঘুপসি ধরনের ফ্ল্যাট বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেয়া। ভাড়া তুলনামুলকভাবে সস্তা। তবে মাসের পাঁচ তারিখের ভিতর ভাড়া দিতে হয়। দুই তারিখে একবার ভাড়াটেদের কাছে ম্যানেজার যায় — আরেকবার যায় পাঁচ তারিখে। যারা ভাড়া দিতে পারে না তাদের অতি অবশ্যই উঠে যেতে হয় তার পরের মাসে। ভাড়াটে ওঠানো মুসলেম উদ্দিনের কাছে কোন ব্যাপারই না। তাঁর পোষা কিছু পাড়ার ছেলে আছে। প্রতি মাসে তিনি এদের সামান্য খরচ দেন। কাজ থাকুক না থাকুক, এই খরচ তারা দীর্ঘদন ধরেই পাচ্ছে। ভবিষ্যতেও পাবে।

রশীদ আলি সাহেবের বিল্ডিংয়েই বাড়িওয়ালা থাকেন। তিনতলার দু'টা ফ্ল্যাটে তাঁর সংসার ছড়ানো। সকাল বেলা তিনি ম্যানেজার পাঠিয়ে রশীদ আলিকে ডেকে পাঠালেন। প্রাথমিক কথাবার্তা লোকে ভদ্রভাবে বলে থাকে। তিনি ভদ্রতার ধরা দিয়েও গেলেন না। হুংকার দিয়ে বললেন,— আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো?

রশীদ আলি বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

'বাড়ির ভেতর ইস্কুল খুলে বসেছেন। দফায় দফায় মেয়েরা আসছে, যাচ্ছে। যাকে বলে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি।'

'কয়েকটা মেয়েকে প্রাইভেট পড়াই — এ তো নতুন না। অনেক দিন থেকেই

পড়াচ্ছি।'

'অনেকদিন ধরে সহ্য করেছি। আপনাকে কিছু বলিনি। আজ বললাম। এইসব চলবে না।'

রশীদ আলি বললেন, অসুবিধাটা কি?

'অনেক অসুবিধা। এটা রেসিডেনশিয়াল এলাকা, এটা মেয়েদের স্কুল না। শিক্ষা নিয়ে আপনি ব্যবসা শুরু করেছেন — খুব ভাল কথা, ব্যবসা করবেন। সবাই করছে, আপনি করবেন না কেন? তবে আমার এখানে না। আমি নির্বিরোধী লোক, আমি নিরিবিলি পছন্দ করি। মেয়েদের চ্যাঁ–চুঁ আমার পছন্দ না।'

রশীদ আলি বললেন, জ্বি আচ্ছা।

'এই মাসটা আপনি থাকেন, সামনের মাসে আপনি আমার বাড়ি ছেড়ে দেবেন। আমি ঠিক করেছি এখানকার এই ফ্ল্যাট আমি ভাড়া দেব না। নিজে থাকব।'

রশীদ আলি বললেন, জ্বি আচ্ছা। ভাই সাহেব, আজ তাহলে উঠি?

রশীদ আলি শান্ত মুখে নিজের ফ্ল্যাটে এলেন। ততক্ষণে পত্রিকা এসে গেছে। তিনি পত্রিকা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন। আজ শুক্রবার, মেয়েরা কেউ পড়তে আসবে না। ঢিলাঢালাভাবে দিন শুরু করা যায়। কিন্তু তিনি আজ তা পারবেন না। আজই বরং তাঁর কাজের চাপ অনেক বেশি। স্ত্রীকে দেখতে হাসপাতালে যেতে হবে, বাজার করতে হবে, ভাড়ার জন্যে নতুন বাড়ি দেখতে হবে। মোসলেম উদ্দিন সাহেবের এই ফ্ল্যাট বাড়িটা তাঁর পছন্দ ছিল। একতলায় থাকেন বলে বাড়তি অনেকখানি জায়গা পেয়েছেন। সমস্যা একটাই — প্রবল বর্ষণের সময় পানি উঠে। তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন এবারের বর্ষা শুরুর আগে আগে বাড়ি বদল করবেন। ভেতর থেকে তেমন তাগিদ বোধ করছিলেন না। বাড়িওয়ালার কথার পর সেই তাগিদটা বোধ করছেন। বাড়ি খোঁজার জন্যে ছুটির দিন খুবই ভাল।

স্ত্রীকে দেখার জন্যে আজ হাসপাতালে না গেলেও হয়, তবে আজ তিনি যাবেন। মনিকার চিঠি এসেছে। সেই চিঠি তিনি সামনে থেকে তাঁর স্ত্রীকে পড়াবেন এবং কিছু কঠিন কথা শোনাবেন। কঠিন কথাগুলি মনিকাকে শোনাতে পারলে আরাম হত। সেটা সম্ভব না বলেই মেয়ের মাকে শোনানো। মেয়েদের অপরাধের দায়ভাগ অনেকাংশে মেয়ের মা'দের বহন করতে হয়। ছেলেদের অপরাধের দায়–দায়িত্ব বাবারা কিছুটা বহন করেন। মেয়েদেরটা না।

মনিকা তার মা'কে লিখেছে —

মা,

আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেন। আশা করি সবাইকে নিয়ে ভাল আছেন। গত সোমবার বাবার একটা চিঠি পেয়েছি। বাবা চিঠিতে লিখেছেন তিনি আমাদের ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেই টাকা আপনাদের জামাইয়ের একাউন্টে জমা করেছেন। সতেরো লক্ষ টাকা জমা হয়েছে এই মর্মে ব্যাংকের জমার রশিদ বইয়ের ফটোকপিও পাঠিয়েছেন। যাই হোক, মা এখন একটা কথা — রিয়েল এস্টেটের দাম ঢাকায় হু

হু করে বাড়ছে। আমাদের বেলায় কমে গেল কেন? আপনার জামাইয়ের এক বন্ধু কুড়ি লাখ টাকায় এপার্টমেন্ট কিনে এক বছর পর ২৩ লাখ টাকায় বিক্রি করেছে। আমরা আঠারো লাখ টাকয়ায় কিনে সতেরো লাখে বিক্রি করলাম। মা, এর মানে কি? আপনার জামাই সন্দেহপ্রবণ মানুষ। সে নানান কথা বলাবলি করছে। আমি তার সব কথা উড়িয়েও দিতে পারছি না। আমি খুবই মনোকষ্টে আছি। মা, তুমি বাবাকে বলবে, কেন কম দামে ফ্ল্যাট বিক্রি করতে হল তা যেন বাবা চিঠি লিখে বিস্তারিত জানান। যার কাছে ফ্ল্যাট বিক্রি হল তার ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার আপনার জামাই গোপনে জোগাড় করার চেষ্টা করছে। তার এক চাচাতো ভাই থাকে নারায়ণগঞ্জে। তাকে সে বলেছে যেন সে গোপনে খোঁজ নিয়ে বের করে আসলে ভদ্রলোক বাবাকে ঠিক কত টাকা দিয়েছে। মা, চিন্তা কর কি লজ্জার কথা। আমি খুবই শংকিত, যদি শেষ পর্যন্ত জানা যায় যে ভদ্রলোক আসলে ১৭ লাখের বেশি টাকা দিয়েছেন। যদি এ রকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে যেন আপনাদের জামাই আসল খবর না জানে। এইসব খবর লিখতেও আমার লজ্জা লাগছে। না লিখেও পারছি না।

এদিকে সমস্যার উপর সমস্যা — তোমার নাতনী ফারজানা আলাদা এক রুমের একটা বাসা ভাড়া নিয়ে ঐ দৈত্যটার সঙ্গে বাস করছে। রাতে আমার ঘুম হয় না মা। গাদা গাদা ঘুমের ট্যাবলেট খাই, তারপরেও সারারাত জেগে বসে থাকি।

তোমার অসুখের কি অবস্থা কিছুই জানি না। শুনেছি, দেশে চিকিৎসার অবস্থা খুব খারাপ। বাবা কেন তোমাকে নিয়ে সিঙ্গাপুর কিংবা ব্যাংকক যাচ্ছে না? আমি বাবাকে এই ব্যাপারে খুব কড়া করে একটা চিঠি লিখব।

ইতি
তোমার মনিকা

যে মেয়ে এ জাতীয় চিঠি লিখতে পারে তার মাকে কঠিন কঠিন কথা শোনানো যায়। অসুস্থ হলেও শোনানো যায়।

রশীদ আলি তার স্ত্রীকে কিছু শোনাতে পারলেন না। হাসাপাতালে গিয়ে শুনলেন তাকে ডায়ালাইসিসের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দু' থেকে তিন ঘণ্টা লাগবে ডায়ালাইসিস শেষ হতে। এতক্ষণ অপেক্ষা করার মত সময় তাঁর হাতে নেই। তিনি মতির মা'র হাতে মনিকার চিঠি দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হলেন।

ন'টা বাজে। কাচা বাজার এখনো জমেনি। তিনি নাপিতের দোকানে চুল কাটাতে ঢুকলেন। সালমা অভিযোগ করছিল চুল বড় হয়েছে।

আসলেই চুল লম্বা হয়েছে। ঘাড়ের কাছে কুটকুট করছে। সালমা মনে না করিয়ে দিলে আরো কিছুদিন এই লম্বা চুল নিয়েই ঘুরতেন। একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর মনে করিয়ে দেবার জন্যে একজনকে লাগে।

চুল কাটতে গিয়ে নাপিতের সঙ্গে তাঁর কিছু সমস্যা হল। দোষ নাপিতের না, তাঁর। নাপিত জানতে চাইল — চুলে কলপ দেয়া হবে কি–না। তিনি রাগী গলায় বললেন, কলপ দেয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন? আমি বুড়ো হয়েছি — হয়েছি। চুলে কলপ দিয়ে জোয়ান হব কেন?

নাপিত বলল, অনেকেই দেয় এই জন্যে জিজ্ঞাস করলাম।

'অনেকেই দেয় বলে আমিও দেব?'

'না দিলে না দিবেন। চেতেন ক্যান?'

শুটকা নাপিতটাকে একটা চড় দিয়ে শুইয়ে ফেলার জন্যে তাঁর হাত নিশপিশ করতে লাগল। এটাও খারাপ লক্ষণ। নাপিত এমন কোন ভয়ংকর কথা বলেনি যে তাকে চড় দিয়ে শুইয়ে ফেলতে হবে। সে সাধারণ একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে। সাধারণ কথাতেই রাগে শরীর কাঁপছে কেন?

নাপিতের দোকান থেকে তিনি নিউমার্কেটের কাচাবাজারে গেলেন। সাপ্তাহিক বাজার সারবেন। মাছ গোশত বেশি করে কিনে রাখলে ঝামেলা কমত। কিনতে পারছেন না। ফ্রীজের গ্যাস চলে গেছে। দোকানে পাঠিয়ে দেন গ্যাস ভরে দিতে। তিনদিনের ভেতর দেয়ার কথা — আজ আঠারো দিন হল দিচ্ছে না। আঠারো দিনেও যদি দিতে না পরে তাহলে কেন বলল, তিনদিনে দেবে। ফ্রীজের দোকানের ছেলেটাকে লাথি মেরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতে পারলে মনটা শান্ত হত। আজ আর ফ্রীজের দোকানে যাওয়া যাবে না — কাল সকালে একবার যাবেন। ঐ হারামজাদাকে সাপের পা দেখাবেন। হারামজাদা শুওরের বাচ্চা — তিনদিনে ফ্রীজ দেয়া তোর বের করছি।

রশীদ সাহেব নিজেই নিজের রাগ দেখে অবাক হলেন। এই বয়সে এতটা রাগ হওয়া ঠিক না। স্ট্রোক হয়ে যাবে। এই বয়সটা শান্ত থাকার বয়স।

নিউমার্কেটে নেমে রিকশা ভাড়া দেয়ার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর মানিব্যাগ নেই। পথে কোথাও পড়ে গেছে। কিংবা পিক পকেট হয়েছে। মানিব্যাগে টাকা ভালই ছিল। বাজার করবেন বলে তিনটা পাঁচশ টাকার নোট নিয়ে বের হয়েছেন। সঙ্গে আরো কিছু ভাংতি টাকা ছিল। বেশি না — কুড়ি পঁচিশ টাকা হবে। তিনি রিকশাওয়ালাকে শান্ত গলায় ম্যানিব্যাগ চুরির কথা বললেন। রিকশাওয়ালা বিরক্ত মুখে তাকিয়ে রইল।

'তুমি আমার সঙ্গে বাসায় চল। ঐখানে টাকা দিয়ে দিব।'

'বাসা কই?'

'মগবাজার ওয়ারল্যাস অফিসের পেছনে।'

'মগবাজারে যামু না।'

'না গেলে ভাড়া দিব কি ভাবে?'

'হেইডা আপনের বিষয়।'

'যা ভাড়া হয় তার থেকে দু'টা টাকা বেশি দিব।'

'ঐ হানে রাস্তাত গ্যাঞ্জাম, যামু না।'

'আমি তো তাহলে ভাড়াটা দিতে পারছি না।'

'যান, ভাড়া লাগব না।'

রিকশাওয়ালা আবার হাই তুলল। তার গা ঘামে ভেজা। প্রায় দু'মাইল রাস্তা সে রশীদ সাহেবকে টেনে এনেছে। ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে বলেই বোধ হয় ঘন ঘন হাই তুলছে। রশীদ সাহেবের মনে হল সে যে গ্যাঞ্জামের কারণে মগবাজার যেতে চাচ্ছে না — তা না, তার আসলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দরকার। সে রিকশার সিটে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে, তারপর যাবে।

রশীদ সাহেব দেখলেন তিনি যা ভেবেছেন তাই হয়েছে। রিকশাওয়ালা সীটে উঠে বসেছে। রিকশাওয়ালারা রিকশার সীটে যাত্রীদের মত বসে না। এবং বসেই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ে।

রশীদ সাহেব বললেন, তোমার ঠিকানা কি, থাক কোথায়?

'শংকর।'

'শংকরে কোন জায়গায় থাক? আমি তোমার ভাড়া পাঠিয়ে দেব।'

'তুলা পট্টির পিছে।'

'তুলা পট্টিটা কোথায়?'

'জানি না।'

'নাম কি তোমার?'

'বছির।'

'বছির, আমি তোমাকে ভাড়া পাঠিয়ে দেব। আজকালের মধ্যেই পাঠাব।'

বছির জবাব না দিয়ে বিড়ি ধরাল। তাকে বিড়ি টানতে দেখে রশীদ সাহেবেরও সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করল। সেটাও সম্ভব হচ্ছে না। মানিব্যাগের সঙ্গে সিগারেটের প্যাকেট এবং দেয়াশলাই পিক পকেট হয়েছে। রশীদ সাহেব নিউমার্কেট থেকে হেঁটে মগবাজারের দিকে রওনা হলেন। একটা রিকশা নিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর ইচ্ছা করছে না। সারা পথ তিনি মনে করতে করতে হাঁটলেন —

বছির
তুলাপট্টি
শংকর।
বছির
তুলাপট্টি
শংকর।।

দরজা খুলে দিল কাজের মেয়ে। এই মেয়েটাকে নতুন রাখা হয়েছে। সে কোন কাজই করতে পারে না। দরজা খুলে সে দরজা ধরেই দাঁড়িয়ে আছে। দরজা থেকে না সরলে মানুষ ঢুকবে কি ভাবে? তিনি নীতিগতভাবে কাজের লোকদের সঙ্গে হৈ চৈ চিৎকার করেন না। নিজের মেধা বা বুদ্ধি খাটিয়ে এরা কিছু করে না, কাজেই এদের উপর

রাগ করা অর্থহীন। তবু তিনি রাগ সামলাতে পারছেন না। তাঁর ইচ্ছা করছে কঠিন একটা ধমক দিয়ে মেয়েটার পিলে চমকে দেন। তিনি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ঘরে কে আছে?

ছোট ভাইয়া আছে।

'আর কেউ নাই?'

'মিলি আফা গেছে হাসপাতালে।'

'বড় হাঁদারামটা কোথায়?'

'বড় ভাইজান অখনো ফিরে নাই।'

'দরজা থেকে সরে দাঁড়া। ফরহাদকে ডাক।'

ফরহাদ ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। রশীদ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, কি করছিলি?

'পড়ছিলাম।'

'এত পড়িস না। বেশি পড়লে বিদ্যাসাগর হয়ে যাবি।'

ফরহাদ অস্বস্তি নিয়ে একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছে — আর একবার বসার ঘরের দরজার দিকে তাকাচ্ছে। যেন এক্ষুণি দরজা দিয়ে কেউ ঢুকে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে।

রশীদ সাহেব পুত্রের অস্বস্তি কিছুক্ষণ দেখলেন। তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর রাগটা পড়ে যাবে। পড়ল না। কেন পড়ল না তাতেও তিনি বিস্মিত হলেন। এই বয়সে রাগ মনের উপর চেপে থাকা খুব খারাপ।

'ফরহাদ!'

'জ্বি।'

'এক্ষুণি একটা রিকশা নিয়ে শংকর চলে যা।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'সেখানে তুলাপট্টি বলে একটা জায়গা আছে। এক রিকশাওয়ালা সেখানে থাকে। তাকে খুঁজে বের করবি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তাকে দশটা টাকা দিয়ে আসবি।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রশীদ সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন — তাঁর পুত্র (তাঁর ভাষায়, কনিষ্ঠ হাঁদারাম) দরজা দিয়ে বের হয়ে যাবার উপক্রম করছে। যে রিকশাওয়ালাকে তার খুঁজে বের করার কথা তার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করার সে প্রয়োজন বোধ করেনি। সে যে শংকর যাবে তার ভাড়াও বোধহয় তার কাছে নেই। তিনি একবার ভাবলেন — ছেলেকে ডেকে রিকশাওয়ালার নামটা বলে দেবেন — তারপর মনে হল যা ইচ্ছা করুক। হাঁদারামের শিক্ষা হোক। যখন কাউকে না পেয়ে ফিরে আসবে তখন আবার পাঠানো হবে। তাঁতের মাকুর মত ক্রমাগত ঘোরাফিরা করতে থাকবে।

কাজের মেয়ে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, চা খাইবেন চাচাজান? তিনি বললেন, যা সামনে থেকে।

রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। সন্ধ্যা থেকে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। কিছুক্ষণ আগে এসেছে। ট্র্যান্সফরমার জ্বলে গিয়েছিল। ঠিকঠাক করতে এতক্ষণ লাগল। রশীদ সাহেব গোসল করে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। এটি তাঁর চতুর্থ কাপ চা। তিনি চিন্তায় অস্থির হয়েছেন। যদিও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন না। ফরহাদ সেই যে গিয়েছে এখনো ফেরেনি। তাঁর মন বলছে ছেলেটা এখনো শুকনো মুখে তুলাপট্টিতে ঘোরাঘুরি করছে। রিকশাওয়ালাকে খুঁজে পাচ্ছে না — পাওয়ার কথাও না। বাসায় ফিরে আসার সাহসও পাচ্ছে না। তাঁর উচিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরো সহজ হওয়া। সবাই তাকে যমের মত ভয় করবে এটা কোন কাজের কথা না।

এত রাত পর্যন্ত ছেলেটা বাইরে সেটাও একটা দুঃশ্চিন্তার কথা। শহর আগের মত নেই। মুড়ি মুড়কির মত এখন ড্রাগ পাওয়া যাচ্ছে। ডাষ্টবিনের এক অংশ ভর্তি থাকে ফেনসিডিল নামের কফ সিরাপের বোতলে। এককালের ভদ্র শান্ত ছেলেরা এখন ড্রাগের পয়সা জোটানোর জন্যে আধা পাগলের মত রাস্তায় নামে। যে ভাবেই হোক কিছু টাকা জোগাড় করতে হবে। পার্কের কোন অন্ধকার কোণে গায়ের সার্ট খুলে গোল হয়ে বসতে হবে। ড্রাগ নেয়ার শুরুতে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। গায়ে কাপড় চোপড় থাকলে তখন হাসফাস লাগে।

ফরহাদ এদের খপ্পরে পড়েনিতো? অস্বাভাবিক কিছু না — বরং এদের খপ্পরে পড়াই স্বাভাবিক। বেকুব টাইপের ছেলে — এদের খপ্পরে পড়লে উপায় আছে? টাকা পয়সা না পেয়ে এরাতো মেরেই আধামরা করে ফেলবে।

কাজের মেয়ে ভয়ে ভয়ে বলল, খালুজান ভাত দিব?

তিনি বললেন, দাও। নিজের অস্থিরতা তিনি বাইরে প্রকাশ করবেন না। স্বাভাবিক কাজ কর্ম করে যাবেন। রাত বারটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। বারটার পর যা করার করবেন।

রাত বারোটা বাজল, একটা বাজল, দু'টা বাজল। ফরহাদ বা আতাহার দু'জনের কেউই ফিরল না।

ফরহাদ শংকর যায়নি। ভয় পেয়ে সে ঘর থেকে টাকা ছাড়া বের হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে তার এক বন্ধুর বাড়িতে কাটাল। সন্ধ্যার পর থেকে বাসার কাছেই বনফুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে আছে। বনফুল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিকের সঙ্গে তার মোটামুটি চেনাজানা আছে। মেহমান এলে এখান থেকে মিষ্টি নিমকি কেনা হয়। ফরহাদ ক্ষিধেয় অস্থির হয়ে বাকিতে দু'টা কালোজাম, এক প্লেট দই এবং দেড়খানা নিমকি খেয়েছে। মিষ্টি তার সহ্য হয়না বলেই এরপর থেকে তার শুধু টক ঢেকুর উঠছে। গা গুলাচ্ছে। বারটার সময় মিষ্টির দোকান বন্ধ হয়ে গেলো। সে রাস্তায় হাঁটাহাটি করতে থাকল।

আতাহারের জন্যে অপেক্ষা — আতাহার এলেই এক সঙ্গে বাসায় ফিরবে। দু'জন থাকলে একটা ভরসা। তাছাড়া আতাহার বন্ধ দরজা বাইরে থেকে খোলার একটা কৌশল জানে। পেনসিল কাটা ছুড়ি দরজার ফাঁকদিয়ে ঢুকিয়ে বিশেষ কায়দায় কিক্ষুক্ষণ নাড়াচারা করলেই ছিটকিনি নিচে নেমে আসে।

রাত একটার দিকে ফরহাদ খোঁজ নিয়ে গিয়েছে — সদর দরজা বন্ধ। ভেতরের বাতি নেভানো। অর্থাৎ সবাই ঘুমুচ্ছে।

দরজা ধক্কাধাক্কি করে বাবার ঘুম ভাঙ্গানোর দুঃসাহস তার নেই। তারা একমাত্র ভরসা আতাহার। সে না ফেরা পর্যন্ত তাকে রাস্তায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাটি করতে হবে।

আতাহার রাত দু'টার দিকেই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল —। কাওরান বাজার থেকে রিকশা বা শেয়ারের টেম্পো নেবে এ রকম পরিকল্পনা। মোড়ে সব সময় টেম্পো পাওয়া যায়। ঢাকা শহরে টেম্পোগুলি আশীর্বাদের মত। এক টাকায় অনেক দূর যাওয়া যাচ্ছে, দ্রুত যাওয়া যাচ্ছে এবং সীটে বসে যাওয়া যাচ্ছে। কাওরান বাজার মোড় পর্যন্ত আসার আগেই একটা ঘটনা ঘটল। পুরো শহরের ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। শহর অবশ্যি অন্ধকার হল না। বরং চারদিক আচমকা ঝলমল করে উঠল — আকাশে প্রকাণ্ড রূপার থালার মত চাঁদ উঠেছে। আজ আষাঢ়ি পূর্ণিমা। এই আষাঢ়ি পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন। এই পূর্ণিমা বিশেষ একটা পূর্ণিমা। যে পূর্ণিমায় গৃহত্যাগ করতে হয়। এই পূর্ণিমায় ঘরে ফিরে যাওয়া যায় না। কাজেই সে রওনা হল মীরপুরের দিকে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঢুকে পড়তে হবে। রাত দশটার পর বোটানিক্যাল গার্ডেনের গেট বন্ধ হয়ে যায় — কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ার কৌশল বের করতে হবে। তাও যদি না করা যায় মুনশি নামের একজন দারোয়ান আছে — তাকে ধরতে পারলেও কাজ হবে।

জোছনা একা দেখা যায় না। সঙ্গি লাগে।

সঙ্গিনী পাশে নিয়ে জোছনা দেখতে কেমন লাগে কে জানে। খুব ভাল লাগবে বলে মনে হয় না। মেয়েদের নিজের দিকে নজর খুব বেশি থাকে। প্রকৃতি দেখতে হলে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে দেখতে হয়।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় সাথী নামের একটা মেয়ের সঙ্গে তার মোটামুটি পরিচয় হয়েছিল। তাকে নিয়ে সে কাশফুল দেখতে গিয়েছিল। সাভারে নদীর পাড় ঘেঁসে লক্ষ লক্ষ কাশফুল ফুটেছিল। সাথী কাশফুল দেখে যত না মুগ্ধ তার চেয়েও বেশি বিরক্ত তার শাড়িতে চোরকাঁটা ফুটছে দেখে। সে ঠোঁট সরু করে ক্রমাগত বলতে লাগলো, এ কোথায় নিয়ে এলে বল তো? চোরকাঁটা সূঁচের মত পায়ে লাগছে।

আতাহার বলল, চল কাশবনের ভেতর দিয়ে দৌড়াই।

সাথী বলল, কাশবনের ভেতর দিয়ে শুধু শুধু দৌড়াব কেন?

আতাহার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। সাথী অবশ্যি

তারপরেও কিছুদিন উৎসাহ বজায় রেখেছিল, তারপর কোন শুভক্ষণে লাল শাড়ি পরে এক ইঞ্জিনীয়ার সাহেবকে বিয়ে করে ফেলল। একদিন বিকেলে বিজয় সরণি ধরে সে সেকেন্ড ক্যাপিটেলের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ শুনে — "আতাহার আতাহার !" বলে বিবর্ণ গলায় কে যেন ডাকছে। আতাহার তাকিয়ে দেখে — সাথী। সাথীর পাশে হাওয়াই শার্ট গায়ে এক ভদ্রলোক। সাথীর স্বামী। গাড়ি থামিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ফুচকা খাচ্ছেন। নতুন বিবাহিত স্বামীদের বেশ কিছুদিন স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে ফুচকা চটপটি এইসব খেতে হয়। ভদ্রলোকের সেই স্টেজ চলছে।

আতাহার তাদের দিকে হাসিমুখে এগিয়ে গেল। সাথী বলল, এই, তুমি আমার বিয়েতে আসনি কেন ? আমি নিজে তোমাকে কার্ড দিয়ে এসেছি, তারপরেও এলে না। এর মানে কি ?

আতাহার বলল, উপহার কেনার টাকা জোগাড় হয়নি, তাই যাইনি।

'মিথ্যুক। আসলে তুমি আসনি হিংসায়।'

সাথী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, এই শোন, বিয়ের আগে আতাহার আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হবার মত ভঙ্গি করে বললেন, তাই নাকি ?

সাথী বলল, হ্যাঁ। তারপর একদিন আমাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে সাভারে নিয়ে গেছে কাশফুল দেখাতে।

'তারপর ?'

'কাশফুল দেখলাম। তখন সে বলে, এসো দু'জনে মিলে কাশবনের ভেতর দিয়ে দৌড়াই। আমি বললাম, পাগল হয়েছ ? আমি কাশবনের ভেতর দিয়ে শুধু শুধু দৌড়াব কেন ? সে বলে কি, সৌন্দর্য দেখার জন্যে।'

সাথীর স্বামী হাসতে হাসতে বললেন, সৌন্দর্য-টৌন্দর্য কিছু না। ভদ্রলোকের অন্য পরিকল্পনা ছিল। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। ঠিক না আতাহার সাহেব ?

আতাহার কিছু বলতে পারল না, সাথী হেসে প্রায় ভেঙে পড়ল। ভদ্রলোক মানিব্যাগ থেকে কার্ড বের করে বললেন — ক র্ডটা রাখুন। একদিন এসে আপনার প্রাক্তন বান্ধবীর সংসার দেখে যাবেন।

আতাহার কার্ড রাখল। হাফপ্লেট ফুচকা এবং হাফপ্লেট চটপটি খেল।

ইঞ্জিনীয়ার ঐ ভদ্রলোক কি সাথীকে কখনো জোছনা বা কাশফুল দেখাতে নিয়ে গেছেন ? সাথীদের ঠিকানা লেখা কার্ডটা আতাহারের মানিব্যাগের সাইড পকেটে এখনো আছে। তার বাসায় গিয়ে উপস্থিত হলে কেমন হয় ? সাথীর স্বামীকে সে বলবে, ভাই, আপনার স্ত্রীকে কি ধার দেবেন ? তাকে নিয়ে জোছনা দেখব।

ইলেকট্রিসিটি এখনো আসেনি। শহর এখনো অন্ধকারে ডুবে আছে --- তবে কিছু ফাজিল দোকানদার নিজস্ব জেনারেটার চালু করে দিয়েছে। চার্জার নামের এক বস্তু চালু

হয়েছে — ইলেকট্রিসিটি না থাকলে আপনা আপনি জ্বলে ওঠে।

জেনারেটার এবং চার্জারের আলো সত্ত্বেও দোকানটা মারাত্মক লাগছে। সিদ্ধার্থ ভাল সময়েই গৃহত্যাগ করেছেন। আতাহারের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে, কবিতার লাইন মাথায় আসছে আসছে করেও আসছে না। —

প্রতি পূর্ণিমার মধ্যরাতে একবার আকাশের দিকে তাকাই
গৃহত্যাগি হবার মত জোছনা কি উঠেছে?
বালিকা ভুলানো জোছনা নয়।
যে জোছনায় বালিকারা ছাদের রেলিং ধরে ছুটাছুটি করতে করতে বলবে —
ও মাগো, কি সুন্দর চাঁদ।
নব দম্পতির জোছনাও নয়।
যে জোছনা দেখে স্বামী গাঢ় স্বরে স্ত্রীকে বলবেন —
দেখো দেখো নীতু চাঁদটা তোমার মুখের মতই সুন্দর।
কাজলা দিদির স্যাঁতস্যাতে জোছনা নয়।
যে জোছনা বাসি স্মৃতিপূর্ণ ডাস্টবিন উল্টে দেয় আকাশে।
কবির জোছনা নয়। যে জোছনা দেখে কবি বলবেন —
কি আশ্চর্য রূপার থালার মত চাঁদ।
আমি সিদ্ধার্থের মত গৃহত্যাগী জোছনার জন্যে বসে আছি।
যে জোছনা দেখা মাত্র গৃহের সমস্ত দরজা খুলে যাবে —
ঘরের ভেতর ঢুকে পড়বে বিস্তৃত প্রান্তর।
প্রান্তরে হাঁটব, হাঁটব আর হাঁটব —
পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হয়ে থাকবে মধ্য আকাশে।
চারদিক থেকে বিবিধ কণ্ঠ ডাকবে — আয় আয় আয়।

অল্প কিছুদূর এগুতেই ঝুমবৃষ্টি নেমে গেল। বর্ষাকালে হঠাৎ করে ঝুমবৃষ্টি নামে না। বৃষ্টির বেগ আস্তে আস্তে বাড়ে। হঠাৎ ঝুমবৃষ্টি নামে ভাদ্র মাসে। হুড়মুড় করে খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয় — আবার থেমে যায়। আবহাওয়া উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। গ্রীন হাউজ এফেক্ট। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে লোকজন দৌড়াচ্ছে — আতাহারও দৌড়াচ্ছে। কোন একটা দোকানে ঢুকে পড়তে হবে।

আতাহার দৌড়ে যে দোকানে ঢুকল তার নাম লৌহবিতান। জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ জুলজুল চোখে আতাহারকে দেখছে। তার চোখ কঠিন। ভুরু কুঁচকে আছে। আতাহার বলল, কেমন আছেন বুড়ো মিয়া?

বুড়ো জবাব দিল না। আতাহারের মনে পড়ল এই বুড়োর হাত থেকে সে একটা ছাতা নিয়ে গিয়েছিল। ফেরত দেয়া হয়নি। কোথায় আছে সে ছাতা কে জানে। বর্ষাকালে

লোকজন ঘর থেকে ছাতা বের করে মাথা শুকনা রাখার জন্যে নয়, হারানোর জন্যে। মিলির ব্যাহারি ছাতাটা আজ যেমন সে রেখে এসেছে গনি সাহেবের বাড়িতে। এই ছাতা আর ফেরত পাওয়া যাবে না। জরাগ্রস্ত এই বৃদ্ধের ছাতাও ফেরত পাওয়া যাবে না।

লৌহবিতানের মালিক আবদুল্লাহ্ ঠিক আগের ভঙ্গিতে বসে আছেন। হাতে বই। দূর থেকে মনে হচ্ছে লোকনাথ ডাইরেক্টরি পঞ্জিকা। হোলসেল ব্যবসা যারা করে তারা পঞ্জিকা খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ে। আতাহার হাসিমুখে এগিয়ে গেল। আন্তরিক ভঙ্গিতে বলল, চিনতে পেরেছেন ?

আবদুল্লাহ হাতের বই নামিয়ে বলল, জ্বি।

'আমার নাম কি বলুন তো ?'

'আপনার নাম বলতে পারব না। ঐ দিন আপনি আপনার নাম বলেননি, তবে একজনকে টেলিফোন করছিলেন — তার নাম নীতু।'

'আপনার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।'

'আমার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ না। আমার স্ত্রীর নাম নীতু, এজন্যেই নীতু নামটা আমার মনে আছে। আপনি বসুন — দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? চা খাবেন ?'

'জ্বি খাব।'

আবদুল্লাহ ঘাড় ঘুরিয়ে চায়ের কথা বলল। আতাহার তার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। বাড়িয়ে ধরল। আবদুল্লাহ বলল, আমি সিগারেট খাই না।

আতাহার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, আপনি বলেছিলেন, আবহাওয়ার ব্যাপারে আপনার সিক্সথ সেন্স খুব প্রবল। আগেরবার যখন এসেছিলাম আপনি বলেছিলেন রাত দশটায় বৃষ্টি থামবে — ঐ দিন বৃষ্টি হয়েছে রাত দু'টা পর্যন্ত।

'নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। সম্ভাবনার কথা বলা যায়।'

'ঐ দিন কিন্তু আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েই বলেছিলেন।'

'ভুল করেছিলাম।'

'আমি আপনার ছাতাটা হারিয়ে ফেলেছি।'

'পুরানো একটা ছাতা হারালেও কিছু না।'

চা নিয়ে বুড়ো এসেছে। আজ বুড়োকে অন্যদিনের চেয়েও কাহিল মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে হাঁটতে পারছে না। চায়ের কাপ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। আতাহার এবং আবদুল্লাহ দু'জনই চা শেষ করল নিঃশব্দে। আবদুল্লাহ বলল, বৃষ্টি থেমে গেছে, আপনি ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারেন।

আতাহার বলল, আপনার অসুবিধা না হলে খানিকক্ষণ বসি। গল্প করি।

'বসুন। গল্প করুন। কিছু মনে করবেন না — আপনি কি অভিনয় করেন ? টিভিতে কখনো নাটক-টাটক করেছেন, কিংবা সিনেমায় ?'

আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, না তো। অভিনয় এখনো করিনি, তবে সামান্য সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আমাকে এক ফিল্ম ডাইরেক্টরের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাইরেক্টর সাহেবের নাম মনসুর আলি। উনি একটা ছবি

বানাচ্ছেন — ছবির নাম 'জানি দুশমন'। আমার ঐ ছবিতে নায়কের রোল করার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

'ক্ষীণ বলছেন কেন?'

'ক্ষীণ, কারণ যিনি নায়িকার রোল করবেন তিনি ফিল্ম লাইনের বিখ্যাত এক নায়িকা। তাঁর নাম মৌ। তিনি যদি আমাকে পছন্দ করেন তবেই আমার নায়ক হবার সুযোগ হবে। তাঁর কাছে আমাকে একটা ইন্টারভ্যু দিতে হবে।'

'ইন্টারভ্যুটা কবে?'

'ম্যাডাম মৌ গেছেন নেপালে। ছবির শ্যুটিং হচ্ছে। নেপাল থেকে ফিরলেই উনার সামনে ডাইরেক্টর সাহেব আমাকে নিয়ে যাবেন। আমার প্রধান কাজ হচ্ছে ম্যাডামকে খুশি করা।'

'ম্যাডাম বলছেন কেন?'

'ম্যাডাম বলছি, কারণ নায়িকাদের ম্যাডাম ছাড়া অন্য কিছু বললে তাঁরা খুব রাগ করেন। এই হল সিনেমা লাইনের নিয়ম।'

আবদুল্লাহ হেসে ফেলল। আতাহার মুগ্ধ হয়ে এই হাসি দেখল। কোন পুরুষমানুষ এত সুন্দর করে হাসতে পারে তার জানা ছিল না। এই ক্ষমতা প্রকৃতি অকৃপণ হাতে মেয়েদের দিয়েছে। মেয়েরা কারণে-অকারণে এই ক্ষমতা ব্যবহার করে। মেয়েরা জানে না যে হাসিমুখে পুরুষদের কাছে তারা যদি কিছু চায় — পুরুষদের তা দিতেই হবে। তারা জানে না বলেই — চাইবার সময় চোখের জলে চায়, বা রাগ করে চায়। হাসে না।

আবদুল্লাহ্ বললেন, আপনি কি দেখছেন?

'আপনার হাসি দেখছি। আপনার হাসি যে কত সুন্দর তা কি কেউ আপনাকে কখনো বলেছে?

'হ্যাঁ বলেছে। তবে আমি হাসি খুব কম। অনেক দিন পর আপনার কথা শুনে হাসলাম।'

'আমি অভিনয় করি কি-না তা জিজ্ঞেস করছিলেন কেন? আমার চেহারা কি কোন অভিনেতার মত?'

'আপনার চেহারা কোন অভিনেতার মত কি-না জানি না — কারণ আমি টিভি-সিনেমা দেখি না। আমার স্ত্রী বলছিল।'

'উনি আমাকে দেখলেন কোথায়?'

'আমার এই দোকানেই দেখেছে। ও প্রায়ই দোতলা থেকে নিচে নেমে আসে। পার্টিশানের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে। আপনি যখন প্রথমবার এসেছিলেন তখন সে আপনাকে দেখেছে। আপনি চলে যাবার পরে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'ও আচ্ছা। আজো কি তিনি দেখে গেছেন?'

'হ্যাঁ, আপনি যখন চা খাচ্ছিলেন তখন এসে দেখে গেলো। আমাদের বিয়ের গল্পটা খুবই সুন্দর। একদিন আপনাকে বলব।'

'আজ বলুন। আজ আমার কোন কাজকর্ম নেই।'

'আজ না। আজ আপনি বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমার দোকানে এসেছেন। বৃষ্টি ছাড়া শুকনা খটখটে কোন দিন আপনি আসবেন — আমি গল্পটা আপনাকে বলব। মোটামুটি একটা ভৌতিক প্রেমের গল্প।'

আতাহার উঠে দাঁড়াল। আবদুল্লাহ বলল, আগে যে কার্ডটা দিয়েছিলাম সেটা নিশ্চয় হারিয়ে ফেলেছেন। আরেকটা রাখুন। আমাকে সব সময় টেলিফোনে পাবেন। আমি কখনো এই দোকান এবং দোকানের উপরের আমার বাড়ির বাইরে যাই না। গত পাঁচ বছরে যাইনি।

'পা–নেই মানুষরাও তো বাইরে ঘোরাফিরা করে।'

'আমি করি না।'

আতাহার যখন বের হয়ে এসেছে তখন আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। বৃষ্টিতে নেমেই তার মনে হল, আজো আবদুল্লাহকে সে তার নাম দিয়ে আসেনি। আবদুল্লাহ তার নাম জানে না। সে শুধুই নীতুর নাম জানে।

বৃষ্টি জোরেসোরে নেমেছে। আবার দৌড়ে কোন দোকানঘরে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা করছে না। নতুন কারো সঙ্গে পরিচিত হতে ইচ্ছা করছে না। বরং ইচ্ছা করছে বৃষ্টিতে ভিজতে।

আতাহার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুচ্ছে — তার মজিদের কথা মনে পড়ছে। ভাল বৃষ্টি নামলেই সে একটা ছাতা জোগাড় করতো। সেই ছাতা বগলে রেখে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এগুত। পরিচিত–অপরিচিত অনেকেই জিজ্ঞেস করত, ছাতা বগলে রেখে বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন? মজিদ তার উত্তরে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে বলতো, এটা আমার রোদের ছাতা, বৃষ্টির ছাতা নয়। মজিদের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না।

মজিদকে সে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখেছিল। মজিদ তার উত্তরে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করেছে — টেলিগ্রামে লেখা —

> I am well.
> আমি ভাল আছি।

সেই ভাল থাকাটা কি রকম ভাল থাকা একবার গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসা দরকার। সাজ্জাদকে রাজি করিয়ে কোন এক গভীর রাতে মজিদের নেত্রকোনার বাসায় উপস্থিত হতে হবে। মজিদের জন্যে অবশ্যই উপহার হিসেবে গাঁজা নিয়ে যেতে হবে। গাঁজা–বিষয়ে মজিদের সর্বশ্রেষ্ঠ উক্তি হচ্ছে — সমস্ত জগৎটাই যে ধোঁয়া তা গাঁজার ধোঁয়া মাথায় না গেলে বোঝা যায় না। জগতের অনিত্যতার ব্যাপারটি পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে জানানোর জন্যে সবাইকে খুব ভালমত একবার গাঁজা খাওয়ানো দরকার।

আতাহার হাঁটছে। বৃষ্টিতে সে পুরোপুরি নেয়ে উঠেছে। সে হাঁটছে নির্বিকার ভঙ্গিতে। তাঁর হাঁটার ভেতর কি কোন অস্বাভাবিকতা আছে? লোকজন কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ ব্যাপার না। তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। সে শুধুমাত্র বৃষ্টিতে ভিজেই এই কাজটি করতে পারছে। 'জানি দুশমন' ছবির পরিচালককে বলতে হবে — ভাই, নায়িকারা বৃষ্টিতে ভেজার দৃশ্য

নিশ্চয়ই দু'-তিনটা থাকবে — নায়কদের বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে যাবার দৃশ্য একটা রেখে দেবেন তো? দেখবেন আমি কেটে বের হয়ে যাব।

বৃষ্টিতে ভেজা নিয়ে মজিদের একটা অসাধারণ কছিড়া আছে। কছিড়া হচ্ছে কবিতা + ছড়া? মজিদের ভাষায় কছিড়া হচ্ছে অর্ধেক কবিতা এবং অর্ধেক ছড়া।

আমার বন্ধুর বিয়ে
উপহার বগলে নিয়ে
আমি আর আতাহার,
মৌচাক মোড়ে এসে বাস থেকে নামলাম
দু' সেকেন্ড থামলাম॥
টিপটিপ ঝিপঝিপ
বৃষ্টি কি পড়ছে?
আকাশের অশ্রু ফোটা ফোটা ঝরছে?

আমি আর আতাহার
বলুন কি করি আর?
উপহার বগলে নিয়ে আকাশের অশ্রু
সারা গায়ে মাখলাম॥
হি হি করে হাসলাম॥

কবি

রশীদ আলী সাহেব অসীম ধৈর্যে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। সকালে নাশতা খেয়ে বের হন, ফিরেন দুপুর দু'টা-আড়াইটায়। গোসল করে ভাত খান। ভাত খেয়েই ঘুমুতে যান। তাঁর প্রথম ব্যাচ ছাত্রীরা এসে পড়লে তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়। তিন ব্যাচ পড়ানোর ঝামেলা শেষ করে রাতের খাবার খেয়ে আবার ঘুমুতে যান। ক্লান্তিতে তাঁর শরীর ভেঙে আসে। বিছানায় যাওয়ামাত্রই তাঁর ঘুমিয়ে পড়ার কথা — আশ্চর্যের ব্যাপার, তাঁর ঘুম আসে না। তিনি বিছানায় এপাশ ওপাশ করেন। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে মনে হয়, ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসবে। আবার বিছানায় যাওয়ামাত্র ঘুম চলে যায়। প্রতি রাতেই মনে হয়, কোন একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে ঘুমের অষুধ-টষুধ খাবেন। সারাদিনের ব্যস্ততায় মনে থাকে না। ঘুমের অষুধের কথা যখন মনে হয় তখন ডিসপেনসারি বন্ধ।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি সারাদিন কি করলেন, কার সঙ্গে কথা বললেন তা মনে করার চেষ্টা করেন। এইসব স্মৃতি সুখকর না। অন্য কিছু ভাবলে হয়ত ঘুম আসতো। কোন সুখস্মৃতি নিয়ে চিন্তা করতে পারলে হত। রশীদ আলি সাহেব অনেক চেষ্টা করেও কোন সুখস্মৃতি মাথায় আনতে পারেন না। বার বার মনে হয়, বৃদ্ধ বয়সে তিনি অথই পানিতে পড়েছেন। যখন বয়স ছিল — তখন অথই পানিতে সাঁতরে ভেসে থাকতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জরা তাঁকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। অথই পানিতে সাঁতরাবার মত শক্তি তিনি পাচ্ছেন না।

বাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে তাঁকে নানান ধরনের অপমানের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই বয়সে মিথ্যা কথাও বলতে হচ্ছে। বাড়িওয়ালা যেই শুনে বাড়ি ভাড়ার জন্যে একজন এসেছে তখনই ভুরু কুঁচকে ফেলে এবং চোখ সরু করে ফেলে। পা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কয়েকবার তাকায়। যাচাই করতে চেষ্টা করে ভাড়াটে কেমন। প্রাথমিক যাচাইয়ের পর শুরু হয় প্রশ্নপর্ব —

'কি করেন আপনি ?

রশীদ আলি বিনীতভবে বলেন, মাস্টারি করতাম। সম্প্রতি রিটায়ার করেছি। অবসর জীবনযাপন করছি।

'বাড়ি ভাড়া কে নেবে ?'

'জ্বি, আমি নেব।'

বাড়িওয়ালার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়। তাকে দেখেই বোঝা যায় সে এই মুহূর্তে ভাবছে — রিটায়ার্ড স্কুল-টিচার মাসে চার হাজার টাকা ভাড়া দেবে কি ভাবে ? চক্ষুলজ্জার

জন্যে প্রশ্নটা করতে পারে না। অনেকে চক্ষুলজ্জার ধার ধারে না। সরাসরি জিজ্ঞেস করে —

'রিটায়ার করেছেন, আপনার সোর্স অব ইনকাম কি? বাড়ি ভাড়া দেবেন কি ভাবে?'

'আমি এখনো কিছু কাজকর্ম করি। ছাত্র-ছাত্রী পড়াই।'

'প্রাইভেট টিউশ্যানি'

'জ্বি।'

'ফ্যামিলি মেম্বার কত?'

'আমার দুই ছেলে, দুই মেয়ে এবং স্ত্রী।'

'ছেলেমেয়েরা সব আপনার সঙ্গে থাকে?'

'বড়মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে — বাকি তিনজন আমার সঙ্গে থাকে।'

'ছেলে দু'জন কত বড়?'

এইখানে তাঁকে আবার কিছু মিথ্যা বলতে হয় — বড়ছেলে এম. এ. পাশ করে চাকরি খুঁজছে। এটা বলামাত্রই বাড়িওয়ালা না করে দেয়। কাজেই এইখানে এখন তিনি বলেন — ছেলে ব্যবসা করছে।

'কি ধরনের ব্যবসা?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'ছেলেকে একদিন নিয়ে আসুন। তার সঙ্গে কথা বলি।'

'ছেলেকে আনতে হবে?'

'জ্বি, নিয়ে আসুন। আপনি বুড়ো মানুষ। আপনার সঙ্গে কি কথা বলব? আপনার ছেলের সঙ্গেই কথা বলি। কাল বিকেলে তাকে নিয়ে আসুন।'

রশীদ সাহেব ছেলেকে নিয়ে আসেন না। সামান্য একটা বাড়ি ভাড়ার জন্যে ছেলেমেয়ে সবাইকে এনে কুমীরের বাচ্চার মত দেখাতে হবে? সব বাড়িওয়ালা তাঁকে সন্দেহের চোখে কেন দেখছে তাও তিনি বুঝতে পারেন না। তিনি বুড়ো হয়ে পড়েছেন এই জন্যেই? অক্ষম অপদার্থ হয়ে গেছেন? বুড়োদের সম্মান এবং শ্রদ্ধার চোখে দেখাই নিয়ম। সেই নিয়ম কি পাল্টে গেছে? আজকাল নাপিতের দোকান দেখলেই তাঁর ইচ্ছা করে চুলে কলপ দিতে। সাদা চুলগুলিকে কুচকুচে কালো করে ফেলে সমাজে ফিরে আসার একটা চেষ্টা কি করা যায় না? তাঁর কাল চুল দেখে বাসার সবাই অদ্ভুত চোখে তাকাবে। সালমা বিস্মিত হয়ে বলবে, কি হয়েছে? তোমাকে অন্য রকম লাগছে কেন?

বলুক না। কি যায় আসে?

বাড়ি দেখতে দেখতে হঠাৎ হঠাৎ কোন একটা বাড়ির সামনে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে যান। চোখের সামনে স্বপ্নের মত একটা বাড়ি। মনে হয় কেউ একজন তাঁর জন্যেই এই বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। গত বৃহস্পতিবার এরকম একটা বাড়ি দেখলেন। টিনের একটা একতলা বাড়ি। সামনে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা। চারদিকে ঝোপঝাড়ের মত গাছপালা। বেশ কয়েকটা সুপারিগাছ। বাড়ির উত্তর দিকে একটা চালতা গাছ। কতদিন পরে চালতা গাছ দেখলেন। থোকা থোকা হলুদ ফুল ফুটে আছে। বাড়ির নামটা

কি সুন্দর — 'নিরিবিলি'। দীর্ঘ সময় বাড়ির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির সময় এই বাড়ির ছাদে ঝমঝম শব্দ হবে। এই শব্দের কি কোন তুলনা হয়? বাড়িটার সামনে থেকে যেতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক বের হয়ে কর্কশ গলায় বললেন, কি চাই? তিনি লজ্জিত গলায় বললেন, জ্বি না, কিছু চাই না।

'কিছু চান না, তাহলে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আধাঘন্টা ধরে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করছেন — আর বলেন কিছু চাই না। ব্যাপারটা কি?'

'কিছু না। কিছু না।'

ভদ্রলোক আগুনচোখে তাকিয়ে রইলেন আর তিনি প্রায় মাথা নিচু করে চলে এলেন। হঠাৎ তাঁর শরীরটা ক্লান্ত লাগল। মনে হল পা চলছে না। পথেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন।

তাঁর ধারণা তাঁকে ডায়াবেটিসেও ধরেছে। রাতে খুব ঘন ঘন পানির পিপাসা হয়। তিনি শুনেছেন, ডায়াবেটিস রোগের প্রথম লক্ষণ তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাওয়া, যা তাঁর বেলায় হচ্ছে। একজন ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। টেস্ট-ফেস্ট করানো দরকার। টেস্ট করানো মানেই একগাদা টাকা খরচ। টাকা খরচ করতে তাঁর মায়া লাগে। খুব কষ্ট করে উপার্জন করা টাকা। লটারিতে জিতে পাওয়া টাকা না। ইংরেজি গ্রামার, রচনা, কোশ্চেন-আনসার প্রায় নির্বোধ একদল ছাত্রীকে পাখি পড়ার মত শিখাতে হয়। শিক্ষাদানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন। মাসের শেষে টাকা নিচ্ছেন। যেন মুদি দোকান দিয়েছেন। জিনিশ বিক্রি করে টাকা নিয়ে নেয়া।

কোন কোন ছাত্রী মাস শেষ হবার পরেও টাকা দেয় না। এক ফাঁকে বলে, সামনের মাসে দেব স্যার। এই মাসে বাবার হাত খালি। তিনি মাথা নাড়েন। সেই মাথা নাড়া অর্থহীন মাথা নাড়া। তাঁর কাছে মনে হয় এই মেয়েটি যেন বাকিতে জিনিশ নিচ্ছে।

এ রকম জীবনযাপনের কোন মানে হয়? প্রায় রাতেই তাঁর ইচ্ছা করে পায়জামা-পাঞ্জাবি এবং স্যান্ডেল পায়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়তে। হাঁটতে থাকবেন। হাঁটতেই থাকবেন। মাঝে মাঝে শুধু দিক ঠিক করে নেয়া — দক্ষিণ। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় না এক সময় সমুদ্রের পাড়ে এসে থেমে যাবেন। তাঁর সাতষট্টি বৎসর বয়স হয়েছে। তিনি সমুদ্র দেখেননি। কেউ বললে বিশ্বাস করবে? করবে না। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। যে কোন একদিন বাথরুমে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন। আর ওঠা হবে না। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পারে এসে মরতে পারলে মন্দ হয় না।

রাত তিনটা বাজে। রশীদ আলি তৃতীয়বারের মত বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। কবার তাঁর প্রায় ঘুম এসে গিয়েছিল, গুনগুন শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে। শব্দটা আসছে ফরহাদের ঘর থেকে। গানের মত শব্দ। রাত তিনটায় সে গান গাইবে কেন? এটা কি গান গাওয়ার সময়?

রশীদ আলির মাথার রগ দপ দপ করছে। বমি-বমি ভাবও হচ্ছে। তিনি স্যান্ডেল

পায়ে দিয়ে বারান্দায় এলেন। বারান্দা থেকে ফরহাদের গুনগুন শব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সে গান গাইছে না, পড়ছে।

তিনি ছেলের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। ফরহাদ দরজা খুলে দিল। রশীদ আলি বললেন, কি করছিস?

ফরহাদ বলল, পড়ছি।

'রাত তিনটার সময় কিসের পড়া?'

ফরহাদ মাথা চুলকালো। সে বুঝতে পারছে না তার বাবা এত রেগে যাচ্ছেন কেন? ছেলেমেয়েকে গভীর রাতে পড়তে দেখলে যে কোন বাবা খুশি হন। তার বাবা হচ্ছেন না কেন?

রশীদ আলি থমথমে গলায় বললেন, ফাজলামির একটা সীমা থাকা দরকার। রাত তিনটার সময় বিদ্যাসাগর সেজেছো? জুতাপেটা করে বিদ্যার ভূত নামিয়ে দেব। যা, ঘুমুতে যা। বাতি নেভা।

ফরহাদ তৎক্ষণাৎ বাতি নিভিয়ে দিল।

'একটা টু-শব্দ যেন না শুনি। কোন রকম গুনগুনানি শুনতে চাই না। দরজা বন্ধ কর্। ছিটকিনি লাগা।'

ফরহাদ ছিটকিনি লাগাল। তিনি ছিটকিনির খট খট শব্দ শুনে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তাঁর আবারো পানির তৃষ্ণ হলো। তিনি জগ থেকে ঢেলে পানি খেলেন। তখন বাথরুম পেয়ে গেল। বাথরুম সেরে চোখে-মুখে পানি দিয়ে তিনি আবার ঘুমুতে গেলেন। ঘন ঘন হাই উঠছে। ঘুম হয়ত এসে যাবে। তিনি ঘড়ি দেখলেন। তিনটা এগারো। মাত্র এগারো মিনিট পার হয়েছে অথচ তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল এক ঘণ্টার মত পার হয়েছে।

বালিশে মাথা লাগবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঝিমুনির মত এসে গেল। তিনি স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন — ব্যাগ গোছাচ্ছেন — ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেনের হুইসেল শোনা যাচ্ছে। অথচ ব্যাগ গোছানো হচ্ছে না। সারা বিছানায় অসংখ্য জিনিস। এবং অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস। পিতলের কলসি আছে, কয়েকটা খালি হরলিক্সের কৌটা একটা ফুটবল পাম্প করার পাম্পার। এইসব হাবিজাবি জিনিস তিনি কেন ব্যাগে ভরছেন বুঝতে পারছেন না। জায়গা হচ্ছে না। ঠাসাঠাসি করে ভরতে হচ্ছে। এর মধ্যে আবারো ট্রেনের হুইসেলের শব্দ। ট্রেনের হুইসেলের শব্দ ছাপিয়ে অন্য রকম শব্দ আসছে। মশার পিন পিন শব্দের মত শব্দ। শব্দটা বাড়ছে। এটা কিসের শব্দ? মশা? না, মশা না। গানের গুনগুনানির মত শব্দ। কে যেন গান গাইছে। তা হলে কি ফরহাদ আবার বই নিয়ে বসেছে? তাকে না বলে আসা হল সে যেন বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ে? স্বপ্নের মধ্যেই তিনি তাঁর স্ত্রীকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন — তুমি ওকে বল ও যেন গুনগুন না করে।

সালমা বানু বললেন, আহা পড়ুক। ভাল রেজাল্ট করতে চায়।

'গাধা আবার ভাল রেজাল্ট কি করবে?'

'আহা গাধা বলছ কেন?'

'গাধাকে কি বলব? মহিষ বলব?'

ফরহাদ পড়ছে। তার গলার স্বর ক্রমেই উঠছে। কোমল সা থেকে মন্দ্র সপ্তকের সা। আরে বাসরে — গলা আরো চড়ছে।

তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শুনলেন, ফরহাদ পড়ছে। গুনগুন শব্দে পড়ছে। তিনি বিছানা থেকে শান্ত ভঙ্গিতে নামলেন। দরজা খুলে বারান্দায় এলেন। ফরহাদের ঘরের বাতি নেভানো। তাঁকে জাগতে দেখে বাতি নিভিয়ে দিয়েছে। বদমায়েশির একটা সীমা থাকা দরকার। বার করছি তোমার গুনগুনানি। তিনি ফরহাদের দরজায় লাথি দিলেন।

ফরহাদ দরজা খুলে বের হয়ে এল। বাবাকে দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল।

'এই বদমায়েশ ! তোকে না বললাম ঘুমিয়ে পড়তে? আমার সাথে রংবাজি করছিস ? রঙিলা হয়েছিস ?'

'বাবা, আমি ঘুমাচ্ছিলাম।'

'আবার মিথ্যা কথা ?'

রশীদ আলি তাঁর শরীরের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ছেলের গালে চড় বসালেন। ফরহাদ হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। রশীদ আলির কাছে মনে হল ফরহাদের ঠোঁটের কোণে হাসি। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন, হাসছিস কেন ?

ফরহাদ কি যেন বলল। তিনি শুনতে পেলেন না। ছেলের গায়ে প্রচণ্ড এক লাথি বসালেন। ব্যথায় তাঁর নিজের পা মনে হল খুলে পড়ে যাচ্ছে।

আতাহার তার ঘর থেকে বের হয়েছে। হৈ-চৈয়ের কারণ সে বুঝতে পারছে না। বাসায় কিছু একটা হচ্ছে। সেটা কি ? মিলি বাসায় নেই, সে হাসপাতালে — মা'র সঙ্গে। ফরহাদের কিছু হয়েছে কি ? রাত-বিরেতে হঠাৎ হঠাৎ সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আতাহার ফরহাদের ঘরের দরজার সামনে এসে এক ভয়ংকর দৃশ্য দেখল। বাবা ফরহাদের গায়ে-মাথায় লাথির পর লাথি মেরে যাচ্ছেন। ফরহাদ রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে বাবাকে দেখছে।

আতাহার বলল, বাবা, কি হয়েছে ?

রশীদ আলি দরজার দিকে তাকালেন।

আতাহার বলল, বাবা, আপনার কি শরীর খারাপ ?

রশীদ আলি জড়ানো গলায় বললেন, হ্যাঁ আমার শরীরটা খারাপ। ঘুম হচ্ছে না — বলেই দেয়াল ধরার চেষ্টা করলেন। তিনি পড়েই যেতেন, তার আগেই আতাহার তাঁকে ধরে ফেলল এবং তার ঠিক দশ মিনিটের মাথায় তিনি মারা গেলেন।

মৃত্যুর আগে আগে তাঁর মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছিল এবং তিনি খুব ঘামছিলেন। হাঁপরের মত শ্বাস টানতে টানতে তিনি ফরহাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবা রে, আমি খুবই লজ্জিত। খুবই দুঃখিত। আমি তোর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

ফজরের আজান হওয়া পর্যন্ত দুই ভাই মূর্তির মত মুখোমুখি বসে রইল। ফরহাদ মাঝে মাঝে ফোঁপানির মত শব্দ করছে। তবে কাঁদছে বলে মনে হচ্ছে না। আতাহার একবার শুধু বলল, কাঁদিস না। তাতে ফরহাদের ফোঁপানি থামল না। তবে সে মনে হয়

কাঁদছে না। এ রকম শব্দ করে মানুষ কাঁদে না। বড় ধরনের শারীরিক কষ্টের সময় মানুষ এরকম শব্দ করে। স্বজনের মৃত্যুর কষ্ট শারীরিক কষ্ট নয়, এই কষ্ট মাথার ভেতরে হয়।

আতাহারের মাথার ভেতরটা খালি হয়ে গেছে। খালি পেটে প্রচুর সিগারেট খেলে যে রকম লাগে সে রকম লাগছে। বমিভাবও হচ্ছে। নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ লাগছে। ঝাঁঝালো গন্ধ লাগার কোন কারণ নেই। কেন লাগছে কে জানে। রসুনের গন্ধের মত গন্ধ। মৃত মানুষের শরীর থেকে কি রসুনের গন্ধের মত কোন গন্ধ আসে?

সামনের দিনটা ভয়ংকর। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত অনেক কিছু করতে হবে। মা'কে খবর দিতে হবে। তাঁকে হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে আসতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে হবে। মনিকাকে একটা টেলিফোন করতে হবে। মৃতদেহ ধোয়ানোর একটা ব্যাপার আছে। অনেক জটিল নিয়ম কানুন। এইসব নিয়ম কানুন যারা জানে তাদের খবর দিয়ে আনতে হবে। কবর কোথায় দেয়া হবে? কবর দেয়ার নিয়মকানুন কি? কোথায় যেতে হবে? কার কাছে যেতে হবে? এইসব ব্যাপারে সবচে' ভাল যে জানত তার নাম মজিদ। সে পড়ে আছে নেত্রকোনায়।

আতাহার ক্ষীণ স্বরে ডাকল, ফরহাদ!

ফরহাদ কিছু বলল না, তবে তার অদ্ভুত ফোঁপানি বন্ধ করল।

আতাহার বলল, ফজরের আজান হলেই আমি মা'কে খবর দিতে যাব হাসপাতালে — তুই একা একা থাকতে পারবি না?

'হুঁ।'

'বাড়িওয়ালাকে খবর দিস — চলে আসবে।'

'হুঁ'।

'কয়টা বাজে দেখ তো?'

ফরহাদ নড়ল না — বসেই রইল। সময় দেখার তার কোন ইচ্ছে নেই। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার লাগছে। ঘরে বাতি জ্বলছে, তারপরেও অন্ধকার। আতাহার এর কারণটা ধরতে পারছে না। তার প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছে সিগারেট খাবার। সিগারেট খাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছে না। জীবিত বাবার সামনে সে কোনদিন সিগারেট খায়নি — আজ মৃত বাবাকে খাটে শুইয়ে রেখে সিগারেট ধরানোটা কি ঠিক হবে?

না, ঠিক হবে না। অন্যায় হবে এবং ভুল হবে। আতাহার বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। বাবার কাছে সে বড় একটা অপরাধ এক সময় করেছিল। সেই অপরাধের জন্যে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেনি। মৃত মানুষের কাছে কি ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়? করা না গেলেও সে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

তার বাবা তাকে দিয়ে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন নাখালপাড়ায়। তাঁর এক ছাত্রীর কাছে লেখা চিঠি। চিঠি দেবার সময় বিব্রত গলায় বলেছিলেন — ওর হাতেই দিবি। অন্য কারো হাতে না। ছাত্রীর নাম ফরিদা। আতাহার নাখালপাড়া গিয়েছিল — কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিঠিটি তার হাতে দেয়নি। হঠাৎ তার ইচ্ছা হয়েছিল — জানতে, কি এমন লেখা চিঠিতে যা অন্য কারো কাছে দেয়া যাবে না। এটা কি কোন গোপন প্রণয়ের

ব্যাপার? মানুষের নানান দুর্বলতা থাকে। খাটি হীরাতেও ত্রুটি থাকে। চিঠি পড়ে আতাহার বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিল — চিঠিতে রশীদ সাহেব তাঁর ছাত্রীকে লিখছিলেন —

মা ফরিদা,

আমার বড় মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা তুমি করে দিয়েছিলে। আমার দ্বিতীয় মেয়েটির জন্যে একজন ছেলে দেখে দাও মা। জীবনযুদ্ধে আমি পরাজিত হয়েছি। নিজের উপর বিশ্বাস এবং আস্থাও হারিয়ে ফেলেছি। এখন কেবলই মনে হয়, আমি নিজে কিছুই করতে পারব না। আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ। সব মানুষই তার অসুস্থ স্ত্রীর আরোগ্যের জন্যে প্রার্থনা করে। আমি একমাত্র ব্যতিক্রম। আমি সালমার আরোগ্যের জন্যে কখনো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি নাই। আমি চাই আমার আগে তার মৃত্যু হোক। যদি তার আগে আমার মৃত্যু হয় তাহলে সে বড়ই কষ্টে পড়বে। তার জন্যে এই কষ্ট আমার কাম্য নয়।

মা, তুমি গত ঈদে আমার স্ত্রীকে যে কম্বলটি উপহার দিয়েছ, সেই কম্বল সে সব সময় ব্যবহার করে। হাসপাতালে যাবার সময়ও সে সেই কম্বলটি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

মা, অনেক অপ্রিয় কথা লিখে ফেললাম। বৃদ্ধ শিক্ষকের ভাবালুতা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখো।

ভাল থেকো।

তোমার স্বামী এবং পুত্র-কন্যাদের নিত্য মঙ্গল কামনা করি।

তোমার স্যার
রশীদ আলি

সকাল হচ্ছে। মসজিদে আজান হল। আকাশ মেঘলা বলে এখনো চারপাশ অন্ধকার। আতাহার বের হয়েছে। প্রথমে যাবে হাসপাতালে। দিনের শুরুতে কাউকে মৃত্যু সংবাদের মত ভয়াবহ সংবাদ কি দিতে আছে?

না, দিতে নেই।

রাস্তায় রিকশা আছে তবু আতাহার হেঁটে রওনা হল। রিকশায় দ্রুত যাবার দরকার নেই। যত দেরিতে পৌঁছানো যায় ততই ভাল।

হাসপাতালের গেটের কাছে এসে আতাহার চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছা করছে না। সে রওনা হল নীতুদের বাড়ির দিকে। হেঁটে হেঁটে রওনা হল। আজ তার ইচ্ছা করছে সারাদিন শুধু হাঁটতে। ঢাকা শহরের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি অলি-গলি হাঁটতে কতক্ষণ লাগবে? আতাহার মনে মনে বলল, আমি নাগরিক এক কবি। নাগরিক কবি হিসেবে এই শহরের প্রতিটি রাস্তায় আমার পদচিহ্ন থাকা উচিত।

নীতু দরজা খুলেই বলল, এত সকালে?
আতাহার কিছু বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
নীতু বলল, নাশতা খাবেন?
আতাহার বলল, হুঁ।
'আপনার কি শরীর-টরীর খারাপ নাকি? আপনাকে কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে।'
'শরীর ঠিকই আছে।'
'দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।'
'না, বসব না।'
'কি অদ্ভুত কথা! বসবেন না, মানে নাশতা খাবেন কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?'
'নাশতা খাব না রে নীতু। চলে যাব।'
'আপনার কি হয়েছে আতাহার ভাই, বলুন তো? আপনি এই চেয়ারটায় বসুন তারপর বলুন। আপনাকে ভয়ংকর ক্লান্ত লাগছে।'
'অনেকটা রাস্তা হেঁটে এসেছি।'
'হেঁটে এসেছেন কেন? রিকশাভাড়া ছিল না?'
'হেঁটে আসতে আসতে মনে মনে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছি। কবিতার পুরোটা মাথার ভেতর লেখা হয়েছে।'
'কাগজ-কলম এনে দেব? লিখবেন?'
'না। ববাকে নিয়ে এই প্রথম একটা কবিতা লিখলাম।'
'আপনার মা কি সুস্থ আছেন আতাহার ভাই?'
'হ্যাঁ, মা ভাল আছেন। বাবাকে নিয়ে যে কবিতাটি লিখেছি তার পেছনে একটা মজার ইতিহাস আছে। শুনবি?'
'আপনার জন্যে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আসি — তারপর শুনি।
'না, চা খাব না। ইতিহাসটা শোন। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। স্কাউট জাম্বুরিতে যাব। খুব ভোরে ট্রেন। আমি জেগে বসে আছি — আমার ভয় — একবার ঘুমিয়ে পড়লে আর সকালে উঠতে পারব না। বাবা বললেন — বটু শোন্, তুই আরাম করে ঘুমা। আমি বরান্দায় জেগে বসে থাকব। বাবা সারারাত জেগে বসেছিলেন। আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছি। কবিতাটা শুনবি?'
'বলুন।'

'আমার ভোরের ট্রেন, বাবা বলিলেন,
ঘুমো তুই ডেকে দেব ফজরের আগে .

নীতু অবাক হয়ে দেখল আতাহারের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। গলা ধরে যাওয়ায় কবিতার বাকি লাইনগুলি সে বলতে পারছে না। সে আতাহারের হাত ধরে বলল, কি হয়েছে আতাহার ভাই?

'বাবা গত রাতে মারা গেছেন।'

নীতু সঙ্গে সঙ্গেই আতাহারকে জড়িয়ে ধরল। চিরন্তন মমতাময়ী নারী তার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করল। আতাহার কাঁপছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। নীতু তার পিঠে গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

চৌদ্দ ঘণ্টা আগেও একটা মানুষ জীবিত ছিল। তাঁর হৃদপিণ্ড ধ্বক করে স্পন্দিত হচ্ছিল। গভীর আনন্দে তার শরীরের লোহিত কণিকারা অক্সিজেন নিয়ে ছোটাছুটি করছিল। তাদের ব্যস্ততার সীমা ছিল না, এই অক্সিজেন নিয়ে ছুটে যাওয়া, আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে দেয়ার জন্যে দৌড়ানো। আজ তাদের কোন ব্যস্ততা নেই। তারাও নিশ্চয়ই গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবছে — ব্যাপারটা কি?

মৌলানা সাহেব আতাহারের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কি 'কব্বরে' নামবেন?

কব্বর শব্দটা আতাহারের কানে খট করে বাজল। মৌলানা সাহেব করব কে 'কব্বর' বলছেন কেন? কবরের আরবী কি 'কব্বর'?

আতাহারের ভুরু কুঁচকে গেল। কত তুচ্ছাতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তার মস্তিষ্ক এখন ব্যস্ত। কবরের আরবী 'কব্বর' হলেই বা কি, না হলেই বা কি? তবু মস্তিষ্কের নিউরোন ব্যস্ত হয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে ভাবছে। সে হয়ত অতি যত্নে মস্তিষ্কের মেমরি সেলে এই তথ্য জমা করে রাখবে — কোন এক সময় আতাহার তার কোন কবিতায় ব্যবহার করবে — 'কব্বর'।

তিনি শায়িত ছিলেন গাঢ় কব্বরে
যার দৈর্ঘ-প্রস্থ বেঁধে দেয়া,
গভীরতা নয়।
কব্বরে শুয়ে তাঁর হাত কাঁপে পা কাঁপে
গভীর বিস্ময়বোধ হয়।
মনে জাগে নানা সংশয়।
মৃত্যু তো এসে গেছে, শুয়ে আছে পাশে
তবু কেন কাটে না এ বেহুদা সংশয়?

'ভাইজান নামেন, কব্বরে নামেন।'

'আতাহার বলল, কেন, কবরে নামব কেন?'

'এইটাই নিয়ম। পুত্র নিজের হাতে পিতার দেহ নামাবে।'

'নিয়ম তো জীবিতদের জন্যে। মৃতের জন্য আবার নিয়ম কি?'

মৌলানা বিস্মিত হয়ে তাকাচ্ছেন। আতাহার নিজেও তার নিজের কথায় বিস্মিত হচ্ছে। কি বলছে সব পাগলের মত? সে একাই শুধু পাগলের মত আচরণ করছে। কই

আর কেউ তো করছে না। ফরহাদ চিৎকার করে কাঁদছে। একজন বয়স্ক পুরুষের এই ভঙ্গিতে কান্না হাস্যকর। তারপরেও এই হাস্যকর ব্যাপারটা স্বাভাবিক লাগছে।

পিতার মৃত্যুতে পুত্র–কন্যারা কাঁদবেই। কাঁদাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আতাহার কাঁদতে পারছে না। তার বিরক্তি বোধ হচ্ছে।

বৃষ্টি পড়তে শুরু করছে। বেশ ভাল বৃষ্টি। কবরের ভেতর বৃষ্টির পানি জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জমা পানি রশীদ সাহেবের খুব অপছন্দ ছিল। সেই অপছন্দের জিনিসটা তাঁর মৃত্যুর সময় ঘটল। তাঁকে শুইয়ে দিতে হল পানির ভেতর।

মৌলানা সাহেব বললেন, পানির মধ্যে লাশ রাখা হয়েছে। এই জন্যে কেউ মন খারাপ করবেন না। পানি হল আল্লাহ পাকের রহমত।

না, আতাহার মন খারাপ করছে না। বরং তার ভাল লাগছে এই ভেবে যে, প্রবল বৃষ্টি হঠাৎ শুরু হওয়ায় দাফনপর্ব দ্রুত শেষ হয়ে গেল। এখন বাসায় ফেরা যায়।

আতাহারের বাসায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। তার মা'কে বাসায় নিয়ে আসা হয়েছে। বাসায় ফিরে তাঁকে কি অবস্থায় সে দেখবে কে জানে? তিনি, মিলি এবং ফরহাদ মিলে কান্নার কোরাস শুরু করবে — সেখানে আতাহার যোগ দিতে পারবে না। ব্যাপারটা তার নিজের জন্যেও অস্বস্তিকর, আপেপাশে যারা থাকবে তাদের জন্যেও অস্বস্তিকর।

সালমা বানুকে যখন বাসায় নিয়ে আসা হয়েছিল তখন তাঁর জ্ঞান পুরোপুরি ছিল। কিন্তু তিনি স্বাভাবিক আচরণ করেননি। শান্ত গলায় বলেছেন, মনিকাকে কি খবর দেয়া হয়েছে? ওকে খবরটা দেয়া দরকার। আত্মীয়স্বজন সবাইকে কি বলা হয়েছে? কেউ যেন বাদ না থাকে। গ্রামের বাড়িতে খবর দেয়া দরকার। হিরনপুর পোস্টাপিসের হেড মাস্টারকে খবর দিলেই খবর পোঁছে যাবে। এইসব কথা খুবই যুক্তির কথা। প্রবল শোকে মানুষের যুক্তির ব্যাপারটা নষ্ট হয়ে যায়। সালমা বানুর নষ্ট হয়নি — তার অর্থ প্রবল শোক তিনি অনুভব করছেন না। তিনি আছেন ঘোরের মধ্যে। মস্তিষ্কের যে অংশ শোক অনুভব করে সেই অংশ অকেজো হয়ে আছে।

মৃতদেহ ধোয়ানোর ব্যাপার যখন এল তখন সালমা বানু হঠাৎ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, এ কি, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দেয়া হচ্ছে? সবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? তোর বাবা সারাজীবন গরম পানি দিয়ে গোসল করেছে। ভাদ্র মাসের গরমেও তার জন্যে পানি গরম করতে হয়। তোরা বেআক্কেলের মত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল দিচ্ছিস? মানুষটা মরে গেছে বলে যা–ইচ্ছা–তাই করবি?

বলেই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সেই কান্না প্রিয়জনের মৃত্যুর শোকের কান্না না — প্রিয় মানুষটিকে কেন ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করানো হল সেই দুঃখের কান্না। কাঁদতে কাঁদতেই তিনি ঘোরের মধ্যে চলে গেলেন। চারদিকে তাকান, কাউকে চিনতে পারেন না। আতাহার বলল, মা'কে হাসপাতালে দিয়ে আসি?

মিলি বলল, আজ দিনটা মা থাকুক। কাল দিয়ে এলেই হবে।

এমন প্রবল শোকের বাড়িতে মানুষের যেতে ইচ্ছে করে না। তবু আতাহারকে যেতে হচ্ছে। ভিজতে ভিজতে যে সে যাবে সে উপায় নেই। অচেনা একজন মানুষ তার মাথার

উপর ছাতা ধরে আছে। মানুষটার গা থেকে বিকট ঘামের গন্ধ আসছে। আতাহারের বলার ইচ্ছা করছে — ভাইজান, আপনি লাইফবয় সাবান দিয়ে গোসল করবেন। টিভির বিজ্ঞাপনে দেখেছি — লাইফবয় সাবান দিয়ে গোসল করলে ঘামের গন্ধ চলে যায়। দয়া করে বগলে সাবান বেশি করে মাখবেন। একশ হর্স পাওয়ারের গন্ধ আপনার বগল থেকে আসছে। ছাতা উঁচু করে ধরায় আপনার বগল ফ্রি হয়েছে — ভুর ভুর করে গন্ধ আসছে। ভুর ভর করে গন্ধ আসছে বলাটা ঠিক হবে না। ভুর ভুর করে আসে মিষ্টি গন্ধ। বদ ঘ্রাণ অন্য কোনভাবে আসার কথা। বাংলা সাহিত্যে বদ ঘ্রাণ আসার কোন শব্দ কি আছে? রবীন্দ্রনাথ কোন শব্দ তৈরি করে যাননি?

'ভুর ভুর করে ফুলের ঘ্রাণ আছে'র মত 'কীর কীর' করে দুর্গন্ধ আসছে।

বাসার সামনে এসে আতাহার থমকে দাঁড়াল। সাজ্জাদের লাল টয়োটা দাঁড়িয়ে আছে। সাজ্জাদ বসে আছে গাড়ির ভিতর। গাড়ির সব কাঁচ ওঠানো। মনে হয় সাজ্জাদ ক্রমাগত সিগারেট খাচ্ছে। গাড়ির ভেতরটা ধোঁয়ায় ভর্তি হয়ে আছে। সাজ্জাদ গাড়ির কাঁচ নামিয়ে বলল, আতাহার, উঠে আয়। আতাহার গাড়িতে উঠে পড়ল। সাজ্জাদ বলল, আতাহার, তোকে আমি কি ভাবে সান্ত্বনা দেব আমি জানি না। তোর বাবার সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল। অনার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার পর তোকে খবর দেবার জন্যে তোর বাসায় গেলাম। দেখি তুই নেই। তোর বাবা গম্ভীর মুখে বের হয়ে এলেন। কঠিন মুখে বললেন, কি চাই?

আমি বললাম, আতাহারের সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

তোর বাবা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, কি দরকার?

উনি আবার বললেন, দরকারটা কি?

আমি মহা বিরক্ত হয়ে বললাম, আমার অনার্স পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে সেই খবরটা ওকে দিতে এসেছিলাম।

'রেজাল্ট কি?'

'ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি।'

'তোর বাবা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কিছুতেই ছাড়েন না। যখন ছাড়লেন তখন দেখি তাঁর চোখে পানি। বুঝলি আতাহার, আমার যখন খুব মন খারাপ থাকে তখন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য কল্পনা করি। তাঁর চোখের পানির দৃশ্য তার মধ্যে একটা।'

আতাহার বলল, আমার বাবার সারাজীবনের শখ ছিল তাঁর ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ফার্স্ট-সেকেন্ড হবে। আমরা কেউ সেকেন্ড ডিভিশনের উপর কিছু করতে পারিনি।

সাজ্জাদ সিগারেটের প্যাকেট বের করে দিল। আতাহার বলল, সিগারেট খাব না।

সাজ্জাদ বলল, সিগারেট না, গাঁজা। দি গ্রেট গ্রাস। প্রথম শ্রেণীর। যত্ন করে তৈরি করা। দু'-তিনটা খা, দেখবি ভাল লাগবে। আমি আজ সকাল থেকে খাচ্ছি।

'এখন যাচ্ছিস কোথায়?'

'লীলাবতীর জন্মদিনের উৎসবে।'

'লীলাবতীটা কে?'

'এই পৃথিবীর সেরা রূপবতীদের একজন।

'লীলাবতীর কথা তো আর কখনো শুনিনি।'

সাজ্জাদ হাসল।

আতাহারের মনে হল, সাজ্জাদের অনেক কিছুই আসলে সে জানে না। পরক্ষণেই মনে হল — শুধু আতাহার না, সাজ্জাদ নিজেও জানে না।

পরিপূর্ণভাবে নিজেকে যে মানুষ জেনে ফেলে জীবন তার কাছে অর্থহীন হয়ে যায়। সে তখন জীবন থেকে মুক্তি কামনা করে। কবি মায়াকোভস্কি নিজেকে জেনে ফেলেছিলেন — কাজেই জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেই সেই জীবনের ইতি করেছিলেন।

কবি

লীলাবতীদের বাড়ি ওয়ারীতে। বাড়ি না বলে দুর্গ বললেও খুব ভুল হবে না। জেলখানার মত উঁচু পাচিলে বাড়ি ঘেরা। গেট নিশ্ছিদ্র লোহার। ফাঁক–ফোকর নেই যে ভেতরের কোন দৃশ্য হঠাৎ চোখে পড়বে। এই জাতীয় বাড়ির ভেতরটা সাধারণত অন্য রকম হয়ে থাকে। গেট পেরিয়ে ভেতরে পা দিলেই আধুনিক কেতার বাংলো টাইপ বাড়ি দেখা যায়। লীলাবতীদের বাড়ি সে রকম নয়। নোনা ও শ্যাওলা ধরা পাঁচিলের মত বাড়িটাও নোনা ও শ্যাওলা ধরা। ফরিদার মা জাহানারা গত দশ বছর ধরে এই বাড়ি ভেঙে নতুন বাড়ি করার পরিকল্পনা করছেন। জাহানারা এমন এক মহিলা যিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই ব্যয় করেন। অর্থ–বিত্তহীন মানুষদের প্রধান বিলাস পরিকল্পনা। জাহানারা বেগমের অর্থবিত্ত দু'টাই আছে। বেশি পরিমাণেই আছে। জাহানারার স্বামী ওয়াকিল আহমেদ অর্থ ও বিত্ত দু'টোই প্রচুর পরিমাণে রেখে মারা গেছেন। জাহানারা সেই সঞ্চিত অর্থ কিছুই খরচ করতে পারেননি।

মেয়েকে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবেন এই জাতীয় পরিকল্পনা তাঁর ছিল। এখনো আছে — সেই পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হয়নি।

আজ লীলাবতীর ১৮তম জন্মদিন।

এই জন্মদিন তিনি কিভাবে পালন করবেন তা নিয়ে গত তিনমাস ধরে চিন্তা করেছেন। একটি মেয়ের ১৮তম জন্মদিন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি ঠিকঠাকমত হোক তিনি মনে–প্রাণে তা চেয়েছিলেন। বয়স ১৮ হয়েছে। লীলাবতী ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে পারবে — কাজেই তিনি ভেবেছিলেন মেয়েকে ছোট্ট একটা গাড়ি কিনে দেবেন। সেই গাড়ি শেষ পর্যন্ত কেনা হয়নি। তাঁর রঙ পছন্দ হয়নি। তাঁর পছন্দ লাল রঙ। সেই লাল — রঙের লাল না। সূর্য ডোবার পরে পরে আকাশে যে লাল রঙ দেখা যায় সেই রঙ। তেমন পাওয়া যায়নি। কোন লাল রঙ তাঁর চোখে লাগল না।

জন্মদিনে বাড়ির ছাদে একটা গানের আসর করবেন — এই পরিকল্পনাও ছিল। কয়েকজন গায়িকার সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। তিনজনের একটা তালিকা করেছিলেন। যেহেতু একক গানের অনুষ্ঠান সেহেতু তিনজনের ভেতর কাকে বলবেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেটা ঠিক করতে পারলেন না। জন্মদিনের অনুষ্ঠান অবশ্যি তার পরেও ভালমত হয়েছে। লীলাবতীর বন্ধুবান্ধবরা ঝাঁক বেঁধে এসেছে। জাহানারা কখনো কোন অনুষ্ঠানে তাঁর বা তাঁর শ্বশুরবাড়ির কাউকে আসতে বলেন না। তারপরেও অনেকে

এসেছে। বাড়ির প্রধান দরজায় লাল–নীল ক্রীশমাস বাতি জ্বলছে–নিভছে। লীলাবতী এই বাতি দেখে মা'র সঙ্গে খানিকক্ষণ রাগারাগি করল। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, মা, আমার কি বিয়ে না-কি? বাতি–ফ্যাতি কেন?

জাহানারা বিরক্ত গলায় বললেন, উৎসবে বাতি জ্বলে। এটা নতুন কিছু না। তুই ও রকম মাথা ঝাঁকিয়ে কথা বলবি না তো। অসহ্য লাগে।

লীলাবতী বলল, (আবার মাথা ঝাঁকিয়ে — সে মাথা না ঝাঁকিয়ে কথা বলতে পারে না) আমার সব কিছুই তোমার অসহ্য লাগে?

জাহানারার মুখে এসে গিয়েছিল বলেন — হ্যাঁ লাগে। শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালেন। বললেন না। মেয়ের জন্মদিন। এই দিনে কঠিন কঠিন কথা না বলাই ভাল। তবে সত্যি কথা হচ্ছে লীলাবতীর বেশিরভাগ জিনিশই তাঁর অসহ্য লাগছে। বিশেষ করে জন্মদিন উপলক্ষে যে পোশাকটা পরেছে — সেটা তো রীতিমত অশালীন।

জাহানারা বললেন, তুই এটা কি পরেছিস?

লীলাবতী বলল, রাজস্থানী একটা ড্রেস পরেছি মা।

'আজকের দিনে রাজস্থানী ড্রেস কেন? এটা কি রাজস্থান? তুই কি রাজস্থানের মরুভূমিতে বাস করছিস?'

'হ্যাঁ — আমার কাছে বাড়িটাকে রাজস্থানের মরুভূমির মতই লাগছে মা।'

'সুন্দর দেখে একটা শাড়ি পর। আঠারো বছরের জন্মদিনে সব মেয়েরা শাড়ি পরে।'

লীলবতী বলল, আমি পরি না। আমি রাজস্থানী ড্রেস পরি। তা ছাড়া আজ আমি নাচব। শাড়ি পরে নাচব কিভাবে?

জাহানারা মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর মনে হল, তাঁর একচল্লিশ বছরের জীবনে তিনি যে কয়টা বড় ভুল করেছিলেন — তার মধ্যে একটা হচ্ছে মেয়েকে নাচ শেখানো। আট বছর বয়সে তিনি নিজে নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাচের ব্যাপারটা মেয়ের মাথায় ঢুকে গেল।

লীলাবতীর বাবা ওয়াকিল আহমেদ সাহেব এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, দিন-রাত বাসায় নুপূরের শব্দ, এইসব কি? নাচ হচ্ছে এক ধরনের লাফালাফি — এর মধ্যে শেখার কি আছে? শিখতে চাইলে গান শিখুক।

জাহানারা বিরক্ত হয়ে বললেন, নাচ যদি লাফালাফি হয় তাহলে তো গানও চিৎকার। গান শিখে তাহলে লাভ কি?

জাহানারা মেয়েকে গান শেখাননি — নাচই শিখিয়েছেন। এখন মনে হচ্ছে তিনি ভুল করেছেন। লীলাবতী হয়েছে দুর্বিনীত, অহংকারী ও জেদী। তার মাথায় কিছু একটা ঢুকলে তা আর বের হয় না। স্থায়ীভাবে বসে যায়। নাচ মেয়ের মাথায় বসে গেছে। এখন তাঁর মনে হয় কাঁটা দিয়ে মাথার ভেতর থেকে জিনিস তোলার ব্যবস্থা থাকলে তিনি তুলে ফেলতেন।

লীলাবতীর বন্ধুরা খুব হৈ-চৈ করছে। এদের মধ্যে একজন ম্যাজিশিয়ান আছে যে ম্যাজিক দেখাচ্ছে এবং যা দেখাচ্ছে তার রহস্যই বের হয়ে পড়ছে। তাতে দর্শকদের

আনন্দের কোন ঘাটতি হচ্ছে না। দড়ি কাটা খেলার সময় ম্যাজিশিয়ান দড়ি এবং কাঁচি হাতে উঠে দাঁড়াতেই একজন বলল, দেখুন, আপনার হাতের তালুতে কি? ম্যাজিশিয়ান বলল, কেঁচি।

'হাত উপুড় করে দেখান। মনে হচ্ছে আরো কিছু আছে।'

'আর কিছু নেই, শুধুই কেঁচি।

'দেখি না।'

'না, দেখানো যাবে না।'

'দেখাতে হবে।'

বাধ্য হয়ে ম্যাজিশিয়ান হাত উপুড় করল। দেখা গেল হাতের তালুতে দড়ির একটা ছোট্ট টুকরা লুকানো। চারদিকে আনন্দের বান ডেকে গেল। ম্যাজিকের কৌশল ধরা পড়ে যাচ্ছে এই আনন্দ ম্যাজিকের আনন্দের চেয়েও বেশি।

জাহানারা 'বারবিকিউ' তদারক করছেন। স্টেজ তৈরি হচ্ছে। বারবিকিউ-এর কয়লার আঁচ ঠিক আছে কি-না — মাংস ঠিকমত ঝলসানো হচ্ছে কি-না তিনি তাই দেখছেন। বার ঘন্টা ধরে মাংস সিরকায় ডুবিয়ে রাখার কথা — তাঁর ধারণা, বাবুর্চি এই কাজটা করেনি। তিনি ভুরু কুঁচকে একটু পর পর আকাশের দিকে তাকাচ্ছেন। বৃষ্টি এখন বন্ধ হয়েছে, তবে আকাশে মেঘের যেমন আনাগোনা, আবারো শুরু হবে। চুলা নিয়ে হলঘরে চলে যেতে হবে। ঘরের ভেতর বারবাকিউ, এ রকম হাস্যকর কথা কে কবে শুনেছে? গাড়ির হর্ণ শুনে তিনি বারান্দা থেকে গাড়ি-বারান্দায় নেমে এলেন। লীলাবতীর বন্ধুবান্ধব কে কে আসছে তিনি দেখে রাখতে চান। লীলাবতীর বন্ধুবান্ধবদের ধরণ পাল্টে যাচ্ছে। এইসব খেয়াল রাখা দরকার। অহংকারী, জেদী ও দুর্বিনীত মেয়েদের মা হওয়া খুব কষ্টের।

গাড়ি থেকে সাজ্জাদ নামছে। সাজ্জাদের সঙ্গের ছেলেটিকে তিনি চেনেন না। অপরিচিত যে কোন মানুষ দেখলে জাহানারার ভুরু কুঁচকে যায় — এবার কুঁচকালো না। সাজ্জাজের কোন বন্ধু হবে। এ বাড়ির দরজা সাজ্জাদের জন্যে যেমন খোলা — সাজ্জাদের বন্ধুর জন্যেও খোলা।

সাজ্জাদ বলল, কেমন আছেন খালা?

জাহানারা আনন্দিত গলায় বললেন, তুই কেমন আছিস?

'খুব ভাল আছি। আপনার কন্যার জন্মদিনে বন্ধু নিয়ে এসেছি — এর নাম আতাহার। বাংলাদেশের সবচে' বড় কবি হবার মত প্রতিভা দিয়ে জন্মেছিল — প্রতিভা ঠিকমত কাজ করছে না বলে আজেবাজে জিনিশ লিখে বেড়াচ্ছে। আর আতাহার — এই অসম্ভব রূপবতী মহিলার নাম জাহানারা। আমার দূর সম্পর্কের খালা। তাঁর কন্যা বিখ্যাত নর্তকী লীলাবতী। মায়ের রূপ মেয়ে পুরোপুরি পায়নি, যা পেয়েছে তাও কম না।'

জাহানারা বললেন, তুই তো কখনো এক সঙ্গে এতগুলি কথা বলিস না। আজ বললি কি করে?

সাজ্জাদ বলল, আজ গাঁজা খেয়ে এসেছি খালা।

'গাঁজা খেয়ে এসেছিস মানে?'

'বিকট গন্ধ পাচ্ছেন না? এই গন্ধ বিখ্যাত 'গ্রাসে'র গন্ধ।

জাহানারার মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন চমৎকার একটা ছেলের এই অদ্ভুত স্বভাব কেন? জন্মদিনের উৎসবে সে গাঁজা খেয়ে আসবে কেন? আর যদি আসেই — বলার দরকার কি?

জাহানারা বললেন, জন্মদিনের খবর তোকে কে দিল?

'লীলাবতী কাল রাত দু'টার সময় টেলিফোন করে জানিয়েছে। সে না-কি রাজস্থানী নচ নাচবে। রাজস্থানী নাচ আবার কি কে জানে? কথকফথকের নাম শুনেছি।'

জাহানারার কাছে লীলাবতীর রাজস্থানী পোশাক পরে বসে থাকার কারণ স্পষ্ট হল। তবে মনে মনে এক ধরনের তীব্র আশংকা বোধ করলনে। সাজ্জাদ চমৎকার ছেলে কিন্তু এই ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকা সবচে' মঙ্গল। এইসব ছেলেদের খুব কাছাকাছি যেতে নেই। এই তথ্য তিনি তাঁর মেয়েকে দিতে চান কিন্তু ভরসা পান না। সাজ্জাদের ব্যাপারে তাঁর মেয়ের ভেতর এক ধরনের ঘোর কাজ করছে। এই ঘোর হঠাৎ করে কাটাতে গেলে সমস্যা হবে। বড় ধরনের সমস্যা হবে।

জাহানারা বললেন, ভেতরে চলে যাও। লীলাবতী বন্ধুদের সঙ্গে ম্যাজিক দেখছে।

'ম্যাজিক হচ্ছে না-কি?'

'হুঁ।'

'ভালই হল, অনেকদিন ম্যাজিক দেখি না। খালা যাই তাহলে, ম্যাজিক দেখি গিয়ে।'

তারা যখন ভেতরে ঢুকল তখন ম্যাজিকপর্ব শেষ হয়েছে। একটা মেয়ে মূকাভিনয় জাতীয় কিছু করছে। নিশ্চয়ই খুব মজাদার কিছু, কারণ সবাই খুব হাসছে। সাজ্জাদকে ঘরে ঢুকতে দেখে লীলাবতী ছুটে এল। মূকাভিনয় থেমে গেল। ছেলেমেয়েরা হাসি হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ায় সাজ্জাদের নিজেরই খারাপ লাগছে। একটু পরে ঘরে ঢুকলেই হত।

সাজ্জাদ বলল, তোমার জন্মদিনে এক বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।

লীলাবতী আতাহারের দিকে না তাকিয়েই বলল, ভাল করেছেন। আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।

'তুমি তো আসতে বললে?'

'আমি তো অনেকবারই আসতে বলি, আপনি আসেন না। তারপরে একবার আমি নিজেই গেলাম। আপনি ঘরে থেকেও বলে পাঠালেন, বাসায় নেই — পার্কে বেড়াতে গেছেন।'

'বুঝলে কি করে ঘরে ছিলাম?'

'দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল, ভাইয়া ঘরে। আমি আপনাদের বসার ঘরে গিয়ে বসলাম, কাজের মেয়ে কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, আপনি পার্কে বেড়াতে গেছেন।'

সাজ্জাদ হেসে বলল, ঘরে বসে থেকেও অনেক সময় পার্কে বেড়ানো যায়। আমার

শরীরটা ঘরে ছিল — মন ছিল পার্কে। তুমি নিশ্চয়ই আমার শরীরের সঙ্গে দেখা করতে যাওনি। দেখা করতে গিয়েছিলে মনের সঙ্গে।

লীলাবতী তাকিয়ে আছে। আতাহার লক্ষ করছে মেয়েটির চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। চোখ পানিতে ভরে উঠতে শুরু করছে। কি আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য ! সে অনেকবার ভেবেছে এই পৃথিবীর অপূর্ব কিছু দৃশ্যের সে একটা তালিকা করবে। যেমন —

১. গরমের দুপুরে মেঝেতে শুধুমাত্র একটা বালিশ পেতে তরুণী শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে। ফ্যনের হাওয়ায় মাথার কিছু চুল উড়ছে।

২. বাচ্চা একটা ছেলের হাত থেকে গ্যাস বেলুন ছুটে গেছে। বেলুনটা আকাশে উঠে যাচ্ছে। ছেলেটা হতভম্ব হয়ে বেলুনটার দিকে তাকিয়ে আছে। কান্না তার বুকের কাছে জমা হয়ে উঠেছে, এখনো গলার কাছে আসেনি।

৩. প্রেমিক-প্রেমিকা রিকশা করে যাচ্ছে। রিকশার হুড খোলা। ছেলেটা ক্রমাগত বক বক করছে, হাত-পা নাড়ছে, মেয়েটা বসে আছে মাথা নিচু করে। তার ঠোঁটের কোণায় চাপা হাসি।

৪. বাচ্চা মেয়ে মায়ের হাইহিল পরে হাঁটার চেষ্টা করছে। এঁকেবেঁকে যাচ্ছে।

৫. একটি তরুণীর চোখ ধীরে ধীরে পানিতে ভরে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সে অবশ্যি কাঁদবে না। চোখের জল চোখেই শুকিয়ে ফেলবে।

৬. স্ত্রী রাতে স্বামীর জন্যে এক কাপ চা নিয়ে এসেছেন। স্বামী বিস্মিত হয়ে বললেন, চা চাইনি তো? তারপর — অতি আনন্দের সঙ্গে চায়ের কাপের জন্যে হাত বাড়ালেন।. . .

লীলাবতীর চোখের কোণে জমে ওঠা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল না। চোখেই মিশে গেল। সে আতাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বসে বসে অরুর পেন্টোমাইম দেখুন, আমি সাজ্জাদ ভাইয়ের সঙ্গে দু'টা কথা বলে আসি। অসম্ভব জরুরী।

লীলাবতী সাজ্জাদকে তার নিজের ঘরে নিয়ে এসেছে। ঘরটা প্রকাণ্ড। এক কোণায় ছোট্ট খাট। জাহানারা তাঁর ছোট্ট মেয়ের জন্যে অর্ডার দিয়ে ছোট্ট খাট বানিয়েছিলেন। সেই মেয়ে বড় হয়েছে। এই খাটে ঘুমুলে তার পা খানিকটা বের হয়ে থাকে। কিন্তু খাট লীলাবতী বদলাবে না, সে তার ছোট্ট খাটেই এখনো ঘুমায়। ঘরে পাশাপাশি দু'টা সোফা। সাজ্জাদ সোফায় বসতে গেল। লীলাবতী বলল, আপনি খাটে বসুন। পা তুলে বসুন।

'কেন?'

'কারণ আমি আপনাকে নাচ দেখাব। আপনি কখনো আমার নাচ দেখেননি। আজ দেখতে হবে। ঘরটা আমি নাচের জন্যে তৈরি করে রেখেছি।'

'ভাল কথা। তোমার এই ঘরে সিগারেট খাওয়া যায়?'

'যায়। তবে এখন খেতে পারবেন না। নাচ শেষ হোক, তারপর খাবেন। যতক্ষণ আমি নাচব, এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।'

'এই রকম সব কঠিন শর্ত মেনে নাচ দেখাটার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমার অনেক দিনের শখ আপনাকে নাচ দেখাব। কাজেই আপনাকে দেখতে হবে। নাচটা আপনার জন্যে হয়ত জরুরী না, আমরা জন্যে জরুরী।'

'কেন?'

'আপনাকে আমি ঠিক বুঝাতে পারব না কেন। নাচ হচ্ছে নিবেদন।'

'সেই নিবেদন তো শরীরের নিবেদন। শরীরের নিবেদন কি স্থূল নিবেদন না?'

'শরীরের নিবেদন কেন বলছেন? মনের নিবেদন বলতে অসুবিধা কি? মনটা চোখে দেখা যাচ্ছে না। শরীরের ছন্দে আমি প্রকাশ করছি আমার মন।'

'তাও তো তুমি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছ না। তোমার শরীর তুমি ঢেকে রেখেছ কাপড়ে। ছন্দ ধরার জন্যে তোমার শরীর দেখতে হবে না?'

লীলাবতী হতভম্ব হয়ে বলল, আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনি খুব কুৎসিত কথা বলছেন?

'কুৎসিত কথা বলছি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে সম্ভবত গাঁজা খেয়ে আসার কারণে বলছি। তোমার এখনো আসার আগে গাঁজা খেয়েছি। যাই হোক, দেখি তোমার নাচ।'

'আপনাকে কিছু দেখতে হবে না। আপনি চলে যান।'

'চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবেন। আপনার বন্ধু থাকুক। আপনার জন্যে আপনার বন্ধুকে বাসা থেকে বের করে দেব তা ঠিক হবে না।'

লীলাবতী কাঁদছে। সাজ্জাদ সিগারেট টানতে টানতে বের হয়ে এল।

আবার ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। জাহানারা বারবিকিউয়ার সরাতে ব্যস্ত। তিনি সাজ্জাদের চলে যাওয়া দেখলেন না।

আতাহার মুগ্ধ হয়ে পেন্টোমাইম দেখছে। অরু মেয়েটা মূকাভিনয় এত সুন্দর করে! আগে সবাই হাসছিল। এখন কেউ হাসছে না। অরু মেয়েটি মূকাভিনয়ের মাধ্যমে একটি দুঃখী মেয়ের জীবন-কাহিনী দেখাচ্ছে।

সাজ্জাদ বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ?

কণা 'না'–সূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু তার চোখে চাপা হাসি। মনে হচ্ছে সে বেশিক্ষণ হাসি চেপে রাখতে পারবে না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

'জ্বি না।'

সাজ্জাদ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ও আচ্ছা। কণা শাড়ির আঁচল গায়ে পেঁচাতে পেঁচাতে বলল, আচ্ছা, আপনে কেমন মানুষ ভাইজান? আপনেরে কেন চিনব না?

'আমি কে বল দেখি?'

'আপনে সাজ্জাত ভাইজান।'

'ও আচ্ছা, যাক, মনে আছে তাহলে?'

'ভাইজান বসেন দেখি।'

কণার ঘরে এসে সাজ্জাদ বেশ অবাকই হয়েছে। সে ভেবেছিল ঘরের সাজসজ্জা বস্তির মত হবে। ব্যাপার তা নয়। সবকিছুই সুন্দর করে গোছানো। পরিষ্কার, ছিমছাম। দু'টা কাঠের চেয়ার আছে। চেয়ারে কুশন দেয়া। একপাশে খাট আছে। খাটে টানটান করে ফুলতোলা চাদর বিছানো। অপ্রত্যাশিতভাবে খাটের পাশে বুকশেল্‌ফ। বেশকিছু বই আছে বুকশেল্‌ফে। বইগুলির নাম পড়া যাচ্ছে না। একটা বই চেনা যাচ্ছে — "বিষাদসিন্ধু।"

সাজ্জাদ বসতে বসতে বলল, তোমার হাসবেন্ড কোথায়? ফার্মেসিতে?

'জ্বি না। তার এই চাকরিও গেছে। সে চাকরির খুঁজে বাইর হইছে।'

'দু'দিন পর পরই কি তার চাকরি চলে যায়?'

কণা খিলখিল করে হাসল যেন এমন মজার প্রশ্ন সে শুনেনি। শাড়িপরা মেয়েরা হাসির সময় মুখে এক পর্যায়ে আঁচল চাপা দেয়। সে দিচ্ছে না। সাজ্জাদের ধারণা হল, কণা জানে তার উচ্ছ্বসিত হাসির আলাদা সৌন্দর্য আছে।

'বুঝলেন ভাইজান, ওর হইছে চুরির অভ্যাস। অষুধপত্র সরায়। পকেটে কইরা প্রত্যেক রাইত দুনিয়ার ট্যাবলেট আনে। তারপরে একদিন ধরা পড়ে। চাকরি নট হয়। আবার চাকরি হয়।'

'চুরির অভ্যাস তুমি দূর করার চেষ্ট কর না?'

'চেষ্টায় কোন ফয়দা নাই ভাইজান। কথায় আছে না — কয়লা ধুইলে না যায় ময়লা।'

'সেটা কয়লার ব্যাপারে সত্যি। মানুষের ব্যাপারে সত্যি না। মানুষ তো কয়লা না।'

'মানুষ কয়লার চেয়েও খারাপ ভাইজান।'

সাজ্জাদ বলল, এস্‌ট্রে আছে কণা ? সিগারেট খাব।'

কণা এস্‌ট্রে এনে দিল। সুন্দর বাহারি এস্‌ট্রে। এ রকম গৃহস্থালিতে এত সুন্দর এস্‌ট্রে থাকার কথা না। কৃস্টেলের মাছ। মাছের পিঠে ছাই ফেলার ব্যবস্থা। কণা বলল, এস্‌ট্রেটা কত সুন্দর, দেখছেন ভাইজান?

'হুঁ সুন্দর।'

'এইটাও চুরির। তার এক দূর সম্পর্কের মামা আছে। বিরাট ধনী। গুলশানে বাড়ি। তার কাছে গেছিল। আসার সময় পকেটে কইরা নিয়া আসছে।'

'বল কি ?'

'এইটা হইল ভাইজান কপাল। কপালে লেখা ছিল — চোর স্বামী। পাইলাম চোর স্বামী। হি হি হি। ভাইজান চা খাইবেন ?'

'চা খাওয়া যেতে পারে।'

'কফিও আছে।'

'কফি আছে ?'

'একটা টিন কিন্যা আনছে — সত্তর টেকা দাম। মাঝে মধ্যে মিজাজ খুব ভাল থাকলে বলে, ও চাঁদের কণা, দেখি কফি বানাও।'

'তোমাকে চাঁদের কণা ডাকে ?'

'একেক সময় একেক নাম। আবার যখন রাগ উঠে তখন ডাকে — বান্দি।'

কণা চা বানানোর জন্যে ভেতরে চলে গেল। সাজ্জাদ চেয়ারে বসে পা নাচাতে লাগল। বাজছে এগারোটা। এই সময় তার অফিসে থাকার কথা। আজ সে অফিস কামাই করেছে। তবে চিঠি পাঠিয়েছে — হাই ফিভারে সে শয্যাশায়ী। অফিস থেকে কেউ দেখতে না চলে এলেই হয়। কণার স্বামীর বাসায় ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু? সে এসে যদি দেখে অপরিচিত একজন লোক তার ঘরে বসে পা নাচাচ্ছে, তখন তার কাছে কেমন লাগবে ? খুব ভাল লাগার কথা না। তবে ভাল না লাগলেও সে চুপ করে থাকবে। বিনীত ভঙ্গিতে কথা বলবে। কণার মত স্ত্রী যে স্বামীর আছে সেই স্বামী ভদ্র ও বিনীত হবে এটা ধরেই নেয়া যায়।

'ভাইজান চা নেন।'

কণা শুধু তার জন্যে চা আনেনি। তার নিজের জন্যেও এনেছে। সাজ্জাদের পাশের চেয়ারে সে বসেনি। বসেছে সামনে মেঝেতে। পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা। বসার ভঙ্গি সুন্দর। এইসব সুন্দর সুন্দর বসার ভঙ্গি নিশ্চয় ছবির মডেল হতে গিয়ে শিখেছে। মোসাদ্দেক সাহেব শিখিয়েছেন।

'চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলে ?'

'জ্বি। আতাহার ভাই নিয়া গেল।'

'তোমার হাসবেন্ড গিয়েছিল ?'

'জ্বি।'

'কোন জন্তুটা দেখে সবচে' মজা পেয়েছ?'

'আমার কাছে ভাল লাগছে হাতি।'

'হাতি দেখার জন্যে তো কেউ চিড়িয়াখানায় যায় না। হাতি তো সব সময়ই দেখা যায়।'

'তারপরেও হাতি দেখতে ভাল লাগে। কি বিরাট জানোয়ার !'

'তোমার স্বামীর কাছে কোন জন্তুটা ভাল লেগেছে?'

'তার এইসব চেৎ-ভেৎ নাই। তার কাছে ইন্দুরও যা, হাতিও তা।'

'তোমার যখন আবার হাতি দেখার ইচ্ছা করবে — আমাকে খবর দেবে — আমি ব্যবস্থা করব।'

'আপনেরে খবর দিব ক্যামনে?'

'একটা কাগজ দাও, আমি টেলিফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি।'

সাজ্জাদ টেলিফোন নাম্বার লিখে উঠে দাঁড়াল। কণা তার পেছনে পেছনে আসছে। সাজ্জাদ বলল, দরজা খোলা রেখে চলে আসছ যে? কণা হাসিমুখে বলল, আর আছেই কি আর নিবই-বা কি?

রাস্তা পর্যন্ত কণা নেমে এল। সে নেমে এসেছে খালি পায়ে, তার জন্যে কোন রকম অস্বস্তিও বোধ করছে না।

'ভাইজান, এইটা আপনের গাড়ি !'

'আমার না, আমার বাবার গাড়ি।'

'কি সুন্দর গাড়ি !'

'পছন্দ হয়েছে?'

'খুব পছন্দ হয়েছে। সুন্দর গাড়ি দেখলে আমার ইচ্ছা করে গাড়িত কইরা সারাদিন ঘুরি।'

'একদিন গাড়ি পাঠিয়ে দেব। সারাদিন ঘুরবে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তোমার চা খুব ভাল হয়েছে। চা'র জন্যে ধন্যবাদ।'

কণা হাসল। সাজ্জাদ বলল, যাই, কেমন?

কণা ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। কণার কিছু ব্যাপার সাজ্জাদের চোখ পড়েছে। যেমন সে যখন চা শেষ করে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন কণা বলেনি, আরেকটু বসে যান। যা মেয়েরা সব সময় করে থাকে। গাড়িতে উঠে সে যখন বলল, কণা যাই? তখনো কণা ঘাড় কাত করে সায় দিয়েছে। বলেনি, আবার আসবেন।

ড্রাইভার বলল, স্যার, কোনদিকে যাব?'

'শহরে কয়েকটা চক্কর দাও।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় কাঠানোর কোন ব্যবস্থা করা দরকার। আতাহার সঙ্গে থাকলে ভাল হত। আতাহার ঢাকায় নেই। দেশের বাড়িতে গিয়েছে। পৈতৃক জমিজমা বিক্রির জন্যে গিয়েছে। কবে আসবে কে জানে।

সুবর্ণের অফিসে যাওয়া যেতে পারে। গনি সাহেবকে ধন্যবাদ দেয়া দরকার। তিনি তার একটা অনুবাদ ছাপিয়েছেন — বেশ ভালভাবে ছাপিয়েছেন। মূল ইংরেজি কবিতা পাশাপাশি ছাপিয়েছেন। এতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলিয়ে পড়ার আলাদা আনন্দ পাঠক পাবে। তিনি ফুটনোটে কিছু কথা বলেছেন। সেই কথাগুলিও সুন্দর। গুছিয়ে লেখা। গদ্যের অনুবাদ এবং কবিতার অনুবাদের পার্থক্য বলতে বলতে তিনি লিখেছেন। গদ্য অনুবাদেও মূলের খুব কাছাকাছি থাকে। এটা গদ্যের সার্বজনিনতাই প্রমাণ করে। পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে — নতুন পৃথিবীতে সার্বজনিন ব্যাপারগুলিই শেষ পর্যন্ত টিকবে। কাজেই এই আশংকা অমূলক নয় — ভবিষ্যতের পৃথিবীতে কবিতা থাকবে না। গদ্য গ্রাস করবে কবিতাকে। "আজি হতে শতবর্ষ পরে" — কেউ কবিতা পাঠ করবে এমন মনে হয় না।

গনি সাহেব অফিসে ছিলেন, সাজ্জাদকে দেখে আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, আরে তুমি? আস আস। তোমার চেহারায় উজ্জ্বল একটা ভাব চলে এসেছে — কি ব্যাপার বল তো?

'চাকরি করছি।'

'ভেরী গুড। একসিলেন্ট। আজকালকার ইয়ং ছেলেমেয়েদের একটা ধারণা হয়েছে কবিতা লিখলে চাকরি-বাকরি কিছু করা যাবে না। পুরোপুরি বোহেমিয়ান হতে হবে। রাতে ঘুমুতে হবে পার্ক করা বাসে। তাড়িফাড়ি খেতে হবে। ওদের বলার চেষ্টা করি — ইয়ং ম্যান, রবীন্দ্রনাথ কবিতা যেমন লিখতেন, পাশাপাশি জমিদারিও দেখাশোনা করতেন। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের বিরোধ নেই। কাব্যচর্চা হচ্ছে সুন্দরের অনুসন্ধান।'

সাজ্জাদ বলল, অসুন্দরের ভেতরও সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

'এইসব ফালতু কথা — এবং বোগাস কথা। মল-মূত্রের ভেতরে সৌন্দর্য নেই। কি খাবে বল. চা না কফি?'

'আপনার বাড়ির সমস্যা কি মিটেছে?'

'কোন সমস্যা?'

'ঐ যে প্রতি বুধবার রাতে বাড়িতে কারা যেন মল-মূত্র ঢেলে আসত।'

'হ্যাঁ, মিটেছে। সিকিউরিটি গার্ড রেখেছিলাম। গার্ড বিদায় করে দিয়েছি। ভাল কথা, সাজ্জাদ, তোমার চারটা অনুবাদের মধ্যে একটা ভাল হয়েছে। শুধু ভাল না, বেশ ভাল। ছেপে দিয়েছি। দেখেছ বোধহয়।'

'জ্বি দেখেছি। থ্যাংক য়্যু।'

'থ্যাংকস দেবার কিছু নেই। জিনিস ভাল হলে ছাপা হবে। বাসায় মল-মূত্র না ঢাললেও ছাপা হবে। মল-মূত্র দিয়ে বাড়ি মাখানোর শিশুসুলভ আচরণ করার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

সাজ্জাদ চুপ করে রইল। টেবিলে চা দিয়ে গেছে। চায়ের সঙ্গে বেলা বিসকিট।

'খাও, চা খাও। যেদিন কাণ্ডটা প্রথম ঘটল আমি ভেবেছিলাম — কালপ্রিট হচ্ছে আতাহার। এর পেছনে তুমি আছ ভাবতে পারিনি। যাই হোক — পাস্ট নিয়ে হৈ চৈ করার কোন মানে হয় না। তবে তোমাদের প্রতি আমার এডভাইস হচ্ছে — গ্রো আপ। শিশু হয়ে থেকো না — গ্রো আপ। তোমরা গ্রো আপ না করলে তোমাদের সৃষ্টিও গ্রো আপ করবে না। সৃষ্টিও শিশু থেকে যাবে। বুঝতে পারছ?'

'জ্বি পারছি।'

'ঐদিন রহমতউল্লাহ এসেছিল, তাকেও বললাম, রহমতউল্লাহ, গ্রো আপ। গ্রো আপ। ইনফেনসিতে আর কতকাল থাকবে? রহমতউল্লাহ ইদানীং ছদ্মনাম নিয়ে লিখছে — "পার্থ সারথী বসু।" আমি বললাম, বাপ-মা রহমতউল্লাহ নাম রেখেছে, রহমতউল্লাহ নামেই লিখবে। পার্থ সারথী বসু লেখার মানে কি? তোমার কি ধারণা, হিন্দু নাম হলে লেখক-লেখক ভাব বেশি ফুটে? না-কি এই নাম বেশি আধুনিক বলে মনে হয়? সে কথা বলে না। তারপর গত শুক্রবারের পত্রিকা খুলে দেখি, সে আমাকে নিয়ে একটা ছড়া লিখেছে। ছড়ার শিরোনাম — "কৃমিভূক"। বুঝলাম, এখনো ইনফেনসিতে রয়ে গেছে।'

সাজ্জাদ বলল, উঠি গনি ভাই।

গনি সাহেব বললেন, না না, উঠবে কেন, বস। তোমরা ইয়াং ব্লাড। তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগে। আতাহার কেমন আছে?

'জ্বি, ভাল আছে।'

ঐদিন নিউমার্কেটের পেছনে যে মার্কেটের মত আছে সেখানে গিয়েছিলাম গ্লাস কিনতে, হঠাৎ দেখি আতাহার। দেখে মনে হল অসুখ-বিসুখ হয়েছে। চোখ-মুখ শুকনা। আমি বললাম, কি হয়েছে তোমার?

সে বলল, "কিছু হয়নি। আমি খুব ভাল আছি। আনন্দে আছি।" তাকে দেখে অবশ্যি মনে হল না সে আনন্দে আছে। অবশ্যি বাংলাদেশ যুবসমাজের জন্যে খুব আনন্দের জায়গা নয়।

'আতাহারের বাবা মারা গেছেন।'

'সে কি! কবে?'

'গত শনিবারের আগের শনিবারে।'

'আতাহার তো আমাকে কিছু বলল না। বলল না কেন?'

গনি সাহেব খুবই বিস্মিত হলেন। দুঃখিত গলায় বললেন, তোমাদের আমি অনেক কঠিন কঠিন কথা বলি। কিন্তু তোমাদের স্নেহ করি। এই স্নেহটাকে তোমরা হয়ত আন্তরিক বলে মনে কর না। আন্তরিক মনে করলে আতাহার তার বাবার মৃত্যু-সংবাদ আমাকে দিত। আমি সাহিত্যের বাইরে সান্ত্বনার দু'-একটা কথাও বলতে পারি। আতাহারের বাসার ঠিকানা কি?

'নতুন বাসার ঠিকানাটা জানি না।'

'বাসা বদলেছে?'

'জ্বি।'

'তুমি তার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তুমি তার নতুন ঠিকানাও জান না? আশ্চর্য তো! অবশ্য তোমাদের ব্যাপারে আশ্চর্য হওয়া ঠিক না। তোমরা অতি অদ্ভুত এক শ্রেণী। অতি অদ্ভুত!'

'অদ্ভুত বলছেন কেন?'

'তোমাদের আচার-আচরণ অদ্ভুত লাগে বলেই অদ্ভুত বলছি।'

'গনি ভাই, উঠি?'

'এই যে তুমি আমাকে গনিভাই বলছ, এটাও কি অদ্ভুত না? আমার বয়স তেষট্টি। মাথায় একটা কাঁচা চুল নেই — আমাকে ভাই বলছ। চাচা ডাকাটাই কি শোভন হত না? পনেরো বছরের চেংড়া ছেলে ঘরে ঢুকে বলে — গনি ভাই, একটা কবিতা নিয়ে এসেছি। কবিতা ছাড়া এম্নি দেখা করতে এলে চাচা ডাকত। হাতে কবিতা তাই — ভাই। এ হল সাহিত্যের ভাই।'

সাজ্জাদ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, চাচা, আজ তাহলে উঠি? আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম।

গনি সাহেব ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

সাজ্জাদ ঠিক করল সে অফিসে ফিরে যাবে। অফিসে গিয়ে বলবে, ঘাম দিয়ে হঠাৎ জ্বর কমে গেল। ঘরে শুধু শুধু শুয়ে থাকার কোন কারণ না থাকায় চলে এসেছি। দেখি ফাইলপত্র কি আছে?

চিড়িয়াখানাতেও যাওয়া যায়। কণা যেমন হাতি দেখে এসেছে সেও গিয়ে হাতি দেখে এল। শিকলে বাঁধা হাতি দেখার ভেতর অন্য ধরনের আনন্দ আছে। হাতিকে বলা যায় — হে শক্তিমান পশু, সহস্র শৃঙ্খলে মুক্তির স্বাদ পাবার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হয়নি। এই ক্ষমতা শুধুমাত্র মানুষের।

অফিসে যাবে, না চিড়িয়াখানায় যাবে, এই দোটানা থেকে সাজ্জাদ মুক্তি পাচ্ছে না। মানিব্যাগে কোন কয়েন নেই যে হেড অর টেইল টস্ করবে। তার হয়ে অন্য কেউ এই সিদ্ধান্তটা নিলে ভাল হত।

ড্রাইভার বলল, স্যার কোনদিকে যাবেন?

সাজ্জাদ বলল, কোনদিকেই যাব না। তুমি গাড়ি নিয়ে চলে যাও। আমি খানিকক্ষণ হাঁটব।

'জ্বি আচ্ছা।'

'আচ্ছা দাঁড়াও। চল, অফিসের দিকে চল।'

সাজ্জাদের ড্রাইভার অন্যসব ড্রাইভারদের মতই রোবট শ্রেণীর। মালিকের অস্থিরতা তাদের স্পর্শ করে না। যা বলা হবে তাই তারা করবে। হুকুমের বাইরে যাবে না। সে বলবে না — গাড়ি রেখে আপনি হাঁটবেন কেন স্যার? বাইরে তো বৃষ্টি হচ্ছে। তেমন জোরালো ভাবে হচ্ছে না তবে জোরালোভাবে শিগগিরই শুরু হবে। আকাশে মেঘ জমছে।

দীর্ঘদিনের ড্রাইভার তার জগৎ সংকুচিত করে ফেলে একটা গাড়ির ভিতর। গাড়ির বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারে না। চাকায় হাওয়া কতটুক আছে? চল্লিশ পিএস আট। পিছনের বাঁদিকের চাকায় মনে হচ্ছে একটু কম। স্টিয়ারিং বদলানোর সময় ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ হচ্ছেছ কেন? সুন্দর সূর্যালোকিত সকাল তাদের মুগ্ধ করে না। তাদের মুগ্ধ করে যখন সামনের রাস্তা থাকে ফাঁকা। গাড়ি চলে শব্দহীন মসৃণ ভঙ্গিতে। সমস্ত পৃথিবীটা চলে আসে চার চাকার সামান্য গাড়িতে।

মানুষের একটা চেষ্টাই থাকে পৃথিবীটাকে ছোট করে ফেলার। কেউ পৃথিবী নিয়ে আসেন তাঁর সংসারে। কেউ তাঁর অফিসে। একজন স্কুল টিচার — তাঁর স্কুলে। এই জন্যেই কি সাধকরা ঘর-সংসার ছেড়ে দেন?

সাজ্জাদ অফিসে ঢুকে পর পর দু'কাপ কফি খেলো। প্রায় দু'টার মত বাজে। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। কফি খাওয়ায় খিদে নষ্ট হয়ে ভোঁতা যন্ত্রণার মত হচ্ছে। সে তৃতীয় আরেক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে দ্রুত একটা দরখাস্ত লিখে ফেলল —

ডিরেক্টর, এডমিনস্ট্রেশন
এরনস ইন্টারন্যাশনাল
ঢাকা।

বিষয় : চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা।

জনাব,
সবিনয়ে নিবেদন। আমার পক্ষে চাকরি করা সম্ভব হচ্ছে না। অফিসের খুঁটিনাটি আমি লিখতে পারছি না, আমার ভালও লাগছে না। যতই দিন যাচ্ছে আমার পৃথিবী ততই ছোট হয়ে আসছে। ভয় হচ্ছে, এক সময় পৃথিবীটা অফিসের এয়ারকুলার বসানো ঘরেই আবদ্ধ হয়ে যায় কিনা। এরকম কোন ভয়াবহ সম্ভাবনার দিকে আমি যেতে চাই না। আমি আমার সমগ্র মানবজীবনে চারটি হলেও ভাল কবিতা লিখে যেতে চাই। তার জন্যে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। কাজেই আমি চাকরি থেকে অব্যাহতি কামনা করছি।

বিনীত
সাজ্জাদ হোসেন

চিঠি শেষ করেই সাজ্জাদ একটা টেলিফোন করল। জনৈকা ভদ্রমহিলা টেলিফোন ধরে বললেন, কে?

সাজ্জাদ বলল, মা, আমি সাজ্জাদ।

কয়েক মুহূর্ত ভদ্রমহিলা কোন কথা বললেন না।

সাজ্জাদ বলল, তুমি কেমন আছ মা?

'ভাল।'

'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করছ না কেন?'

'তুই কেমন আছিস?'

'খুব খারাপ। ভয়ংকর খারাপ। মা, আমি লিখতে পারছি না।'

'কবি-লেখক — এদের তো এমন সমস্যা প্রায়ই হয়। লেখা বন্ধ হয়ে যায়। রাইটার্স ব্লক তো লেখকদের পুরানো ব্যাধি। তুই বরং কোনখান থেকে ঘুরে আয়।'

'আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'তুই বরং একটা বিয়ে-টিয়ে কর — তোর কি কোন পছন্দের মেয়ে আছে?'

'হুঁ আছে।'

'মেয়েটার নাম কি?'

'কণা।'

'কি রকম পছন্দ? বেশ পছন্দ, না মোটামুটি পছন্দ?'

'বেশ পছন্দ।'

'পছন্দ হলে বিয়ে করে ফেল। পাশে সার্বক্ষণিক একজন কেউ থাকলে তোর অস্থিরতা কমবে।'

'মেয়েটিকে বিয়ে করার সামান্য সমস্যা আছে মা।'

'সমস্যা কি?'

'মেয়েটি বিবাহিত।'

'সে কি?'

'তুমি চমকে উঠলে কেন মা?'

'তোর কি মনে হয় না — তুই চমকে ওঠার মত কথা বলেছিস?'

'না। কারণ তুমিও বিবাহিতা ছিলে — বাবাকে এক কথায় ছেড়ে অন্য একজনকে—

সাজ্জাদ টেলিফোন নামিয়ে সিগারেট ধরাল। বেল টিপে তার সেক্রেটারিকে ডেকে বলল, দ্রুত চিঠিটা টাইপ করে নিয়ে আসুন। দশ মিনিটের ভেতর। দশ মিনিটের বেশি এই অফিসে থাকলে দমবন্ধ হয়ে আমি মারা পড়ব।

এই দশ মিনিট কাটানো যায় কিভাবে? মাঝে মাঝে দশ মিনিট অনন্তকালের মত দীর্ঘ হতে পারে। আইনস্টাইন, স্পেশাল থিওরী অব রিলেটিভিটি। টাইম ডাইলেশন। সাজ্জাদের মনে হচ্ছে এই দশ মিনিট আর কাটবে না। এমন কেউ কি তার আছে যার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে ভাল লাগে? লীলাবতী আছে — লীলাবতী। তার টেলিফোন নাম্বারটা যেন কত? মনে পড়ছে না। তার শোবার ঘরের দেয়ালে লেখা। চোখ বন্ধ করে সাজ্জাদ শোবার ঘরের দেয়ালটা দেখার চেষ্টা করল। দেয়াল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু লেখা পড়া যাচ্ছে না।

সাজ্জাদ যখন অফিস থেকে বের হল তখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। সে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এগুচ্ছে। সে বাসায় যাবে না। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে চলে যাবে। ঘোর বর্ষা নেমেছে — এখনো কদম ফুল দেখা হয়নি। কদম গাছের নিচে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আজ সে গাইবে — বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান। সাজ্জাদের গলা ভাল। আশ্চর্য রকম ভাল। গানের চর্চা করলে সে অনেকদূর এগুতে পারত। গান পরাশ্রয়ী বিদ্যা। অন্যের সুর আশ্রয় করে সে বিকশিত হয়। একজন কবি কখনো পরাশ্রয়ী বিদ্যার চর্চা করতে পারেন না।

কবি

হোসেন সাহেব লক্ষ্য করেছেন তিনি যখন খুব আনন্দে থাকেন তখনই বড় বড় নিরানন্দের ব্যাপারগুলি ঘটতে থাকে। মনে করা যাক, তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁর প্রিয় খাবার কই মাছের ঝোল খাচ্ছেন, হঠাৎ দেখা গেল ঝোলের ভেতর মরা একটা মাছি। মাছিটা শুরুতেই দেখেছিলেন, তখন ভেবেছেন পেয়াজের খোসা। শুরুতে পরীক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। আরাম করে বেশ কিছুক্ষণ খাওয়ার পর হঠাৎ চামচ দিয়ে সেই পেয়াজের খোসা পাতে নিয়ে দেখবেন — হাত-পা কুকড়ে একটা মরা মাছি পড়ে আছে। এতক্ষণ তিনি তাড়িয়ে তাড়িয়ে মৃত মাছির রসমাখানো ঝোল খাচ্ছিলেন।

সাজ্জাদের চাকরির পর তিনি মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, পিতা হিসেবে তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন। এখন সত্যিকার অবসর জীবন শুরু করতে পারেন, তখনই দেখলেন সাজ্জাদ অফিসে যাওয়া বন্ধ করেছে। এর মানে কি? তিনি ভেবেছেন ছুটি নিয়েছেন। শরীর খারাপ সেই জন্যে ছুটি। কারণ সাজ্জাদ এই ক'দিন ঘরেই আছে, কোথাও বের হচ্ছে না। শরীর খারাপ বলেই বের হচ্ছে না। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে তাঁর ভয়ভয় লাগছে। জিজ্ঞেস করবেন, সে বলে দেবে, অফিস আর ভাল লাগছে না বাবা। এরচে' না জিজ্ঞেস করাই ভাল। নীতুকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে, সাজ্জাদ অফিসে যাচ্ছে না কেন?

নীতু চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, আমি কি জানি?

'তুই জিজ্ঞেস করিসনি?'

'আমি কেন জিজ্ঞেস করব? তুমি জিজ্ঞেস কর।'

নীতু বেশ কিছুদিন থেকেই তাঁর সঙ্গে ক্যাট ক্যাট করে কথা বলছে। তিনি বুঝতে পারছেন না — হঠাৎ করে তিনি কি সবার কাছে অপ্রিয় হয়ে গেলেন? সেদিন তথ্যমন্ত্রীর বাসায় গেলেন। তাঁর অনেক দিনের পরিচিত মানুষ। ভাবলেন, দেখা করা যাক। সেইজন্য সাক্ষাত। সাজ্জাদের চাকরির খবরটা দেবেন। নীতুর বিয়ে হচ্ছে সেই খবর দেবেন।

তথ্যমন্ত্রীর বাড়িভর্তি মানুষ। সবাই দর্শনপ্রার্থী। মন্ত্রীর পিএ বলল, কি জন্যে দেখা করতে এসেছেন? নাম-ঠিকানা এইসব একটা কাগজে লিখুন।

হোসেন সাহেব বললেন, কিচ্ছু লিখতে হবে না। তুমি গিয়ে বল, হোসেন আলি সাহেব এসেছেন। সেতাবগঞ্জের হোসেন আলি। আর কিছুই বলতে হবে না। নাম শুনলেই ছুটতে ছুটতে আসবে।

'আপনাকে একটু বসতে হবে। ভেতরে এখন ভিজিটার আছে।'

'ঠিক আছে, বসলাম খানিকক্ষণ।'

'আপনার কোন কার্ড থাকলে দিন। ভেতরে পাঠিয়ে দেই।'

'আমার কোন কার্ড নেই। আমি তো আর ছুটকা-ফাটকা বিজনেস করি না যে কার্ড নিয়ে ঘুরব। হা হা হা।'

'কার্ড আজকাল শুধু বিজনেসম্যানরাই রাখেন না — সবাই রাখেন।'

'তুমি রাগ করছ নাকি বাবা? এম্নি বললাম, দেখি একটা কাগজ দাও, আমি নাম-ঠিকানা লিখে দেই। কাগজটা দুলুর হাতে দেবে। ম্যাজিক দেখবে। তোমাদের মন্ত্রীর ডাকনাম দুলু। তোমরা বোধ হয় জান না।'

পিএ গম্ভীর মুখে কাগজ এনে দিল। হোসেন সাহেব সেই কাগজে লিখলেন —

দুলু,

কেমন আছিস?

অনেক দিন খোঁজ নেই। খোঁজ নিতে এলাম।

হোসেন আলি

পিএ নিজেই কাগজ নিয়ে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরই ফিরে এসে বলল, স্যার এখন খুব ব্যস্ত। আপনাকে কিছুদিন পরে আসতে বলেছেন।

হোসেন সাহেব কল্পনাও করেননি এ জাতীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। দুলু কি তাকে চিনতে পারেনি? চিঠিতে তিনি অবশ্যি সেতাবগঞ্জ লিখেননি। তার প্রয়োজন বোধ করেননি। নাকি দুলু লেখায় সে রাগ করেছে? রাগ করার তো কথা না।

হোসেন সাহেব লজ্জিত হয়ে বাসায় ফিরলেন। দুপুরে ভাত পর্যন্ত খেতে পারলেন না। ইদানীং তাঁকে ঘন ঘন লজ্জা পেতে হচ্ছে। সেদিন নীতুর কারণেও খুব লজ্জা পেলেন। যে ছেলেটির সঙ্গে নীতুর বিয়ে হচ্ছে তার কিছু ভাগ্নে-ভাগ্নি নীতুকে নিয়ে চায়নীজ খাবে। সব ঠিকঠাক করা আছে। হোসেন সাহেব নীতুকে টাকা দিয়ে দিলেন, খাওয়া-দাওয়ার পরে বিলটা যেন নীতু দেয়। নীতু টাকা নিল। বিকেলে সে হঠাৎ বলল, সে যাবে না। তার প্রচণ্ড মাথাধরা।

হোসেন সাহেব বললেন, মাথাধরার দু'টা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে থাক। ব্যথা কমে যাবে। এখনো তো দেরি আছে। সাতটার সময় যাবি।

নীতু কঠিন মুখে বলল, আমি যাব না বাবা। তুমি ওদের টেলিফোন করে জানিয়ে দাও।

'যাবি না কেন?'

'বললাম না মাথাব্যথা। তুমি এক্ষুণি ওদের টেলিফোন করে দাও।'

'টেলিফোনটা তুই কর। মাথাব্যথার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল।'

'না, আমি করতে পারব না। তুমি কর।'

'আমার করা কি ঠিক হবে?'

'অবশ্যই ঠিক হবে।'

'আমি টেলিফোন করলে ওরা নানানভাবে চাপাচাপি করতে থাকবে। তুমি করলে তোমাকে কিছু বলতে পারবে না।'

হোসেন সাহেব টেলিফোন করলেন। মাথাব্যথার কথাটা তিনি বলতে পারলেন না। মাথাব্যথা মেয়েদের সহজ এক্সকিউজ। মাথাব্যথার জন্যে কেউ কোন প্রোগ্রামে যেতে পারছে না শুনলেই মনে হয় মিথ্যা কথা। কাজেই তিনি বললেন, নীতু আজ দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হঠাৎ পা মচকে পড়ে গেছে। পায়ে অসম্ভব ব্যথা। তিনি চিৎকার শুনে ভেবেছিলেন পা ভেঙেই গেছে। তবে আসলে ভাঙেনি। হলুদের পুলটিশ লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। সে তো কোনক্রমেই চায়নীজে যেতে পারবে না।

নীতুর কথাই ঠিক। ওরা আর চাপাচাপি করল না। তবে সন্ধ্যাবেলা দল বেঁধে নীতুকে দেখতে চলে এল।

তিনি তখন বারান্দায় বসেছিলেন আর নীতু বাগানে হাঁটাহাটি করছিল। কি ভয়ংকর লজ্জার কথা ! সেই লজ্জা তিনগুণ বাড়িয়ে দিয়ে নীতু তাদের সঙ্গে চায়নীজ খেতে চলে গেল। একা একা বারান্দায় বসে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল — কিছু কিছু মানুষের বোধহয় জন্মই হয় লজ্জা পাবার জন্যে। সারাজীবনে তিনি কতবার লজ্জা পেয়েছেন তার তালিকা তৈরি করলে সেই তালিকার জন্যে দশ–বারো দিস্তা কাগজ লাগার কথা। এর মধ্যে রাশিচক্রের কোন ব্যাপার আছে কি? জন্মতারিখ অনুসারে তিনি মীন রাশির জাতক। এই রাশিতে যাদের জন্ম তারা কি ক্রমাগতই লজ্জা পায়? রাশিচক্রের কিছু বইপত্র এনে পড়তে হয়। খবরের কাগজে রোজদিনকার রাশিফল ছাপা হয় তিনি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েন। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছেন, ভাল ভাল কথা কোনটাই মিলে না। কিন্তু খারাপ কথা সবই মিলে। এও এক রহস্য। এই রহস্য নিয়ে আতাহারের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

আতাহারের সঙ্গে অনেকদিন হল বসা হচ্ছে না। বাবার মৃত্যুর পর সে এ বাড়িতে আসা কমিয়ে দিয়েছে। আর এলেও তাঁর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আতাহারকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি যেসব কথা বলবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন তার কোনটিই এখনো বলা হয়নি। আতাহারের জন্যে তিনি মৃত্যু–বিষয়ে বেশ পড়াশোনাও করেছেন। কোরআন শরীফ থেকে কিছু আয়াত টুকে রেখেছেন। সব গুছিয়ে বলতে হবে। মৃত্যুশোকে কাতর মানুষকে সান্ত্বনা দেয়া কঠিন কর্ম। কোরআন শরীফ থেকে তিনি রহস্যময় একটা আয়াত খুঁজে বের করেছেন। সবশেষে এই আয়াত নিয়েও কথাবার্তা বলা যাবে।

তিনি ঠিক করেছেন, আতাহারকে নিয়ে বাগানে চলে যাবেন। গাছের নিচে বেতের চেয়ার নিয়ে দু'জন মুখোমুখি বসবেন। তিনি বলবেন, আতাহার শোন, মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে অনেক কিছু আছে। তার ভেতর সবচে' রহস্যময় কথাগুলি শোন। সূরা আল–যুকারে বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন —

> "মরণ এলে আল্লাহ প্রাণ নেন,
> যারা মারা যায় না তাদেরও, ওরা যখন ঘুমিয়ে থাকে।
> তারপর যার জন্যে মৃত্যু অবধারিত করেছেন, তিনি তার প্রাণ রেখে দেন।

আর অপরদের এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফিরিয়ে দেন।
এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।"

বুঝতে পারছ কিছু আতাহার — কি রহস্যময় কথা আল্লাহ পাক বলছেন। আল্লাহ "যারা মারা যায় না তাদের প্রাণও নেন যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে।" এর অর্থ কিছু বুঝতে পারছ? গভীরভাবে চিন্তা কর। গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখবে, সব পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। এই জগৎ, এই সংসার যে কি বিশাল মায়া আতাহার — আমরা তা বুঝতে পারি না। বুঝতে পারি না বলেই প্রিয়জনদের মৃত্যুতে কাতর হই। ব্যথিত হই। বরং আমাদের উল্টোটা হওয়া উচিত। মৃত্যু প্রসঙ্গে মহামতি বালজাকের একটা কথাও আমার খুব প্রিয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'Le Pere Goriot' গ্রন্থে বলেছেন — "মৃত্যু আছে বলেই জীবন সুন্দর। মৃত্যু না থাকলে জীবনের মত কুৎসিত আর কিছু হত না।"

আতাহারকে বলার জন্যে তিনি আরো অনেক তথ্য জোগাড় করে রেখেছেন। সে আসছে না। এই ছেলেটিকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তার দুঃসময়ে তিনি কিছু করতে পারছেন না, এটা দুঃখজনক ব্যাপার। তাঁর মনের খুবই গোপন বাসনা — নীতুর সঙ্গে আতাহারের বিয়ে হোক। একদিন তিনি স্বপ্নেও দেখেছেন। নীতুর বিয়ে হচ্ছে — বর আসতে দেরি করছে। সবাই চিন্তিত। গুজব শোনা যাচ্ছে — বর আসছে না। তিনি নিজে দুঃশ্চিন্তায় মারা যাচ্ছেন, এমন সময় আতাহারের সঙ্গে দেখা। সে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে বিয়ের গেট সাজাচ্ছে। তিনি আতাহারকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন — এরকম শুভদিনে তুমি লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বসে আছ? তোমার কি স্বাভাবিক বুদ্ধিও নেই? আতাহার বলল, চাচা, আমার পায়জামা-পাঞ্জাবি ইস্ত্রি করতে দিয়েছি, এখনো আসেনি। গেট সাজানোর কাজটা শেষ করেই আমি পায়জামা-পাঞ্জাবি পরব।

তিনি আরো রেগে গিয়ে বললেন, তুমি গেট নিয়ে ব্যস্ত আর এদিকে শুনছি বর আসছে না। মেয়েরা কান্নাকাটি করছে।

আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, মেয়েরা কান্নকাটি করবে কেন? আমিই তো বর। আমি আলাদা করে আসব কিভাবে? আমি তো এসেই আছি। এই সময় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার পর তিনি বুঝলেন যে, তাঁর গভীর আনন্দ হচ্ছে। আনন্দে তাঁর চোখ পর্যন্ত ভিজে গেল। আর তখনি তাঁর মনে হল এই বিয়ে সম্ভব না। আতাহার নীতুকে ছোটবোনের মত দেখে। তুই-তোকারি করে। নীতু তাকে ঠিক পছন্দও করে না। সব সময় কঠিন কঠিন কথা বলছে। তিনি অনেকবার নীতুকে বলতে শুনেছেন, রোজ রোজ মানুষের বাড়িতে এসে নাশতা খেতে আপনার লজ্জা লাগে না? সকালবেলা ভিখিরীর মত এসে বসে থাকেন। ওদের সঙ্গে আপনার তফাৎ একটাই — ওরা থালা হাতে আসে, আপনি থালা ছাড়া আসেন।

যে ছেলের প্রতি নীতুর এরকম মনোভাব সেই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া ঠিক না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকা দরকার। একজন আরেকজনকে শ্রদ্ধা করবে। তবেই না সংসার সুন্দর হবে। প্রথমে শ্রদ্ধা তারপর ভালবাসা।

এখন যে ছেলেটির সঙ্গে নীতুর বিয়ে হচ্ছে তার প্রতি নীতুর শ্রদ্ধাবোধ কতটুক তিনি

জানেন না। জানতে পারলে ভাল হত। এইসব বিষয় নিয়ে মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর অস্বস্তি লাগে, তবু একদিন তিনি বলবেন। দীর্ঘ একটা বক্তৃতা দেবেন। তিনি এটা নিয়ে ভাবছেন। গভীরভাবেই ভাবছেন।

হোসেন সাহেব বাগানে হাঁটছিলেন। ঘাসগুলি অনেক বড় বড় হয়েছে। কাটা দরকার। মালি বাগানের দেখাশোনা কিছুই করছে না। বর্ষাকালে নাকি বাগানে হাত দিতে নেই। সব গাছ যে রকম আছে সেরকম রেখে দিতে হয়। গাছকে বিরক্ত না করে বর্ষার পানি খাওয়াতে হয়। বাগানের কাজ বর্ষার শেষে। মালির কথা তিনি বিশ্বাস করবেন কি করবেন না বুঝতে পারছেন না। তার কথাবার্তা খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছে না — তবে কথা খুব জোরালোভাবে বলে। হোসেন সাহেব লক্ষ্য করলেন, সাজ্জাদ বেরুচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়েদের ঘর থেকে বের হতে দেখলে ভাল লাগে না। সন্ধ্যা ঘরে ফেরার সময়, ঘর থেকে বেরুবার সময় না। সাজ্জাদ বাবার দিকে তাকাল। হোসেন সাহেব হাসলেন। এত দূর থেকে সাজ্জাদ তার হাসি দেখবে না, তারপরেও অভ্যাসবশে হাসলেন — বুঝানোর চেষ্টা করলেন, আছি, আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। তোমাদের সুসময়ে এবং দুঃসময়ে আছি। হোসেন সাহেব মনে মনে আশা করছিলেন সাজ্জাদ তাকে একা বাগানে হাঁটতে দেখে এগিয়ে আসবে। দু'জনে কিছু কথাবার্তা বলবেন। কথা অনেক বড় ব্যাপার — মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তৈরি হয় কথায়। সাজ্জাদ গেটের কাছে চলে গিয়েছে। হোসেন সাহেবের ইচ্ছা করল গলা উঁচিয়ে ছেলেকে ডাকেন। সাজ্জাদ গেটের কাছে আরো কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত ডাকতেন। সে গেট খুলে দ্রুত বের হয়ে গেল।

নীতু বাসায় নেই। কোন এক বান্ধবীর জন্মদিনে নাকি গেছে। বান্ধবীর বাড়ি উত্তরায়। ফিরতে দেরি হবে। খুব বেশি দেরি হলে সে থেকে যাবে। কে জানে সাজ্জাদও হয়ত রাতে ফিরবে না। এতবড় বাড়িতে রাত কাটাতে হবে একা। আজকের দিনের রাশিফলে লিখেছিল, "অপ্রত্যাশিত আনন্দের ঘটনা ঘটতে পারে। শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা।"

অপ্রত্যাশিত আনন্দের কিছু এখনো ঘটেনি। সম্ভাবনা একেবারে যে শেষ হয়ে গেছে তা না। তিনি আতাহারকে আনার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন যত রাতই হোক গাড়ি আতাহারের জন্যে অপেক্ষা করবে। তাকে সাথে করে নিয়ে আসবে। অনেকদিন ছেলেটাকে দেখা যায় না। সে সন্ধ্যায় চলে এলে তাকে নিয়ে বাজারে যাবেন। নীতুর বিয়ের কার্ড পছন্দ করবেন। এবং আজ তিনি আতাহারকে দামী একটা পাঞ্জাবি কিনে দেবেন। ছেলেটার দু'টা মাত্র পাঞ্জাবি।

আতাহার বসে আছে মনসুর আলির বাড়ির বারান্দায়। তার সামনে চানাচুর এবং চা। চানাচুর দীর্ঘদিনের পুরানো, খেতে টক টক লাগছে। চায়ে চিনি-দুধের পরিমাণ বেশি, খেতে গরম লাচ্ছির মত লাগছে। আতাহার চানাচুর এবং চা দুইই আগ্রহের সঙ্গে খাচ্ছে।

মনসুর আলি বাড়িতে নেই — সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছেন। বাড়িতে খবর দিয়ে

গিয়েছেন — আতাহার এলে যেন বসতে বলা হয়। আর মনসুর আলি তাকে নিয়ে চিত্রনায়িকা মৌ-এর এপার্টমেন্ট হাউসে যাবেন। মৌ আজ সন্ধ্যার পর যেতে বলেছেন।

আতাহার ইস্ত্রি করা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছে। আসার আগে আয়নায় নিজেকে দেখেছে — নিজেকে নায়কের মতই লেগেছে। ভদ্র বিনয়ী মধ্যবিত্ত নায়ক এরকমই হওয়া উচিত। তবে 'জানি দুশমন' ছবির নায়ক কেমন হওয়া উচিত কে জানে। নাম থেকে আন্দাজ করা যায় কংফু কেরাতে পারদর্শী নায়ক। প্রয়োজনে সাব-মেশিনগান বের করে ট্যা ট্যা শব্দে গুলি চালাতে হবে। নায়িকাকে নিয়ে যখন-তখন পার্কে লুকোচুরি খেলতে খেলতে গান ধরতে হবে —

> "ও আমার জান
> তোমাকে দেখে আমার উড়ে গেছে প্রাণ
> আ আ আ
> উ উ উ।"

এইসব জটিল প্রক্রিয়া শিখতে আতাহারের কোন আপত্তি নেই। বরং আগ্রহ আছে। সত্যি সত্যি ছবির জগতে নায়ক হয়ে গেলে কবিতা ছাপানো তার জন্যে সহজ হবে। কে জানে গনি সাহেব নিজেই হয়ত বাসায় চলে এসে বলবেন, এই যে নায়ক, বর্ষ শুরু সংখ্যার জন্যে কিছু দাও। বর্ষ শুরু সংখ্যায় তোমার কবিতা থাকবে না এটা কেমন কথা।

প্রচুর ইন্টারভ্যু তখন ছাপা হবে। প্রশ্নকর্তারা বিচিত্র সব প্রশ্ন করবে। তাদের প্রশ্নের বিচিত্র উত্তর দেয়া যাবে। সেই সব সাক্ষাতকার বিশাল ছবিসহ ছাপা হবে।

প্রশ্ন : আতাহার ভাই, অভিনয় এবং কবিতা এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যমে আপনি কাজ করছেন — আপনার অনুভূতি কি?

উত্তর : নিজেকে প্রথম শ্রেণীর গর্দভের মত লাগছে।

প্রশ্ন : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না — একটু কি ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তর : দু'টি ভিন্ন মাধ্যমে কাজ করা মানে প্রচুর কাজ করা। প্রচণ্ড পরিশ্রম করা। গাধা যা করে। সেই অর্থে বলেছি।

প্রশ্ন : আপনার প্রথম কবিতা লেখার অনুভূতি এবং প্রথম অভিনয়ের অনুভূতি সম্পর্কে কি কিছু বলবেন?

উত্তর : একটিতে পেয়েছি সৃষ্টির অনুভূতি, অন্যটি অনাসৃষ্টির অনুভূতি।

প্রশ্ন : দয়া করে একটু যদি ব্যাখ্যা করেন।

উত্তর : ব্যাখা করতে পারছি না। আমার স্টুডিওতে যাবার সময় হয়ে গেছে। গাড়ি চলে এসেছে। অন্য একদিন আমার সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলে তারপর আসবেন। আমার ব্যস্ততা বুঝতেই পারছেন।

প্রশ্ন : অবশ্যই বুঝতে পারছি। আপনি হচ্ছেন বাংলাদেশের সবচে' ব্যস্ত নায়ক। যাবার আগে আপনি কি দয়া করে "নয়া চিত্র ভুবনের" পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে কোন বাণী দেবেন?

উত্তর : তোমরা ভাল হও।
সুন্দর হও।

প্রশ্ন : খুব সুন্দর বলেছেন আতাহার ভাই। একটু যদি কষ্ট করে লিখে দেন তাহলে অফসেটে প্রিন্ট করে ছাপিয়ে দেব। পাঠক-পাঠিকারা স্বচক্ষে আপনার হাতের লেখা দেখবে। এই একটা বাড়তি পাওনা।

মনসুর আলি আতাহারকে সন্ধ্যা ছ'টার আগেই আসতে বলেছেন। সে এসেছে সাড়ে পাঁচটায়। এখন প্রায় ন'টা বাজতে চলল। নাপিতকে দিয়ে তিনি যদি একটা একটা করে চুলও কাটান তাহলেও এত সময় লাগার কথা না। আতাহারকে দ্বিতীয় দফায় চা দেয়া হয়েছে। চায়ের সঙ্গে ক্রীম বিসকিট। এবারের বিস্কিটগুলিও ভাল, চা-টাও ভাল। আরো ঘণ্টা দুই পরে যদি চা দেয় তাহলে দেখা যাবে সেই চা এর চেয়েও ভাল। চায়ের সঙ্গের নাশতাও ভাল।

মনসুর আলি সাহেবের একতলা বাড়িটা মফঃস্বলের বাড়ির মত। চারদিকে ফাঁকা। মূল বাড়ি থেকে বারান্দা বড় হয়ে এসেছে। শুধু মফঃস্বলের বারান্দায় এত মশা থাকে না — এই বারান্দায় হাজারে-বিজারে মশা। মনে হয় কাছেই কোথাও মশার চাষ হচ্ছে। উন্নত মানের মশা। যাদের শরীর স্বাস্থ্য এবং কামড়াবার শক্তি সবই উন্নত মানের।

বাড়ির ভেতর থেকে ন'-দশ বছরের একটা ছেলে এসে বলল, চাচা, আপনি কি ভিতরে এসে বসবেন?

আতাহার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে এল। সে জানে মশারা এতে বিভ্রান্ত হবে না — তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। তবু এক জায়গায় আর কতক্ষণ বসে থাকা যায়। হাত-পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে। বসার ঘরে কিছু ম্যাগাজিন বা বই-টই থাকতে পারে। বই-ম্যাগাজিন পড়ে যদি সময় কিছুটা কাটে। আতাহার ঠিক করে রেখেছে সে ঠিক এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যাতে মনসুর আলি সাহেব পরবর্তী সময়ে তাকে বলতে না পারেন — আরে, তুমি হুট করে চলে যাবে? সামান্য দু'-তিন মিনিট অপেক্ষা করতে পারলে না? তোমরা এত ব্যস্ত — ব্যস্ততার জন্যেই কিছু হয় না।

মনসুর আলি সাহেব এলেন রাত দশটা কুড়ি মিনিটে। আতাহারকে বসে থাকতে দেখে তিনি অবাকও হলেন না, অস্বস্তিও বোধ করলেন না। স্বাভাবিক গলায় বললেন, আতাহার শোন — আমার সঙ্গে ম্যাডামের কথা হয়েছে। উনার বাড়ি থেকেই এখন আসছি। ম্যাডাম এই রোল নতুন কাউকে দিতে চন না। পুরানো কাউকে দিয়ে করাতে চান। উনার পছন্দের একজন আছে, বুঝতেই পারছ, ম্যাডামের কথামত কাজ করতে হবে। ময়না ভাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। উনি হয়ত মনে করছেন আমি কোন চেষ্টা করিনি। এটা ঠিক না, চেষ্টা করেছি। তবে তোমার কথা মনে থাকবে। তুমি তোমার ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখে যাও। কোন ব্যবস্থা হলে খবর দেব।

আতাহার বিনীত ভঙ্গিতে বলল, জ্বি আচ্ছা।

'চা-টা কিছু খেয়েছ আতাহার?'

'জ্বি।'

মনসুর আলি গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, কুহু, একটা কাগজ আর কলম দাও।

কুহু কাগজ আর বলপয়েন্ট দিয়ে গেল। সেই বলপয়েন্টে লেখা হয় না। আতাহার সেই কলমেই তার নাম-ঠিকানা লিখল। কেউ পড়তে পারবে না। তাতে কি? তার লেখার কথা, সে লিখল। অদৃশ্য কালিতে নাম লিখে আতাহারের মনটা ভাল লাগছে। কেন লাগছে তা সে জানে না। সে হেঁটে হেঁটে রওনা হল হাসপাতালের দিকে।

আশ্চর্য, পথে নামতেই আতাহারের মাথায় পঙতি ওড়াউড়ি করতে লাগল। এরকম তো কখনো হয় না।

টেবিলের চারপাশে আমরা ছ'জন।
চারজন চারদিকে ; দু'জন কোনাকুনি
দাবার বোড়ের মত
খেলা শুরু হলেই একজন আরেকজনকে খেয়ে ফেলতে উদ্যত।
আমরা চারজন শান্ত, শুধু দু'জন নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে।
তাদের স্নায়ু টানটান।
বেড়ালের নখের মত তাদের হৃদয় থেকে
বেরিয়ে আসবে তীক্ষ্ণ নখ।
খেলা শুরু হতে দেরি হচ্ছে,
আম্পায়ার এখনো আসেনি।
খেলার সরঞ্জাম একটা ধবধবে সাদা পাতা
আর একটা কলম।
কলমটা মিউজিক্যাল পিলো হাতে হাতে ঘুরবে
আমরা চারজন চারটে পদ লিখব।
শুধু যে দু'জন নখ বের করে কোনাকুনি বসে আছে
তারা কিছু লিখবে না।
তারা তাদের নখ ধারালো করবে
লেখার মত সময় তাদের কোথায়?
প্রথম কলম পেয়েছি আমি,
আম্পায়ার এসে গেছেন।
পিস্তল আকাশের দিকে তাক করে তিনি বললেন,
এ এক ভয়ংকর খেলা,
কবিতার রাশান রোলেট —
যিনি সবচে ভাল পদ লিখবেন
তাকে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেলা হবে।
আমার হাতের কলম কম্পমান
সবচে সুন্দর পদ এসে গেছে আমার মুঠোয়।

কবি

মদিনা বলল, আফা, উনি আইছে।

মদিনা নীতুদের নতুন কাজের মেয়ে। আঠারো-উনিশ বছর বয়স। বিয়ে হয়েছিল, স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। এত সুন্দর একটা মেয়েকে স্বামী তাড়িয়ে দিল কেন নীতু বুঝতে পারে না। সকালে ঘুম থেকে উঠে সুন্দর একটা মুখ দেখলেই তো মনটা ভাল হয়ে যাবার কথা। মদিনা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ির আঁচল এমনভাবে মুখের উপর টেনে ধরে আছে যে মুখ ভাল দেখা যাচ্ছে না। টানা টানা সুন্দর চোখ শুধু দেখা যায়।

নীতু বলল, উনিটা কে?

'কামাল ভাইজান।'

'ও আচ্ছা — বসতে বল, আমি আসছি।'

মদিনার মুখ থেকে শাড়ির আঁচল সরে গেছে। এবার তার মুখ পুরোটা দেখা যাচ্ছে। শাড়ির আঁচলে সে এতক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিল কেন তাও বোঝা যাচ্ছে। ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে। মেরুন রঙের লিপস্টিকটা পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন বোঝা যাচ্ছে লিপস্টিকটা কোথায়।

'আফা, উনারে চা দিমু?'

'দাও।'

মদিনা চলে যাচ্ছে। তাকে কঠিন কঠিন কিছু কথা শোনানো দরকার। কাজের মেয়ে ঠোঁটে গাঢ় করে লিপস্টিক দিয়ে ঘুরবে কেন? চুরির ব্যাপারটা তো আছেই। সুন্দর একটা মেয়ে যদি আরো সুন্দর হতে চায় তাতে রাগ করা যায় না। কাজের মেয়ে সুন্দর হতে পারবে না, সাজতে পারবে না এমন তো কোন কথা নেই।

নীতু ভুরু কুঁচকে বসে রইল। তার খুব মেজাজ খারাপ লাগছে। কামাল এসেছে বলে কি মেজাজ খারাপ? হতে পারে। এই মানুষটাকে দেখলেই তার মেজাজ খারাপ হয়। আশ্চর্য, এমন একটা মানুষকে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে যার নাম শুনলেই তার বিরক্তি লাগে। নীতু ঘড়ি দেখল, সাতটা বাজে, সন্ধ্যা এখনো হয়নি। তার আসার কথা সন্ধ্যার পর। তারা দু'জনে একটা রেস্টুরেন্টে খেতে যাবে। বিয়ে করতে এসেছ বিয়ে কর। দু'দিন পরে পরে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-খাওয়ি কি? লোকটা সুন্দর করে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। ঐদিন রেস্টুরেন্টে গিয়ে বেয়ারাকে আঙুলের তুড়ি বাজিয়ে ডাকছিল। বেয়ারা শুনেও না শোনার ভান করল। তখন সে হ্যালো হ্যালো করে ডাকতে লাগল। হ্যালো হ্যালো

করছিস কেন? এটা কি টেলিফোন?

লোকটির সব কথাবার্তা নীতুদের বিষয়সম্পত্তি এবং টাকাপয়সা নিয়ে। আশ্চর্য, এটা কথা বলার কোন বিষয়? জগতে কথা বলার কত প্রসঙ্গ আছে। চুপচাপ বসে থেকেও তো রাজ্যের কথা বলা যায়। সেদিন রেস্টুরেন্টে খেতে বসে নীতুর লজ্জার সীমা রইল না। কামাল বলল, তুমি দেখি কিছুই খাচ্ছ না।

নীতু বলল, আমার খিদে নেই। আপনি খান।

'আমি তো খাচ্ছিই। পয়সা দিয়ে কিনেছি, খাব না মানে? চিকেনটা তো ভাল হয়েছে। বেশ ভাল।'

নীতু আতংকিত চোখে দেখল, লোকটা কড়মড় শব্দে মুরগির রান চিবাচ্ছে। তারচেয়েও ভয়াবহ ব্যাপার ঘটল যখন সে নীতুর থালা থেকে মুরগীর মাংস তুলে নিতে নিতে বলল, নষ্ট করে লাভ নেই। কি বল?

নীতু কিছু বলল না। মাথা নিচু করে রইল। সে মুখভর্তি মাংস নিয়ে বলল, গুলশানে তোমাদের একটা বাড়ি আছে না?

নীতু বলল, জ্বি।

'কয় কাঠার জমি বল তো?'

'আমি ঠিক জানি না।'

'সে কি! নিজের বিষয়সম্পত্তির হিসাব জান না?'

'এইসব বাবা দেখেন।'

'উনি তো দেখবেনই। তবে উনি তো আর সারাজীবন বেঁচে থাকবেন না। তখন তোমাদেরই দেখতে হবে। গুলশানে তোমাদের ঐ বাড়ি কি ভাড়া দেয়া?'

'জ্বি।'

'ভাড়া কত আসে জান?'

'জ্বি না।'

'অনেক টাকা ভাড়া আসার কথা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর একটা সুবিধা হয়েছে। গুলশান এলাকা জাতে উঠে গেছে। ডিপ্লোমেটিক জোন। বড় বাড়িগুলি এক লাখ দেড় লাখ টাকায় ভাড়া হচ্ছে।'

'ও।'

'গ্রামে তোমাদের প্রপার্টি কেমন আছে?'

'প্রপার্টির কথা জানি না। তবে গ্রামে আমাদের খুব সুন্দর একটা দোতলা বাড়ি আছে। সামনে পুকুর।'

'কে থাকে সেখানে?'

'কেউ থাকে না। শীতের সময় মাঝে মাঝে আমরা বেড়াতে যাই।'

'এটা তো ঠিক না। লোকজন না থাকলে বারভূতে লুটেপুটে খাবে।'

'বাবা ঠিক করেছেন গ্রামের বাড়িটা মেয়েদের স্কুল করার জন্যে দিয়ে দেবেন।'

'কেন? নিজেদের একটা বাড়ি — মাঝে-মধ্যে ছুটি কাটাতে যাবে, এর আলাদা

একটা চার্ম আছে না? বসতবাড়ি স্কুলে দেবার পেছনে তো কোন যুক্তি নেই। এই বাড়ি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে স্কুল হবে সে হিসেবে বানানো হয়নি। তাছাড়া স্কুল-কলেজ এইসব সরকারি সেক্টারে হওয়া উচিত। প্রাইভেট সেক্টারে না। সবই যদি প্রাইভেট সেক্টারে হয় তাহলে সরকার করবে কি? সরকারেরও তো কিছু করতে হবে। তাই না?'

'জ্বি।'

'চুপচাপ বসে থাকলে তো হবে না। এইসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। তোমার বাবা তো এইসব নিয়ে ভাবেন না — তোমার বড় ভাইও না। একজন কাউকে তো ভাবতে হবে।'

'আপনি ভাবুন।'

নীতুর হাসি পাচ্ছিল। কি আশ্চর্য মানুষ! বিয়ের আগেই শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তির চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। বিয়ের পর কি হবে কে জানে? বাবা ভাল স্বামীই তার জন্যে জোগাড় করেছেন। নীতুর ধারণা, বিয়ের এক বছরের মাথায় লোকটা উঠে-পড়ে লাগবে বিষয়সম্পত্তি নিজের নামে লেখাপড়া করিয়ে নিতে।

নীতু নিচে নেমে এল। সে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চুল বেঁধেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়েছে। আয়নায় নিজেকে দেখে চমকে উঠেছে — মনে হচ্ছিল ড্রাকুলার দূর সম্পর্কের কোন বোন বসে আছে। যে কিছুক্ষণ আগেই রক্ত খেয়ে এসেছে। সেই রক্তের খানিকটা ঠোঁটে লেগে আছে। নীতু রুমাল দিয়ে ঠোঁটের লিপস্টিক মুছে ফেলল। এখন নিজেকে লাগছে মরা মানুষের মত। মনে হচ্ছে সে তিনদিন আগে মারা গেছে, তাকে বারডেমের মরচুয়ারিতে রাখা হয়েছিল, আজ বের করে আনা হয়েছে। রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়ার পর আবার তাকে বারডেমে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

কামাল হাত-পা ছড়িয়ে ঘরোয়া ভঙ্গিতে বসে আছে। তাকে দেখতে সুন্দরই লাগছে। খুব হালকা খয়েরি শার্টে তাকে ভাল মানিয়েছে। আজেবাজে পুরুষদের চেহারা সবসময় সুন্দর হয়। কামাল বলল, তোমার বাবা কোথায়?

'উনি ছোট চাচার বাসায় গেছেন।'

'উনি থাকলে গুলশানের বাড়ির ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতাম। তোমাকে জেনে রাখতে বলেছিলাম — জাননি মনে হয়।'

'জেনেছি। তের কাঠা জমির উপর বাড়ি।'

'বল কি! ১৩ কাঠা — এ তো অনেক জমি, গোল্ড মাইন।'

'ভাড়া কত পাচ্ছ?'

'পঁচিশ হাজার।'

'কি পাগলের মত কথা বল? তের কাঠা জমির উপর যে বাড়ি তার ভাড়া মাত্র ২৫ হাজার?'

'বাড়িটা ছোট, বেশির ভাগই ফাঁকা জায়গা।'

'তোমরা যা করছ তা রীতিমত ক্রাইম।'

'চলুন যাই।'

কামাল বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়াল। আর তখনি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল আতাহার। সে বিস্মিত মুখে বলল, পেত্নী সেজে কোথায় যাচ্ছিস?

নীতুর চোখে পানি এসে যাবার মত হল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছি আতাহার ভাই।

'রেস্টুরেন্টে খেতে যাচ্ছিস। একটু সুন্দর-টুন্দর হয়ে যা। তোকে দেখে মনে হচ্ছে ডেডবডি। তুই খেতে বসবি আর দেখবি রাজ্যের মাছি তোর মাথার উপর ভনভন করছে। তোকে ডেডবডি ভাবছে।'

নীতু বলল, আতাহার ভাই, আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি — উনি কামাল আহমেদ।

আতাহার লজ্জিত গলায় বলল, ও, আচ্ছা আচ্ছা। ভাই, আপনার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে নিয়ে কিছু রঙ্গ-রসিকতা করলাম। দয়া করে কিছু মনে করবেন না। আপনার চেহারা সুন্দর, সেটা চাচাজানের কাছে শুনেছি — কিন্তু আপনি যে ছদ্মবেশী রাজপুত্র তা কেউ বলেনি।

কামাল সরু চোখে তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। নীতু বলল, আতাহার ভাই, বাসায় তো কেউ নেই।

'কোন অসুবিধা নেই। আমি বারান্দায় বসে এক কাপ চা খেয়ে যাব।'

'বারান্দায় বসে চা খেতে হবে না। ঘরে বসেই খান। আমি বলে দিয়ে যাচ্ছি।'

'শুধু চা যেন না দেয় — খিদেয় মারা যেতে বসেছি।'

গাড়িতে উঠতে উঠতে কামাল বলল, ভদ্রলোক কে?

নীতু বলল, ভাইয়ার বন্ধু।

'খুব আসা-যাওয়া নাকি?'

'হুঁ।'

'করেন কি?'

'কিছু করেন না — বাউন্ডেলে।'

এইসব বাউন্ডেলে ছেলেপুলেদের বেশি প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। তোমার সঙ্গে যেসব কথা বলল, খুবই অবজেকশন্যাবল।'

নীতু হাসল। কামাল বলল, হেসো না — এই টাইপটা হল সুযোগ-সন্ধানী টাইপ। সুযোগের জন্য বড়লোক বন্ধুদের পেছনে পেছনে ঘুরবে। চামচাগিরি করবে।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। উনি বিরাট চামচা।'

'একেবারেই প্রশ্রয় দেবে না। প্রশ্রয় দিলেই এরা মাথায় উঠে পড়ে। পেত্নীর মত দেখাচ্ছে, ডেডবডি, মাছি ভনভন করবে — এইসব কি ধরনের কথা? রসিকতারও তো সীমা থাকবে?

রেস্টুরেন্টে খেতে বসেও কামাল আবার আতাহারের প্রসঙ্গ তুলল। গম্ভীর মুখে বলল, আতাহার সাহেবের পারিবারিক অবস্থা কি?

'পারিবারিক অবস্থা খুব খারাপ।'

'খুব খারাপ মানে কি?'

'উনার বাবা মারা গেছেন। মা হাসপাতালে। উনি তাঁর ভাইবোনদের নিয়ে তাঁর এক মামার বাসায় থাকেন।'

'এই অবস্থা?'

'হ্যাঁ, এই অবস্থা।'

'এরা ধান্ধাবাজ হবেই। এরা বড়লোক বন্ধুদের পেছনে নানান ধান্ধা নিয়ে ঘুরবে। খুব সাবধান। খুব সাবধান।'

'আমি সাবধানই আছি।'

'আসলে এদের বাড়িতে ঢুকতে দেয়াই উচিত না। তুমি যে একে বাড়িতে রেখে চলে এলে, কাজটা ঠিক করনি।'

'বাবা উনাকে খুব পছন্দ করেন।'

'তা তো করবেনই। মানুষকে খুশি করার যাবতীয় কায়দা-কানুন এরা জানে। ওরা এটা করে নিজেদের সারভাইবেলের জন্যে। পরগাছা মনোবৃত্তি।'

নীতু হাসল। কামাল নীতুর হাসি পছন্দ করল না। বিরক্ত মুখে বলল, হাসবে না নীতু। হেসে হেসে আমরা বিপদে পড়ি। যখন ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, আমাদের হাসি শুধু তখনি বন্ধ হয়।

'এইসব মানুষের সাইকোলজি আপনি এত ভাল করে জানেন কি ভাবে?'

'মুখ দেখলেই বোঝা যায়।'

'আপনি কি মুখ দেখে অনেক কিছু বুঝে ফেলেন?'

'কিছুটা তো বুঝতেই পারি।'

'আমার মুখ দেখে আমাকে আপনার কেমন মনে হয়।'

'তোমার মুখ দেখে তোমাকে খুব অসাবধানী মেয়ে বলে মনে হয়।'

'আপনি ঠিক বলেছেন। আমি আসলে খুব অসাবধানী। এর জন্যে মাঝে মাঝে কি সব ভয়ংকর বিপদে যে পড়ি! একবার . . .'

'একবার কি?'

'না থাক। আতাহার ভাই একবার আমাকে ভয়ংকর বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। সেই গল্পটা আমি বলতে চাচ্ছি না।'

'না বল, আমার শোনার দরকার।'

'আপনার শোনার দরকার নেই।'

'অবশ্যই আমার শোনার দরকার।'

'বলতে আমার লজ্জা লাগছে।'

'আমার কাছে তোমার লজ্জা পাবার কিছু নেই — তুমি বল। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে লজ্জা লাগলে অন্যদিকে তাকিয়ে বল।'

নীতু খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা বানানো গল্প শুরু করল। কেন হঠাৎ

সে এই কাজটা করল সে নিজেও জানে না। তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি করা গল্পে অনেক ফাঁকফোকর থাকে, তার গল্পে তা ছিল না। গল্পটা সে খুব আগ্রহ নিয়ে বলছে —

"গত বৎসরের কথা। সন্ধ্যাবেলা ছাদের চিলেকোঠায় আমি ভাইয়ার জন্যে চা নিয়ে গিয়েছি। আপনি বোধহয় দেখেননি ছাদে ভাইয়ার একটা ঘর আছে। যাই হোক, আমি চা নিয়ে গেলাম। ঘরটা অন্ধকার। ভাইয়া চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমি ডাকলাম। এই ভাইয়া, উঠ, চা নে। ভাইয়া চাদর সরাল — আমি দেখি আতাহার ভাই।'

'সে কি ! সে এখানে কি করছে?'

'আতাহার ভাই প্রায়ই আমাদের বাড়িতে ঘুমিয়ে থাকে। সে যে দুপুরে এসে ছাদের চিলেকোঠায় শুয়েছিল, আমি জানি না। যাই হোক, আমি বললাম — ভাইয়া কোথায়? আতাহার ভাই বললেন — জানি না কোথায়। চায়ের কাপটা রেখে কাছে এসে বস তো। আমি বসলাম।'

'তুমি বসলে কেন?'

'বসব না কেন? উনাকে তো আমি সব সময় নিজের ভাইয়ের মত দেখেছি। যাই হোক, উনি তখন আমার গালে হাত দিয়ে বললেন — তোর গাল ফোলা ফোলা লাগছে কেন? মামস হয়েছে।?'

'মামস হয়েছে মানে?'

'কয়েকদিন আগে সাজ্জাদ ভাইয়ের মামস হয়েছিল। বড়দের মামস হলে খুব কষ্ট হয়। আমি ভাবলাম, আতাহার ভাই সত্যি সত্যি আমার মামস হয়েছে কিনা দেখছেন।'

'তুমি তো দেখি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোকাদের একজন।'

'হতে পারে। যাই হোক, আমি বললাম, আতাহার ভাই, আপনি চা খান। আমি চললাম। উনি বললেন, না, তুই বসে থাক আমার পাশে — বলেই এক হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না।'

'কামাল হতভম্ব গলায় বলল, ঘটনাটা তো এখানেই শেষ হবার কথা না। তারপর কি?'

নীতু খাবার খেতে শুরু করল। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে মাছের টুকরা মুখে দিতে দিতে বলল — মাছটা দেখতে খারাপ হলেও খেতে ভাল হয়েছে।

কামাল বলল, তুমি তো কিছুই বললে না।

'বললাম তো।'

'আসল ঘটনা তো কিছু বলছ না। তুমি চিৎকার করে উঠলে?'

'শুধু শুধু চিৎকার করব কেন?'

একটা লোক তোমার কোমর জড়িয়ে ধরে বসে আছে, তুমি চিৎকার করবে না?'

'চিৎকার করাটা লজ্জার ব্যাপার হত না? লোক জানাজানি হত।'

'লোকটা আর কি করল?'

নীতু চুপ করে রইল। কামাল হতভম্ব গলায় বলল, তোমাকে চুমু খেয়েছে?

'উঁ।'

'উঁ-টা কি? হ্যাঁ না না?'

'বাদ দিন না।'

'বাদ দেব মানে?'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন এইসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ আছে? ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে।'

'এটাকে তুমি ছোট দুর্ঘটনা বলছ?'

'আচ্ছা, বেশ বড় দুর্ঘটনাই — বড় দুর্ঘটনাও কারো কারো জীবনে ঘটে। কি আর করা! আচ্ছা শুনুন — ম্যান্ডারিন ফিস আমি আর খেতে পারছি না। আপনি আমার প্লেট থেকে নিয়ে নিন। খাবার নষ্ট করে লাভ কি?'

কামাল চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। বেচারার জন্যে নীতুর এখন একটু মায়া লাগছে। আহা বেচারা — গল্পটা পুরো বিশ্বাস করে বসে আছে।

কবি

সালমা বানু চোখ মেলে একজন অপরিচিত মানুষকে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। আজকাল প্রায়ই অপরিচিত লোকজন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। কথা বললে এরা কথার জবাব দেয় না। কিছু কিছু মানুষের চেহারা থাকে বিকৃত। এদের দেখলে ভয় ভয় লাগে। এরা বোধহয় মানুষ না — পৃথিবীতে মানুষের বেশ ধরে অনেকেই ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই একজন। আয়াতুল কুরসি পড়ে ফুঁ দিলে এরা চলে যায়। কিংবা হাততালি দিলেও কাজ হয় — হাততালির শব্দ যতদূর যাবে এরা তত দূরে সরে যাবে। এক সময় তাঁর আয়াতুল কুরসি মুখস্থ ছিল। রাত-বিরাতে ভয় পেতেন — সূরা পড়তেন, ভয় কাটতো। এখন স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়ে গেছে। কিছুই মনে থাকে না।

'কেমন আছ মা?'

অপরিচিত লোকটা তাকে মা ডাকছে কেন?

'কি ব্যাপার মা, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না!'

সালমা বানু খুব লজ্জা পেলেন। আতাহার দাঁড়িয়ে আছে। কি সুন্দর ইস্ত্রি করা পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেছে। গায়ে সেন্ট দিয়েছে না-কি? মিষ্টি গন্ধ আসছে।

'মা, আজকাল নাকি তুমি কাউকে চিনতে পারছ না?

'পারছি তো।'

'উহুঁ, চিনতে পারছ না। বল তো আমি কে?'

'তুই বটু।'

'আচ্ছা যাক, পাস মার্ক দেয়া গেল। চিনতে পেরেও এমন অদ্ভুতভাবে তাকাচ্ছিলে কেন?'

সালমা বানু বললেন, বোস।

আতাহার বসতে বসতে বলল, চোখে কাজল দিয়েছ নাকি? চোখগুলো সুন্দর লাগছে।

'ভাত খেয়েছিস বটু?'

'না।'

'হাসপাতালের ভাত খাবি?'

'খাব। হাসপাতালে আজ কি রান্না মা?'

'জানি না। ঐ যে ট্রেতে খাবার ঢাকা দেয়া আছে। আমার সামনে বসে বসে খা। আমি

দেখি।'

আতাহার বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে খেতে বসে গেল। তার ভাল খিদে পেয়েছে। খিদের কারণেই হয়ত হাসপাতালের খাবার খেতে তেমন খারাপ লাগছে না। একটা ভাজি। চড়ুই পাখির রানের সাইজের একটা মুরগীর রান, ডাল।

'তোমাদের রান্না তো মা খারাপ না।'

সালমা বানু আনন্দিত ভঙ্গিতে হাসলেন। অনেকদিন পর পরিবারের একজনকে তিনি তাঁর সামনে খেতে দেখলেন।

'বাসার খবরাখবর কি বল তো বটু?'

'খবরাখবর ভাল।'

'ঐ দিন তোর বাবা এসে এমন হৈ-চৈ শুরু করেছে, আমি লজ্জায় বাঁচি না।'

আতাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্মিত গলায় বলল, বাবার কথা কি বললে মা?

'কি বললাম?'

'বাবা এসে খুব হৈ-চৈ করেছেন। বাবা মারা গেছেন সেটা তো মা তুমি জান। জান না?'

'হুঁ জানি।'

'তোমার কি মনে থাকে না?'

'মনে থাকবে না কেন?'

'মা শোন, তোমার ভাবভঙ্গি ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে — তুমি পাগল-টাগল হবার চেষ্টা করছ। ছেলেরা পাগল হলে মানায়, মেয়েরা পাগল হলে মানায় না।'

'তোর যে কি অদ্ভুত কথাবার্তা! পাগলের আবার মানামানি কি?'

'তোমার লজিক তো মা ঠিকই আছে। ভেরী গুড। মতির মা কোথায়?'

জানি না।'

'তোমাকে একা ফেলে গেল কোথায়?'

'একা ফেলে যায়নি তো — তুই তো আছিস।'

'আমি তো আর সারারাত থাকব না। চলে যাব।'

'আরেকটু থাক।'

'মতির মা না আসা পর্যন্ত থাকব। চিন্তা করার কিচ্ছু নেই।'

'সংসার কিভাবে চলছে?'

'সংসার কিভাবে চলছে তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না মা। সংসার খুব ভালমত চলছে।'

'তোর বাবা যেভাবে মুখ-টুখ কালো করে আমার খাটের পাশে বসে থাকে তা থেকে তো মনে হয় সংসার চলছে না।'

'আবার বাবাকে কোত্থেকে নিয়ে এলে?'

সালমা বানু খুবই লজ্জা পেলেন। তাই তো, বার বার তিনি একই ভুল করছেন। এই

জাতীয় ভুল করা ঠিক না। মৃত মানুষ কখনো ফিরে আসে না। স্বপ্নে দেখা দিতে পারে — কিন্তু বাস্তবে কখনো না।

হাসপাতাল থেকে বেরুতে বেরুতে রাত বারোটা বেজে গেল। আগে এত রাতে বাসায় ফেরার সময় ভয়ে আত্মা শুকিয়ে যেত। বাবা বারান্দায় বসে থাকতেন। তিনি দরজা খুলে দিতেন। তারপর বড় ধরনের ভূমিকম্প হত। রেকটার স্কেলে যে ভূমিকম্পের মাপ হল সাত পয়েন্ট পাঁচ।

এখন দরজা খুলে দেয় মিলি। সে কিছুই বলে না। রশীদ সাহেবের মৃত্যুর পর তার মধ্যে কিছুটা জবুথবু ভাব চলে এসেছে। সংসারের কাজকর্মেও এলোমেলো ভাব চলে এসেছে। কয়েকদিন আগে মাছ, ডাল, আর ভাজি রান্না করে সবাইকে খেতে ডেকেছে। প্লেট নিয়ে বসার পর মিলি লজ্জিত গলায় বলেছে — ভাত তো রান্না হয়নি। এরকম ভুল কেউ করে !

মিলির বিয়ের কথা হচ্ছে। এই মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে। মনিকা দূর থেকে সব ব্যবস্থা করেছে। ছেলে আমেরিকায় থাকে— গ্রীন কার্ড পেয়েছে। যার সঙ্গে বিয়ে হবে সেও আমেরিকা যেতে পারবে।

মনিকা লিখেছে —

মিলি,

বাবার মৃত্যুতে সংসার যে ভেঙে পড়েছে তা আমি দূর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আতাহার, ফরহাদ দুটা অপদার্থ। কোনদিন সংসার দেখবে না। তোকে সে দেখেশুনে বিয়ে দেবে সেই আশায় গুড়েবালি। তোকে তোর নিজের পথ নিজেকেই দেখতে হবে।

আমি তোর জন্যে বর ঠিক করেছি। আহামরি কিছু না। আমাদের ভাগ্যে আহামরি কিছু জুটবে এটা মনে করাও ভুল। ছেলের একমাত্র যোগ্যতা সে আমেরিকায় বাস করে।

আমাকে ভাবী ডাকে এবং খুব মানে। ক্যাব চালায়। টেক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে বিয়ে এটা ভেবে মুখ বাঁকিয়ে বসবি না। বাংলাদেশের ট্যাক্সি ড্রাইভার আর আমেরিকার টেক্সি ড্রাইভার এক না।

ছেলের স্বভাব-চরিত্র ভাল। তবে তার আগে একবার বিয়ে হয়েছিল। আমেরিকান এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কনট্রাক্ট ম্যারেজ। বিয়ের পর গ্রীন কার্ড পেয়েছে। এখন ডিভোর্স নিয়ে যে যার পথ দেখেছে। আমি তোকে সবকিছু খোলাখুলি লিখলাম। এখন তোর বিবেচনা।

আমার পরামর্শ নিলে এই বিয়েতে রাজি হওয়া তোর জন্যে মঙ্গলজনক হবে। তুই তোর মতামত অতি দ্রুত আমাকে জানাবি। যদি হ্যাঁ হয়, তবে ছেলে এসে বিয়ে করে তোকে নিয়ে চলে যাবে। চট করে তোকে ভিসা দেবে না। কামাল

বলেছে, সে তোকে প্রথম সুইডেন নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আমেরিকা আনবে। তোকে বলতে ভুলে গেছি। ছেলের নাম কামাল। ওর কয়েকটা ছবি পাঠালাম।

মা'র শরীর আরো খারাপ করেছে শুনে খুব ভয় পাচ্ছি। মা'রও ভালমন্দ কিছু হয়ে যাবে না তো! বিপদ আসতে শুরু করলে আসতেই থাকে। এদিকে তোর দুলাভাই আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছে যে, তুই কল্পনাও করতে পারবি না। ঐ দিন ব্রেকফাস্টের টেবিলে গরম কফির কাপ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল। কপাল কেটে রক্তারক্তি। গালও পুড়েছে। এইসব কথা লিখতেও লজ্জা লাগে।

বাবার মৃত্যুর খবর শুনে তার মাথায় প্রথম ঢুকেছে সংসার চালানোর জন্যে তোরা তার ফ্ল্যাট বিক্রির টাকা খরচ করে ফেলবি।

আশ্চর্য মানুষের মন — কত ছোট হয়! আমি তাকে বললাম, তোমার টাকা তারা খরচ করবে কিভাবে? টাকা তো তোমার একাউন্টে।

যাই হোক, বাসার যাবতীয় খবর জানাবি। মা'র চিকিৎসার খরচ কোত্থেকে আসছে, সংসার কিভাবে চলছে — এইসব আমার জানা দরকার। জেনেও কিছু করতে পারব না।

তুই ভাল থাকিস। বিয়ের ব্যাপারে মত থাকলে আমাকে জানাবি।

ইতি তোর মনিকা আপু

পুনশ্চ – ১ : পঞ্চাশ ডলার পাঠালাম। এই টাকা দিয়ে এতিমখানায় বাবার নাম করে এক বেলা খাবার ব্যবস্থা করবি।

পুনশ্চ – ২ : তোর চিঠিতে দেখলাম — বড় মামা সবাইকে তাঁর বাড়িতে উঠার পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শটা ভাল। তোর তো বিয়েই হয়ে যাবে। থাকছে শুধু ফরহাদ আর আতাহার। মা'র যা অবস্থা শুনছি তাঁকে বাকির খাতায় লিখে রাখাই ভাল। ফরহাদ আর আতাহার মামার বাসায় থাকলে ওদের হুঁশ হবে। আতাহার নিশ্চয়ই চক্ষুলজ্জায় পড়ে চাকরি–বাকরির চেষ্টা করবে। তোরা রাজি হয়ে যা। বড় মামাকে আমি পৃথক পত্র দিয়েছি।

বাসার সামনের রাস্তায় গনি সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, গনিভাই আপনি? কোথায় যাচ্ছিলেন?

গনি সাহেব বললেন, কোথাও যাচ্ছিলাম না — তোমার খোঁজেই এসেছি।

আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, আমার খোঁজে?

'হ্যাঁ তোমার খোঁজে। তোমাকে তো আবার রাত বারোটার আগে এলে পাওয়া যায় না।'

'ব্যাপার কি?'

'তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছি। তোমার বাবা মারা গেছেন এই খবর তুমি

আমাকে দাও নাই — আমার মনটা খারাপ হয়েছে। আমি সাজ্জাদের কাছে বাসার ঠিকানা চাইলাম — সে তোমার ঠিকানা জানে না — এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? ঠিকানা অবশ্য আরো আগেই জোগাড় হয়েছে — আমি পড়ে গেলাম অসুখে। ফ্লু জ্বর — একশ চার-পাঁচ পর্যন্ত উঠে। আতাহার, আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন — আসুন, ভিতরে আসুন।'

'মধ্যরাতে গৃহস্থের বাড়িতে যেত নেই। গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আমি আধুনিক মানুষ হলেও এইসব আবার মানি। এটা ধর।'

'এটা কি?'

'তেমন কিছু না — তোমার একটা কবিতা ছেপেছি। ভাবলাম নিজের হাতে দিয়ে আসি। জোছনা নিয়ে তুমি যে কবিতাটা লিখেছ — সেটা হয়েছে। আর ধর, এই খামটা রাখ — একশ' টাকা আছে। সম্মানী।'

'গণিভাই, ঠিক করে বলুন কবিতা ছাপা হয়েছে?'

'হ্যাঁ হয়েছে। কবিতাটা পড়ার পরই হঠাৎ আমার জোছনা দেখার ইচ্ছা করল — তখন বুঝলাম তুমি পেরেছ।'

আতাহার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে রেখেছে। একটা খুব হাস্যকর ব্যাপার হয়েছে — তার চোখে পানি এসে গেছে। তার বড়ই লজ্জা লাগছে।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'কবিতা নিয়ে আমি অনেক বড় বড় কথা বলি, বক্তৃতা দেই — আমি নিজে কিন্তু লিখতে পারি না। আমি যে জিনিসটা পারি না — তোমরা পার — তখন একই সঙ্গে আনন্দ হয় — আবার ঈর্ষাও হয়।

'আপনি কখনো লেখার চেষ্টা করেননি।'

'কে বলেছে করিনি? যাই আতাহার।'

'আসুন আপনাকে একটু এগিয়ে দেই।'

'আস। রাস্তা নির্জন — তুমি বড় রাস্তা পর্যন্ত আমার সঙ্গে চল।'

দু'জন নিঃশব্দে হাঁটছে। এত দীর্ঘ সময় গণি সাহেব কখনো চুপচাপ থাকেননি। আতাহারের হঠাৎ করে এই মানুষটাকে খানিকটা তার বাবার মত লাগল। রশীদ সাহেবও নিঃশব্দে হাঁটতেন। হাঁটার সময় তাঁর মাথাটা নিচু হয়ে থাকতো — যেন তিনি ফুটপাতের সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আছেন। জগতের সব রূপ ফুটপাতে দেখে ফেলেছেন। এর বাইরে তাঁর আর কিছু দেখার নেই।

কবি

কণা আজ অবেলায় গোসল করেছে। দুপুরে খুব খিদে লেগেছিল। বাজার হয়নি বলে রান্না হয়নি। চা বানিয়ে চা খেল। খিদে নষ্ট করার জন্যে অতিরিক্ত চিনি দেয়া চা খুব ভাল। এক কাপ চা খেলেই খিদে নষ্ট হয়ে যায়। সে পুরো এক গ্লাস খেয়ে ফেলল। এতে তার খিদে নষ্ট হয়ে গেলো ঠিকই কিন্তু গা গুলাতে শুরু করল। গা গুলানোর এই রোগ তার নতুন হয়েছে। প্রায়ই গা কেমন কেমন করে। হঠাৎ হঠাৎ কোন কোন গন্ধ তীব্র হয়ে নাকে বাঁধে। সমস্ত শরীর ঝাঁ–ঝাঁ করতে থাকে। এমনকি ঘরবাড়ি পর্যন্ত দুলতে শুরু করে। এইসব লক্ষণ ভাল লক্ষণ না। তাদের জন্যে তো নয়ই। মিজান নতুন কোন চাকরি জোগার করতে পারেনি। প্রাণপণে খুঁজছে। পাচ্ছে না। তবে পেয়ে যাবে। দু'মাসের বেশি চাকরি ছাড়া অবস্থায় সে কখনো ছিল না। দু'মাস কোনমতে কাটানো নিয়ে কথা।

সময় খারাপ। খারাপ সময়েই পৃথিবীতে শিশুরা আসে। তাদের শিশুও খুব একটা খারাপ সময় বেছে নিয়েছে। তাদের এখন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শিশুটার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। মিজানের সঙ্গে খোলাখুলি কথা হওয়া প্রয়োজন। মিজানকে পাওয়াই যাচ্ছে না। অনেক রাত করে এত ক্লান্ত হয়ে ফিরে যে, কিছু বলতে ইচ্ছা করে না। বেশিরভাগ সময় না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাকে ঝামেলায় ফেলতে মায়া লাগে।

এম্নিতেই ঝামেলার শেষ নেই — তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। এই সমস্যা কণা নিজেই সামাল দিয়েছে। কানের দুলজোড়া বিক্রি করেছে। আট আনা সোনার দুল। খাদের জন্যে তিন আনা কেটেছে। টাকা যা এসেছে তাতে টারে টারে বাড়ি ভাড়া হয়ে অল্প কিছু বেঁচেছে। সেই টাকায় কণা তিন প্যাকেট ডানহিল সিগারেট কিনে এনে হরলিক্সের কৌটায় মুখ বন্ধ করে রেখেছে। সিগারেট ড্যাম্প হয়ে গেলে খেয়ে কোন মজা নেই। মিজান মাঝে–মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠে বলে — ঘরে কোন সিগারেট আছে?

'ঘরে সিগারেট থাকবে কোথায়? ঘরতো আর দোকান না।'

তখন মিজান বলে — একটু খুঁজে–টুজে দেখ তো টুকরা–টাকরা কিছু পাওয়া যায় কি–না।

টুকরা পাওয়া গেলেও তাতে লাভ হয় না। মিজান সিগারেট এমনভাবে খায় যে ফিল্টার পর্যন্ত পুড়ে যায়। এখন সিগারেট চাইলে সে হরলিক্সের কৌটা খুলে দিতে পারবে। সিগারেট চাচ্ছে না। বাড়িতে ফিরে মিজান যা করে তা হচ্ছে — ভোস ভোস করে ঘুমায়। তার শরীরও খারাপ করেছে। পায়ে পানি এসেছে। পা ফুলে থাকে। আঙ্গুল

দিয়ে চাপলে ফোলা ডেবে যায়। গর্ভবতী মেয়েদের পায়ে পানি আসে। সেই হিসেবে তার পায়ে পানি আসার কথা। মিজানের পায়ে কেন আসবে? ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করানো দরকার। তা সে করাবে না। নিজের চিকিৎসা নিজেই করবে। অসুধের দোকানে যারা কাজ করে তারা কিছুদিনের মধ্যেই ডাক্তার বনে যায়। নিজেই নিজের এবং আত্মীয়স্বজনের চিকিৎসা করে। কিছু বললে চোখ সরু করে বলে, ডাক্তার কি আমার থেকে বেশি জানে?

কণা তার বর্তমান শারীরিক সমস্যার কথা বলার চেষ্টা করেছে। মিজান শুনেও শুনেনি। যেমন কণা বলল, প্রতিদিন সকালে আমার বমি বমি হয় — কি হয়েছে বল দেখি? আমার মনে হয় ভিটামিনের অভাব।

মিজান উত্তর দেয়নি। হাই তুলেছে।

'আমাকে একটা ভিটামিন এনে দাও না।'

'আচ্ছা দিব।'

'অন্য কিছু না তো?'

মিজান আবারো হাই তুলে বিছানায় শুতে চলে গেছে। এমনও হতে পারে যে, ব্যাপার কি তা সে ভালই জানে। জেনেও চোখ বন্ধ করে আছে। নিজের সমস্যা নিয়ে কণা নিজেই ভাবে। এই সময়ে বাচ্চা–কাচ্চা সংসারে আনাটা কি ঠিক হবে? একবার মনে হয় — মোটেই ঠিক হবে না। খুব বড় ভুল হবে। বাচ্চার খাবার জুটানো যাবে না। অসুখ-বিসুখ হলে চিকিৎসা করতে পারবে না। এরচে' এই ভাল। ঝাড়া হাত–পা। এই যেমন — আজ দুপুরে খাওয়া নেই, সে বড় গ্লাসে করে এক কাপ চা খেয়ে দিন পার করে দিল। ছোট বাচ্চা তো তা করবে না।

কাজেই সবচে' ভাল বুদ্ধি হচ্ছে বাচ্চা নষ্ট করে ফেলা। বাচ্চা নষ্ট করা আজকাল কোন ব্যাপারই না। সরকারি ফ্যামিলি প্ল্যানিং হাসপাতালে গিয়ে বললেই হয়। টাকাপয়সা কিছু লাগে না। ডাক্তাররা হাসিমুখে এমআর করেন। যে হাসপাতালে যত বেশি বাচ্চা নষ্ট করা হয় সেই হাসপাতালের তত নাম। দেশে ফ্যামিলি প্ল্যানিং হচ্ছে। জনসংখ্যা কমছে।

আগেও একটি বাচ্চা কণা নষ্ট করেছে। নষ্ট না করে তার উপায় ছিল না। সেবার ছিল ভয়াবহ অবস্থা। চুরির দায়ে পুলিশ মিজানকে ধরে নিয়ে গেছে। মেরে নাক–মুখ দিয়ে রক্ত বের করে দিয়েছে। মামলা কোর্টে ওঠেনি। গ্রীন ফার্মেসির মালিক পুলিশকে শুধু বলে দিয়েছিলেন — শক্ত মারধোর যেন করে, যাতে জন্মের শিক্ষা হয়ে যায়। যেখানে না বলতেই পুলিশ মারে সেখানে বলে দিলে কি অবস্থা তা তো বোঝাই যায়। মার খেয়ে মিজানের এমন অবস্থা হল, লোকজন চিনতে পারে না। কণাকে পর্যন্ত চিনতে পারে না। কণা তাকে হাজত থেকে আনতে গিয়েছে — সে বলল, কেমন আছেন, ভাল? বাসার সবাই ভাল?

কথা শুনে কণার হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে যাবার জোগাড় হল। লোকটা তাকে 'আপনে' 'আজ্ঞে' করছে কেন? 'বাসার সবাই ভাল?' — এই প্রশ্ন করছে কেন? বাসার সবাই মানে

কি? বাসার সবাই বলতে তো তারা দু'টিমাত্র প্রাণী। মিজান সেবার খুব ভুগেছে। দীর্ঘদিন কেটেছে বিছানায়। নিজে নিজে হেঁটে বাথরুমে যেতে পারে না। ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। এই অবস্থায় বাচ্চা-কাচ্চার কথা চিন্তাই করা যায় না। কাজেই এক সকালবেলা কণা ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্লিনিকে উপস্থিত হল। ডাক্তার খুব সন্দেহজনক ভঙ্গিতে বলল, বাচ্চা নষ্ট করে ফেলতে চান?

'হুঁ।'

'কেন?'

'বাচ্চা পালতে পারব না, এই জন্যে।'

'আপনি একা বললে তো হবে না। আপনার স্বামীকেও বলতে হবে। দু'জনে মিলে ফরম ফিলআপ করতে হবে। বিয়ের কাবিননামা আনতে হবে। আপনার স্বামী কোথায়?'

'সে বিছানায়। তার শরীর খারাপ।'

'আসতে পারবে না?'

'এখন পারবে না। কিছুদিন পরে পারবে।'

'তাহলে আপনি বরং কিছুদিন পরে আপনার স্বামীকে নিয়ে আসুন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

কণা চলেই আসছিল, কি মনে করে ডাক্তার তাকে বসতে বললেন। তার এক ঘণ্টার মধ্যে এমআর করে দিলেন।

অপারেশন টেবিলে কণা হাউমাউ করে কিছুক্ষণ কেঁদে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে বাসায় ফিরল। যে বাচ্চাটি পৃথিবীতে আসতে গিয়েও আসতে পারেনি, তার কথা ভেবে এখনো সে মাঝে মাঝে কাঁদে। বিশেষ করে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয় — বাচ্চাটা বেঁচে থাকলে তার এখন তিন বছর বয়স হত। দু'জনের মাঝখানে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে ঘুমাতো। ঘুমের মধ্যে ফিরিশতারা এসে বলতো — এই, তোর মা'কে রাক্ষস নিয়ে গেছে। সে তখন হাসত। কারণ সে এক হাতে তার মায়ের চুল ধরে আছে। সে জানে, ফিরিশতারা মিথ্যা কথা বলছে। ঘুমের মধ্যে বাচ্চারা যখন হাসে তখন তাদের কি সুন্দর যে লাগে! আর যখন ঘুমের মধ্যে কাঁদে তখন কি কষ্ট লাগে! তবে সেই কষ্টেরও আনন্দ আছে। কণার ভাগ্যে সেই আনন্দ এবং আনন্দমাখা কষ্ট লেখা নেই।

এবারের বাচ্চাটাকেও কি নষ্ট করে ফেলতে হবে? মিজান বললে তো করতেই হবে। অবশ্যি বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে — রিজিকের মালিক আল্লাহ্। তিনি এই বাচ্চার উছিলায় তাদের সংসারে আয়-উন্নতি দেবেন। আল্লাহ্ পারেন না এমন জিনিস তো নেই। মুসকিল একটাই — অভাবী মানুষ খুব আল্লাহভক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ তাদের সমস্যা সমাধান করে দেবেন এটা কেন জানি বিশ্বাস করে না।

অবেলায় গোসল করে কণার কেমন জানি লাগছে। বার বার শরীর কেঁপে উঠছে। জ্বর আসছে কি-না কে জানে। সে ভেজা শাড়ি বারান্দায় শুকুতে দেবার জন্যে এসেছে। বারান্দায় এসেই তার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তার সবচে' ভাল লাগে গাড়ি দেখতে। গাড়ির ভেতর বসে সুখী মানুষরা কি সুন্দর হুসহাস করে চলে যায়। এরা

নিশ্চয়ই কোনদিন বাড়ি ভাড়া নিয়ে চিন্তা করে না। বাজার হবে কি হবে না এইসব নিয়ে চিন্তা করে না। অভাবে পড়ে এরা পেটের শিশু নষ্ট করে দেয় না।

কণা হঠাৎ লক্ষ্য করল, আতাহার যাচ্ছে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে হন হন করে এগুচ্ছে। তার বাসার দিকে সে আসছে, হ্যাঁ, সেই সম্ভাবনা একেবারে যে নেই তা না। রাস্তা পার হবার জন্যে এদিক-ওদিক দেখছে। সোজাসুজি হাঁটতে থাকলে বোঝা যেত কণার কাছে আসবে না। রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছে বলেই মনে হয় এদিকে আসবে। কণা আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই মানুষটাকে তার ভাল লেগেছে। এর মনে কোন ঝামেলা নেই। বেশিরভাগ পুরুষ মানুষের মনেই নানান ঝামেলা থাকে। তাদের বাড়িওয়ালার বয়স ষাটের মত। চুল-দাড়ি সব পেকে সাদা ধবধব করছে। এই লোকের মনেও কত 'ঝামেলা'। বাড়িভাড়া নিয়ে দরবার করতে এসেছে, এমন সময় এসেছে যখন মিজান নেই। চোখের দৃষ্টি কি? যেন চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছে। এতক্ষণ থাকল, এত কথা বলল — একবারের জন্যেও বুড়ো তার চোখ কণার বুকের উপর থেকে সরালো না। কণার একবার মনে হয়েছিল — আহা বেচারা! যা দেখতে চাচ্ছে — দেখিয়ে দি। শখ মিটে যাক। দু'দিন পর তো মরেই যাবে।

আতাহার বারান্দায় আসতেই কণা বলল, আতাহার ভাই, আপনার জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি।

'বুঝলে কি করে আমি আসছি?'

বারান্দায় শাড়ি শুকানোর জন্যে আসছি, তারপর দেখি আপনি। রাস্তা পার হতে এত সময় নিলেন। আমি দেখি, দাঁড়িয়ে আছেন তো দাঁড়িয়েই আছেন।'

'রাস্তা পার হতে আমার খুব ভয় লাগে। রাস্তাগুলিকে আমার নদীর মত মনে হয়। আমার নদী বরাবর যেতে ভাল লাগে কিন্তু নদী পার হতে ইচ্ছা করে না।'

'আপনি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলেন।'

'সবার সঙ্গে বলি না।'

'কাদের সঙ্গে বলেন?'

'যারা অদ্ভুত কথাগুলির অর্থ বুঝতে পারে না তাদের সঙ্গে বলি। যারা বুঝতে পারে কখনো তাদের সঙ্গে বলি না।'

'কথাগুলির অর্থ কি?'

আতাহার হাসল। কণা বলল, অর্থ আমাকে বলবেন না?'

'না।'

'আসেন, ঘরে আসেন।

'তোমার স্বামী কোথায়?'

'চাকরি খুঁজছে।'

'ফিরবে কখন?'

'অনেক রাতে ফিরে।'

'তোমার শরীর খারাপ নাকি কণা? চোখ-মুখ শুকনা লাগছে।'

কণা হাসল। কেন হাসল সে নিজেও জানে না। আতাহার ঘরে ঢুকে পরিচিত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসেছে। কণা বলল, চা খাবেন?

আতাহার বলল, খুব দ্রুত বানালে খাব। আমি এখানে পাঁচ মিনিটের বেশি বসব না। একটা কাজে এসেছি, কাজটা সেরে চলে যাব।

কণা বিস্মিত হয়ে বলল, আমার সঙ্গে আবার কি কাজ?

'সাজ্জাদ কোথায় আছে তুমি কি জান?'

কণা আরো অবাক হয়ে বলল, উনি কোথায় আছেন আমি কি করে জানব?

'ও তো তোমার কাছে প্রায়ই আসে।'

'দুইবার আসছেন।'

'শেষবার কবে এসেছে বল তো?'

'দিন-তারিখ তো মনে নাই, ধরেন দশ দিন।'

'তারপর আর আসেনি?'

'জ্বি না।'

'তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না, কি বলব?'

'এসে কি করল?'

'চা খেয়েছেন, তারপর চলে গেছেন। বেশিক্ষণ বসেন নাই।'

'ও আচ্ছা।'

'উনার কি হয়েছে?'

আতাহার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে আমার ধারণা। ও তোমাকে বিয়ে করতে চায়।

কণা তাকিয়ে আছে। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে না সে খুব বিস্মিত হয়েছে। দুঃখ-কষ্টে বড় হওয়া মেয়েরা জীবনে অনেক বিচিত্র এবং ভয়ংকর ঘটনার মুখোমুখি হয় এত অল্পতে তারা বিস্মিত হয় না।

'এই জাতীয় কথা সে তোমাকে বলেনি?'

'জ্বি না।'

'যাই হোক, আমাকে বলেছে। আমি তোমাকে আগেভাগে জানিয়ে রাখলাম।'

'উনি আপনার সঙ্গে মজাক করেছে।'

'ও মজাক করার ছেলে না। সে যা করে খুব ভেবে-চিন্তে করে।'

কণা চা বানাতে বসেছে। মাঝে মাঝে কৌতূহলী চোখে আতাহারকে দেখছে। হঠাৎ সে মাথা নিচু করে হাসল। আতাহারের চোখে এই দৃশ্য গাঁথা হয়ে গেল। তার কাছে মনে হল — মানুষের সৌন্দর্য আশেপাশের সবকিছু নিয়ে। মানুষ কখনো একা একা সুন্দর হয় না।

'কণা!'

'জ্বি।'

'আমার ধারণা তুমি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই সমস্যা তুমি নিজেই সামাল দিতে পারবে। তোমার স্বামীকে কিছু বলার দরকার নেই।'

'জ্বি আচ্ছা। ভাইজান আপনারে এমুন পেরেশান লাগতেছে কেন?'

'সারাদিন হাঁটাহাটি করি এই জন্যে পেরেশান লাগে।'

আতাহার উঠে দাড়াল। সে কোথায় যাবে বুঝতে পারছে না। সাজ্জাদের বাসায় যাওয়া দরকার। হোসেন সাহেব বার বার খবর পাঠাচ্ছেন। যেতে ইচ্ছা করছে না। সেখানে যাওয়া মানেই এক গাদা উপদেশ শোনা। সান্ত্বনার বাণী শোনা। অন্যকে সান্ত্বনা দিতে মানুষ এত ভালবাসে কেন কে জানে?

'কণা উঠি?'

'ভাইজান আরেকটু বসেন। এই এক মিনিট।'

'কেন?'

'আপনার সাথে কথা বলতে বড় ভাল লাগে ভাইজান।'

আতাহার বসল। রূপবতী নারীদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে নেই। প্রত্যাখান করলে অভিশাপ লাগে। রূপের অভিশাপ। রূপ তখন ধরা দেয় না। একজন কবির উপর রূপের অভিশাপ পড়া ভয়াবহ ব্যাপার।

আরেক কাপ চা দেই ভাইজান?

আতাহার অন্যমনস্ক গলায় বলল, দাও। সে মনে মনে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কণা তুমি এত সুন্দর কেন?

কবি

হোসেন সাহেব নিজেকে মনে মনে 'ইডিয়ট' বলে গালি দিলেন। এরচেয়েও কোন খারাপ গালি দিতে পারলে ভাল হত। খারাপ গালি মাথায় আসছে না। আতাহার তার সামনে বিনীত ভঙ্গিতে চুপচাপ বসে আছে। তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে যে সব কথাবার্তা তিনি ভেবে রেখেছিলেন তার একটাও মনে পড়ছে না। মাথা পুরোপুরি শূন্য। 'বুক অব কোটেশন' থেকে মৃত্যুর উপর তিনটা কোটেশন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। তিনটার একটাও মনে আসছে না। স্মৃতিশক্তি মনে হচ্ছে পুরোপুরি গেছে। কিছুদিন পর হয়ত ছেলেমেয়েদের নামও মনে পড়বে না। এদেরকে ডাকতে হবে — 'এই যে' 'এই যে' বলে।

আতাহার বলল, চাচা, আপনি আমাকে খোঁজ করছিলেন?

'এম্নি খোঁজ করছিলাম -- অনেকদিন তোমাকে দেখি না। তোমার স্বাস্থ্যটাও খারাপ হয়েছে।'

'চুল কাটিয়েছি তো, এইজন্যেই খারাপ দেখাচ্ছে।'

'ভেরী ট্রু — চুল কাটালে ছেলেদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। আমি যতবার চুল কাটাতাম, তোমার চাচী রাগ করতেন। শেষে একবার ঠিক করলাম আর চুলই কাটাব না। বাবড়ি চুলের মত হয়ে গেল। মাথায় উকুন হল। তোমার চাচী তাতেই খুশি। মেয়েরা নিজেরা চুল লম্বা রাখে তো, এইজন্যে পুরুষদের চুলও লম্বা দেখতে পছন্দ করে।'

'জ্বি, তাই হবে।'

'তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদে খুবই দুঃখিত হয়েছি আতাহার। যদিও মৃত্যু হচ্ছে একটা শ্বাশত ব্যাপার। একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। আমরা যে বেঁচে আছি এটাই একটা মিরাকল।'

'জ্বি।'

হোসেন সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, তিনটা কোটেশনের একটা মনে পড়েছে। একটা যখন মনে পড়েছে তখন অন্য দু'টাও মনে পড়বে।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'মৃত্যু প্রসঙ্গে মহাকবি মিল্টনের একটা কথা আছে — আমার কাছে খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কবি মিল্টন বলেছেন —

"Death is the golden key
That opens the palace of eternity."

কথাটা অদ্ভুত না আতাহার?'

'জ্বি অদ্ভুত।'

'আবার কবি বায়রণ বলেছেন —

"Heaven gives its favourites — early death."

আতাহার বলল, সব কোটেশন আপনার মুখস্থ নাকি চাচা?

হোসেন সাহেব আনন্দিত গলায় বললেন, এক সময় ছিল। স্মৃতিশক্তি ভাল ছিল, যা পড়তাম মনে থাকত। এখন স্মৃতিশক্তি পুরোপুরি গেছে। একটা জিনিস একশবার পড়লেও মনে থাকে না।

'এত কিছু মনে রাখার দরকারই বা কি?'

'এটাও ঠিক বলেছ। ভুলে যেতে পারাই ভাল। যে মানুষ কোন কিছু ভুলতে পারে না, সে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।'

'চাচা, আজ উঠি?'

'বোস বোস, এখনি উঠবে কি? রাতে আমার সঙ্গে ডাল–ভাত খাও। বাসায় কেউ নেই, নীতু গেছে কামালের সঙ্গে। রেস্টুরেন্টে খাবে। কামালের সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছে?'

'জ্বি, একদিন দেখলাম।'

'ছেলেটাকে তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল। খুব ভাল। খুব সুন্দর চেহারা।'

'কথাবার্তা কেমন মনে হল?'

'উনার সঙ্গে কথা তেমন কিছু হয়নি।'

'কামালের কথাবার্তা তেমন ইয়ে না— কমার্শিয়াল ধরনের কথা। ওর বড় ভাই এসেছিল, বিয়ের খরচ চায়।'

'ও।'

'আমার মনটা খুব খারাপ হয়েছে। বিয়ের আগেই যদি এত টাকা টাকা করে, বিয়ের পরে কি হবে — চিন্তার কথা না?'

'চিন্তার কথা তো বটেই।'

'এদিকে পত্রিকা খুললেই দেখি যৌতুকের জন্যে খুন। যতবার দেখি, আঁৎকে উঠি।'

'আঁৎকে ওঠারই কথা।'

'নীতুর জন্যে আসলে তোমার মত একটা ছেলে দরকার ছিল।'

'চাচা, ছেলে হিসেবে আমি থার্ড ক্লাসেরও নিচে ফোর্থ ক্লাস। পরের বাড়ির গুদামে শুয়ে থাকি।'

হোসেন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, গুদামে শুয়ে থাক মানে কি?

'আমরা এখন বড় মামার সঙ্গে থাকি। উনার একটা গুদাম আছে নয়া বাজারে। সেখানে ম্যানেজার থাকে আর আমি থাকি।'

'বল কি? তোমার মা, ভাই-বোন তারা কোথায় থাকে?'

'মা থাকেন হাসপাতালে। ছোটভাই আর বোন থাকে বড় মামার বাসায়।'

'তোমার মা'কে একদিন দেখতে যাব আতাহার।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'রুম নাম্বার-টাম্বার — এইসব কাগজে লিখে রেখে যাও। আর শোন — তোমার গোটা পাঁচেক বায়োডাটা অবশ্যই আমাকে দিয়ে যাবে। দেখি কি করা যায় — তথ্যমন্ত্রীকে দিয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করব। আমার খুবই ঘনিষ্ঠ জন। 'দুলু' বলে ডাকতাম। নানানভাবে তাকে সাহায্য করেছি। তোমার বায়োডাটা নিয়ে দুলুর হাতে দিয়ে আসব।'

বলতে বলতে তাঁর মনে হল — দুলু তাঁর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেনি। তিনি তার অফিস থেকে লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। তাতে কি! পুত্রের বন্ধুর জন্যে না হয় আরেকবার অপমানিত হবেন। নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে অপমানিত হওয়ায় লজ্জা আছে, কিন্তু অন্যের উপকারের জন্যে অপমানিত হওয়ায় কোন লজ্জা নেই।

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

হোসেন সাহেব অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, সাজ্জাদের ব্যাপারটা কি তুমি কিছু জান?

'কোন ব্যাপারটা?'

'হুট করে চাকরিটা ছেড়ে দিল। তোমার সঙ্গে এইসব নিয়ে কোন আলাপ হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'ও কোথায় আছে সেটা কি জান বাবা?'

'জ্বি না চাচা, জানি না।'

'ও কি ড্রাগ-ট্রাগ খায়?'

'শখ করে মাঝে মাঝে খায়। একে ঠিক ড্রাগ খাওয়া বলে না। কৌতূহল মেটানোর জন্যে।'

'অতিরিক্ত কৌতূহল কি ভাল আতাহার?'

'সবার জন্যে ভাল না। কিন্তু সৃষ্টিশীল মানুষদের প্রধান অস্ত্রই কৌতূহল। এরা জীবনকে নানানভাবে, নানান দিক থেকে দেখবে।'

'জীবনকে দেখার জন্যে ড্রাগ খেতে হবে? জীবনকে দেখার জন্যে চোখ পরিষ্কার থাকা দরকার না? মাথাটা পরিষ্কার থাকা দরকার না? ঘোরের মধ্যে তুমি জীবন কি দেখবে?'

আতাহার চুপ করে রইল। হোসেন সাহেব বললেন, আতাহার শোন — আমি সাজ্জাদকে নিয়ে খুব দুঃশ্চিন্তায় আছি। আমার মনে হয় ওকে কোন ভাল সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখানো দরকার। তুমি কি বল? শুধু ওর একার চিকিৎসারই যে দরকার তা না, তোমার নিজেরো চিকিৎসা দরকার। ঠিক বলছি না আতাহার?

'জ্বি। চাচা, আজ উঠি। মা'কে দেখার জন্যে আজ ভাবছিলাম একটু হাসপাতালে যাব।'

'তাহলে ভাত দিতে বলি। বেগুন ভাজতে বলেছি। খাবার সময় গরম গরম ভেজে দেবে। নতুন গাওয়া ঘি আছে। বেগুনভাজা, গাওয়া ঘি খেতে অপূর্ব। এরা অবশ্যি বেগুনটা ঠিকমত ভাজতে পারে না। ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যায়। তোমার চাচী চালের গুড়া দিয়ে মাখিয়ে কি করে যেন বেগুন ভাজতো। অপূর্ব লাগতো। শক্ত একটা খোসার মত থাকতো, ভেতরটা মাখনের মত মোলায়েম। স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে। বুঝলে আতাহার, আমি মাঝে মাঝে রাতে স্বপ্নে দেখি ঐ বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত খাচ্ছি। স্বপ্নে খাওয়ার কোন টেস্ট নাকি পাওয়া যায় না। আমি কিন্তু পাই। আরেকদিন স্বপ্নে দেখলাম, গরম গরম জিলাপি খাচ্ছি। তারও স্বাদ পেয়েছি। স্বপ্ন ভাঙার পরেও দেখি মুখ মিষ্টি হয়ে আছে। তারপর জেগে উঠে মুখের মিষ্টি ভাব কাটানোর জন্যে একটা পান খেলাম।'

'জিলাপি কি চাচীর খুব প্রিয় ছিল?'

'তুমি ঠিকই ধরেছ। জিলাপি ওর খুব প্রিয় ছিল। গরম গরম জিলাপির জন্যে পাগল ছিল। একবার হয়েছে কি, শোন — ট্রেনে করে সিলেট যাচ্ছি, আখাউড়া স্টেশনে হঠাৎ সে দেখল — টিকিট ঘরের পাশে তোলা উনুনে জিলাপি ভাজা হচ্ছে — আমাকে বলল, জিলাপি খাব। আমি বললাম, জিলাপি খাবে কি? এক্ষুণি ট্রেন ছেড়ে দেবে। সে বলল, না ছাড়বে না। তুমি এক দৌড়ে যাও। কি আর করা — গেলাম। সত্যি সত্যি ট্রেন ছেড়ে দিল। আমি আর দৌড়ে উঠতে পারলাম না। জিলাপির ঠোঙ্গা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি — আমার সামনে দিয়ে ট্রেন চলে গেল। তোমার চাচী দেখি জানালা দিয়ে মাথা বের করে হাত নেড়ে খুব টা-টা দিচ্ছে।

কাজের মেয়েটি এসে জানাল, ভাত দেয়া হয়েছে। হোসেন সাহেব আতাহারকে নিয়ে খেতে গেলেন। তাঁকে খুব আনন্দিত মনে হল। বেগুন ভাজা খেতে ভাল হয়েছে। এতটা ভাল হবে তিনি আশা করেননি। বেগুন এবং ঘিয়ের গন্ধ মিলে অপূর্ব গন্ধ বেরুচ্ছে।

'আতাহার!'

'জ্বি চাচা।'

'বেগুনভাজা কেমন লাগছে?'

'অসাধারণ।'

'তোমার চাচীর হাতের বেগুনভাজা একদিন তোমাকে খাওয়াতে পারলে বুঝতে কি জিনিস। সেটা সম্ভব না। কেন সম্ভব না তা নিশ্চয়ই জান।'

'জ্বি জানি।'

'আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। যোগাযোগ না থাকাই অবশ্যি ভাল। তবে

ঠিক করেছি, নীতুর বিয়ের খবরটা তাকে টেলিফোনে দেব। হাজার হলেও সে মা। নিজের মেয়ের বিয়ের খবর জানার অধিকার তার আছে। তাই না?'

'জ্বি।'

'বিয়ের কার্ড হাতে নিজেই যদি যাই সেটা কি খারাপ হবে?'

'জ্বি না।'

'তাই করব। কার্ডটা দিয়ে চলে আসব। খুব বেশি হলে এক কাপ চা খাব। সাধারণ ভদ্রতার কিছু কথা — কেমন আছ, ভাল আছি টাইপ। তারপর চলে আসা। তোমাকে নিয়েই না হয় যাব।'

'আমাকে নিয়ে যাবার দরকার কি চাচা?'

'তৃতীয় একজন ব্যক্তি থাকলে কথাবার্তা বলার সুবিধা হয় — এই আর কি। তুমি যেতে না চাইলে — থাক।'

'আপনি বললে আমি অবশ্যি যাব।'

'আতাহার!'

'জ্বি।

'তুমি কি হাতদেখা-টেখা এইসবে বিশ্বাস কর?'

'কেন বলুন তো চাচা?'

'একজন খুব ভাল পামিস্টকে আমি হাত দেখিয়েছিলাম — নাম হল জ্যোতিষ ভাস্কর অভেদানন্দ। কথাবার্তা শুনে শুরুতে মনে হয়েছিল ফ্রড। পরে দেখলাম, ফ্রড না। ভাল জানেন। তিনি আমাকে বললেন, আফটার সিক্সটি সেভেন আমার জীবন খুবই আনন্দময় হবে।'

'তাই নাকি?'

'কিভাবে তা হবে কে জানে। উনি আমাকে একটা এমেথিস্ট পাথর ব্যবহার করতে বলেছেন।'

'ব্যবহার করছেন?'

'পাথর আনিয়েছি — ভাবছি একটা আংটি করব। ক্ষতি তো কিছু নেই — তাই না? আমাদের নবী নিজেও না-কি আকিক পাথর ব্যবহার করতেন। পাথরের একটা গুণাগুণ তো থাকতেই পারে। পারে না?'

'জ্বি পারে।'

বৃদ্ধের প্রতি গভীর মমতায় আতাহারের চোখ ভিজে উঠার উপক্রম হল। খাওয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে চলে গেল না। চুপচাপ বসে হোসেন সাহেবের কথা শুনতে লাগল।

মৃত্যু সম্পর্কিত আরেকটি কোটেশন হোসেন সাহেবের মনে পড়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বলছেন —

'আতাহার শোন, বেকনের একটা প্রবন্ধ আছে মৃত্যু বিষয়ে। প্রবন্ধটার নাম — Essay on death. বেকন সেখানে বলছেন — Heaven gives its favourities — early

death. অর্থটা হচ্ছে — অল্প বয়সে তারাই মারা যায় যারা প্রকৃতির প্রিয় সন্তান। তোমার বাবা অবশ্যি অল্প বয়সে মারা যাননি — পরিণত বয়সে মারা গেছেন। তবু সন্তানের কাছে এই মৃত্যুও গ্রহণযোগ্য না। কেউ দেড়শ বছর বাঁচার পরেও তার সন্তান কাঁদতে কাঁদতে বলবে — বাবা, কেন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন !

আতাহার একবার ভাবল বলে, চাচা, এটা কবি বায়রনের লাইন বলে একটু আগেই আপনি আমাকে শুনিয়েছেন। তারপর ভাবল, কি দরকার ? কথাটাই আসল, কে বলল সেটা কোন ব্যপার না। এই জাতীয় কথা অন্যের মৃত্যুতে একজন রিকশাওয়ালাও বলে। যেহেতু সে রিকশা চালায় — তার কথা কোটেশন হিশেবে ব্যবহার করা হয় না।

'আতাহার !'

'জ্বি চাচা।'

'তোমাকে আমি অত্যন্ত পছন্দ করি।'

'সেটা চাচা আমি জানি।'

'শুধু আমি একা না, এই পরিবারের সবাই তোমাকে পছন্দ করে। শুধু নীতুর ব্যাপারটা বলতে পারছি না। ও অবশ্যি খুব চাপা মেয়ে . . . আতাহার, কফি খাবে ?'

'জ্বি না।'

'খাও, একটু কফি খাও। খাওয়া-দাওয়ার পর কফি হজমের সহায়ক। নিউজ উইক পত্রিকায় একবার পড়েছিলাম। অল্প পরিমাণে কেফিন হার্টের জন্যেও ভাল। হার্টের রক্ত সঞ্চালন এতে ভাল হয়।

নীতু ফিরে এসেছে। নীতুর পেছনে পেছনে আসছে কামাল। নীতুর হাতে একটা বেলীফুলের মালা। কামাল কিনে দিয়েছে। আতাহারকে দেখে কামালের ভুরু কুঁচকে গেল। চোখ-মুখ শক্ত হয়ে গেল। নীতু বলল, আতাহার ভাই, আপনি এত রাত পর্যন্ত আছেন ? আপনার কি ঘর-সংসার বলে কিছু নেই ? আশ্চর্য !

হোসেন সাহেব মেয়ের উপর খুব বিরক্ত হলেন। মেয়েটা আতাহারের সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে কেন ? মৃত্যুশোকে কাতর একটা মানুষের সঙ্গে মমতা ও ভালবাসা নিয়ে কথা বলা দরকার —এই সহজ সত্যটা তার মেয়ে জানবে না কেন ?

হোসেন সাহেব কামালের দিকে তাকিয়ে বললেন, কামাল বাবা, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বস।

'জ্বি না, আমি বসব না, চলে যাব।'

'তোমাদের ডিনার কেমন হয়েছে ?'

'জ্বি ভাল হয়েছে।'

'আতাহারের সঙ্গে কি তোমার পরিচয় হয়েছে ? অতি ভাল ছেলে।'

কামাল শুকনো গলায় বলল, জ্বি, পরিচয় হয়েছে।

নীতু দোতলায় উঠে গেছে। কামালও চলে গেছে। পটে করে কফি দিয়ে গেছে। হোসেন সাহেব কফি ঢালতে ঢালতে বললেন, নীতুর কথায় তুমি কিছু মনে করো না আতাহার।

'আমি কিছু মনে করিনি।'

'অল্প বয়সে মা'র আদর না পেলে ছেলেমেয়েগুলি অন্য রকম হয়ে যায়। নীতু, সাজ্জাদ এরা দুর্ভাগা। অল্প বয়সে এরা মা'র ভালবাসা পায়নি।'

'আপনার ভালবাসা তো পেয়েছে।'

'সেটা এখনো পাচ্ছে। বাবার ভালবাসায় কোন একটা জিনিসের অভাব আছে। সেই ভালবাসায় কাজ হয় না। অনেকটা খাবারের ভিটামিনের মত। খাবার ঠিক আছে। কিন্তু পার্টিকুলার একটা ভিটামিন নেই। তাই না?'

আতাহার কফিতে চুমুক দিতে দিতে বলল, হতে পারে।

'সাইকোলজিস্টদের উচিত সেই ভিটামিনটা কি তা খুঁজে বের করা।'

'জ্বি।'

আতাহার মনে মনে বলল, এই ভিটামিনটার নাম হবে — ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স এর মত ভিটামিন-ভি কমপ্লেক্স। ভালবাসা কমপ্লেক্স ভিটামিন।

নীতু তার কাপড় না ছেড়েই কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসেছে। আতাহারকে সে অতি দ্রুত একটা চিঠি লিখছে। চিঠিটা সে আজই তার হাতে দিয়ে দেবে। অনেক কথা মুখে বলা যায় না। চিঠিতে খুব সহজে বলে ফেলা যায়। সবচে' ভাল হত চিঠিটা যদি ইংরেজিতে লিখতে পারত। ভাষার আড়াল পর্দার মত কাজ করত। I love you যত সহজে বলা যায় — "আমি তোমাকে ভালবাসি" তত সহজে বলা যায় না। মুখের কাছে এসে আটকে যায়। ভালবাসাবাসির কথা বলার জন্যে অন্য এক ধরনের ভাষা থাকলে ভাল হত। সাইন ল্যাংগুয়েজের মত কোন ল্যাংগুয়েজ। যে ল্যাংগুয়েজে শুধু চোখ ব্যবহার করা হবে।

আতাহার ভাই,

খুব জরুরী কথা। খুব জরুরী। আপনি কি জানেন আমার ড্রয়ারে ২১৫টা ফনোবারবিটন ট্যাবলেট আছে? ট্যাবলেটগুলি আমি অল্প অল্প করে জমিয়েছি। যেদিন আমার গায়ে-হলুদ হবে সেদিন রাতে আমি ট্যাবলেটগুলি খাব। এর মধ্যে একটা তবে আছে। তবেটা হচ্ছে — আপনি যদি আমার ঘরে এসে আমাকে বলেন, "নীতু, তোর ট্যাবলেটগুলি আমাকে দে।" তাহলে আমি দিয়ে দেব এবং তখন অনেক রকম পাগলামি করব। যেমন আপনাকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাঁদব বা অন্য কিছু যা এই মুহূর্তে ভাবতে পারছি না। বা ভাবতে পারলেও বলতে পারছি না।

ইতি নীতু

নীতুর হাত এত কাঁপছে যে হাতের লেখা হয়েছে জঘন্য। অক্ষরগুলি হয়েছে বড়-ছোট। বানান ঠিক আছে কিনা কে জানে! নির্ঘাত অনেকগুলি বানান ভুল হয়েছে। খুব

সুন্দর একটা চিঠিও ভুল বানানের জন্যে জঘন্য হয়ে যায়। প্রথম বাক্যের দু'টা বানানই তো মনে হচ্ছে ভুল — 'জরুরী' বানান কি? হ্রস্ব-ইকার না দীর্ঘ-ঈকার?'

তার শোবার খাটের কাছেই শেলফে চলন্তিকা থাকে। আজ সেটাও নেই। ডিকশনারি তো গল্পের বই না। কে নেবে ডিকশনারি? আশ্চর্য তো!

চিঠিটা নীতু চতুর্থবারের মত পড়ল। পুরো চিঠিতে ট্যাবলেট শব্দটা চারবার আছে। কি বিশ্রী লাগছে! চিঠিটা কেমন ন্যাকা ন্যাকা হয়ে গেছে। বাংলা ভাষাটা এমন যে আবেগ নিয়ে কিছু লিখলেই ন্যাকা ন্যাকা ভাব চলে আসে। চিঠিটা বরং ইংরেজিতেই লেখা যাক। নীতু আরেকটা কাগজ নিল। কেন জানি তার সারা শরীর ঘামছে। বুক ধক্ ধক্ করছে —। মনে হচ্ছে তার কঠিন কোন অসুখ করেছে —

Dear Atahar Bhai,

I have something important to discuss. Very important. Do you know I have 215 sleeping pills hidden somewhere in my drawer . . .

নীতু চিঠি হাতে নিচে নেমে এল। হোসেন সাহেব একা একা বসে আছেন। নীতু বলল, আতাহার ভাই কোথায়? হোসেন সাহেব বললেন, ওতো অনেক আগেই চলে গেছে।

নীতু বলল, ও আচ্ছা।

হোসেন সাহেব বললেন, তুই এরকম করছিস কেন? তোর কি হয়েছে? ঘেমে-টেমে কি অবস্থা। আজ তোদের ডিনার কেমন হয়েছে?

'অসাধারণ হয়েছে বাবা।'

'বোস, গল্প করি।'

নীতু বসল, আবার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়াল। হোসেন সাহেব বললেন, কোথায় যাচ্ছিস?

নীতু বলল, বাগানে। আমার খুব গরম লাগছে। চিঠিটা সে কুচি কুচি করে ছুড়ে ফেলল। সাদা টুকরাগুলি কেমন যেন শিউলি ফুলের মত লাগছে। তাদের বাগানে প্রকাণ্ড একটা শিউলি গাছ ছিল। গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে। শুয়োপোকার জন্যে কাটা হয়েছে। শিউলি গাছে খুব শুয়োপোকা হয়। নীতুর মনে হচ্ছে তার শিউলি ফুলের মত কাগজের টুকরোগুলির উপর দিয়ে শুয়োপোকা হেঁটে যাচ্ছে।

কবি

'মোসাদ্দেক ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন?'

মোসাদ্দেক সাহেব বারান্দায় একটা জলচৌকির উপর বসে আছেন। ওয়েল কালারের হলুদ রঙের একটা টিউবের মুখ জ্যাম হয়ে গেছে। হাজার টিপাটিপি করেও রঙ বের করা যাচ্ছে না। তিনি বটি দিয়ে মুখটা কেটেছেন। মুখ কাটতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল কেটে গেছে। ফোটা ফোটা রক্ত পড়ছে। তিনি মুগ্ধ হয়ে রক্তের রঙ দেখছেন। রঙটা তাঁর কাছে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। ওয়েল কালার কি রক্তে ডিজলভড্ হবে? তাহলে তার্পিনের বদলে থিনার হিসেবে রক্ত ব্যবহার করা যেত। ওয়েল কালারে ব্যবহার না করা গেলেও ওয়াটার কালারে নিশ্চয়ই ব্যবহার করা যাবে। তবে রক্তের রঙ স্থায়ী না — কিছুক্ষণের ভেতর কালচে হয়ে যায়। এতে অন্য রকম একটা এফেক্ট হতে পারে। বিভিন্ন রঙের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করা যেতে পারে। তার জন্যে অনেকখানি রক্ত দরকার। বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। আরো কিছু রক্ত পড়লে ভাল হত। আঙুলটা আরেকটু বেশী কাটলে ভাল হত। এত কম কাটল কেন?

মোসাদ্দেক সাহেব যখন রক্ত নিয়ে এই জাতীয় চিন্তা-ভাবনা করছিলেন তখনই সাজ্জাদ এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন? গভীর চিন্তায় বাধা পেলে যে-কেউ বিরক্ত হয়। মোসাদ্দেক সাহেব হন না। তিনি চিন্তাটাকে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন। আবার অবসর মত শুরু করেন।

'মোসাদ্দেক ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন?'

মোসাদ্দেক সাহেব বললেন, কেমন আছ সাজ্জাদ?

'জ্বি ভাল। আপনি দেখি আঙুল কেটে ফেলেছেন।'

'হুঁ।'

'অনেক রক্ত পড়েছে। এতটা কাটল কি ভাবে?'

'দা দিয়ে।'

'আপনার শরীর ভাল মোসাদ্দেক ভাই?'

'হ্যাঁ, শরীর ভাল।'

'আমার তো দেখে মনে হচ্ছে খুব কাহিল। অসুখ-বিসুখ না-কি?'

'বেশ কিছুদিন থেকে বুকে ব্যথা হচ্ছে। মনে হয় লাংস ক্যানসার।'

www.Murchona.com
suman_ahm@yahoo.com

'এখনো কি হচ্ছে?'

'না।'

'আমি আপনার জন্যে দু'বোতল হুইস্কি নিয়ে এসেছি। ভালটা পেলাম না — হাতের কাছে যা পেয়েছি — এনেছি। হানড্রেড পাইপার।'

'আচ্ছা।'

তিনি এমনভাবে আচ্ছা বললেন যে খুশি হলেন কি বেজার হলেন বুঝতে পারা গেল না। আসলে তিনি রক্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা আবার শুরু করতে যাচ্ছেন।

সাজ্জাদ নিতান্ত পরিচিতজনের মত ঘরে ঢুকে পড়ল। এখানে সে অবশ্যি খুব অপরিচিতও নয়। এর আগে সে চারদিন কাটিয়ে গেছে। ঘর–দুয়ার আগে যেমন ছিল এখনো সে রকমই আছে। সেই স্টোভ, সেই থালা–বাসন। জানালায় সেই আগের রঙজ্বলা হলুদ পর্দা। দেয়ালে মাকড়সার ঝুল। মাকড়সার ঝুলের পরিমাণও স্থির। বাড়েওনি, কমেওনি। এই বাড়িটায় সময় মনে হয় স্থির হয়ে আছে। সাজ্জাদ আবার বারান্দায় এল।

'মোসাদ্দেক ভাই!'

'হুঁ।'

'কণা কি এর মধ্যে এসেছিল?'

'না।'

'ন্যুড ছবির ফরমাশ এখন আর পান না?'

'না।'

'চায়ের সরঞ্জাম কি আছে?'

'না।'

'চা খেতে চাইলে কি করেন — দোকানে বলে আসেন?'

'হু।'

'আপনার এখানে আসার আমার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে মোসাদ্দেক ভাই।'

'আচ্ছা।'

'উদ্দেশ্যটা হচ্ছে — আমার একটা ন্যুড পোর্ট্রেট দরকার। আপনি পোর্ট্রেটের জন্য কত নেন?'

'চার হাজার।'

'আমি আপনাকে চার হাজারের অনেক বেশি দেব। আমাকে ভালমত এঁকে দিতে হবে।'

'আচ্ছা পোর্ট্রেটটা কার — কণার?'

'না। কণার না। তবে কণাকে আপনি মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। যার পোর্ট্রেট সে কখনো মডেল হবে না।'

'আচ্ছা। ঐ মেয়েটির মুখের ছবি লাগবে। বড় ছবি। সামনাসামনি ছবি এবং প্রোফাইলের ছবি।'

'আমি জোগাড় করে দেব। একটা ছবি শেষ করতে কতদিন লাগে?'

'আমি দ্রুত কাজ করি। সময় লাগে না। ধর এক সপ্তাহ। তবে ভাল করে আঁকতে সময় লাগে।'

'আপনি সময় নিন। কিন্তু খুব ভাল করে আঁকবেন। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড কি রকম হবে আপনাকে বলে দেব?'

'দাও। আমি ফরমায়েশী কাজই করি। নিজের ইচ্ছায় কিছু আঁকি না।'

'মনে করুন একটা নির্জন বন। সাধারণ বন না — কদম্ব বন। বর্ষাকাল। গাছ ভর্তি কদম ফুল ফুটেছে। কদম্ব বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা পুকুরের পাড়ে মেয়েটি নাচছে। আপন মনে নাচছে। যেহেতু চারপাশে কেউ নেই সেহেতু মেয়েটি তার নগ্ন শরীর নিয়ে চিন্তিত নয়। আমি কি দৃশ্যটা আপনাকে বুঝাতে পেরেছি?'

'হুঁ। ছবির সময়টা কি?'

'সন্ধ্যা। গাছের মাথায় সন্ধ্যার শেষ আলো পড়েছে।'

'আকাশ দেখা যাচ্ছে?'

'না। তবে পুকুরের জলে আকাশের ছায়া পড়েছে।'

'জটিল ছবি। আঁকতে সময় লাগবে।'

'আপনি সময় নিন। আমার কোন তাড়া নেই। আপনি চার হাজার চেয়েছেন — আমি দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছি। টাকাটা কি এখন দেব?'

'দাও।'

সাজ্জাদ টাকা বের করে দিল। মোসাদ্দেক সাহেব টাকা হাতে নিলেন। দু'বার গুনলেন। তারপর পাঞ্জাবি গায়ে বের হয়ে গেলেন। কোথায় যাচ্ছেন সাজ্জাদকে বলে গেলেন না। তাঁর বুড়ো হাতের আঙুলের রক্ত আবার ফোটা ফোটা পড়তে শুরু করেছে। মোসাদ্দেক সাহেবের ভুরু কুঁচকে আছে। এক নাগাড়ে অনেকখানি রক্ত পড়লে ভাল হত। এক্সপেরিমেন্টটা করা যেত। শুধু শুধু রক্তটা নষ্ট হচ্ছে।

সাজ্জাদ রাত দু'টায় লীলাবতীকে টেলিফোন করল। লীলাবতী ঘুমুচ্ছিল। সে টেলিফোন ধরল আধো-ঘুম ও আধো-তন্দ্রায়।

'হ্যালো, কে?'

'আমি সাজ্জাদ — তুমি কি ঘুমুচ্ছিলে?'

'হুঁ।'

'ঘুম ভাঙালাম?'

'হুঁ।'

'দুঃখিত লীলাবতী।'

'দুঃখিত হবার দরকার নেই। কেন টেলিফোন করেছেন?'

'তুমি ঘুমুচ্ছ না জেগে আছ, এটা জানার জন্যে।'

'যা জানার তা তো জেনে গেছেন। এখন কি টেলিফোন রেখে দেবেন?'

'না, কিছুক্ষণ গল্প করব। আমার ঘুম আসছে না। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে।'

'আমার কথা মনে পড়ল?'

'ঠিক তাও না। তুমি তোমার টেলিফোন নাম্বার দেয়ালে লিখে রেখে গিয়েছিলে। চোখের সামনে নাম্বারটা জ্বলজ্বল করছে।'

'দেয়াল নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত।'

'জন্মদিনের পার্টি থেকে যে ঘাড় ধরে বের করে দিলে তার জন্যে দুঃখিত না?'

'না। আমি খুব খুশি হব যদি আর কখনো আমাদের বাড়িতে না আসেন।'

'আচ্ছা আসব না। দেয়ালে লেখা টেলিফোন নাম্বারটা কি মুছে ফেলব?'

'না, এটা থাকুক। এই নাম্বারটা ঘুমের অষুধ হিসেবে ব্যবহার করবেন। ঘুম না এলে টেলিফোন করবেন।'

'টেলিফোন করলে অসুবিধা নেই?'

'না, তাতে অসুবিধা নেই। দূর থেকে আপনি চমৎকার মানুষ। কাছ থেকে না। খুব কাছ থেকে যে আপনাকে দেখতে যাবে সেই একটা শক্ খাবে।'

'আমার নিজেরো তাই ধারণা। আচ্ছা শোন লীলাবতী, তোমার নাচ বিষয়ে একটা কথা।'

'নাচ প্রসঙ্গ থাক। অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা করুন — '

'সামান্য একটা প্রশ্ন। এক অক্ষরে জবাব দেয়া যায় এ রকম।'

'প্রশ্নটা কি?'

'তুমি কি সম্পূর্ণ নিজের আনন্দে একা একা কখনো নাচ? মানুষ যেমন একা একা গান গায় সে রকম?'

'হ্যাঁ, নাচি।'

'এখন বল একা একা যখন নাচ তখন কি সামনে কাউকে কল্পনা করে নিতে হয়?'

লীলাবতী চুপ করে রইল। সাজ্জাদ আগ্রহের সঙ্গে বলল, চুপ করে আছ কেন? বল।

লীলাবতী নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ, কল্পনা করে নিতে হয়।

'কাজেই চিন্তা করে দেখ নৃত্যকলা এমন এক বিদ্যা যা সৃষ্টি হয়েছে অন্যের জন্যে। গান কিন্তু নিজের জন্যেও।'

'নৃত্যকলা নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কি তোমার কয়েকটা ছবি আমাকে দেবে?'

'কি দেব?'

'ছবি। ফটোগ্রাফ।'

'কেন?'

'আছে, আমার একটা কাজ আছে। তিনটা ছবি — একটা সামনে থেকে, দু'টা

প্রোফাইল। লেফট প্রোফাইল এবং রাইট প্রোফাইল।'

লীলাবতী গম্ভীর গলায় বলল, কেন চাচ্ছেন আগে বলুন।

সাজ্জাদ বলল, আগে বলব না। আমি টেলিফোন রেখে দিচ্ছি। ভাল থেকো।

ভাল লাগছে না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। ভয়ংকর কিছু করতে ইচ্ছে করছে। ভয়ংকর কিছু। ঈশ্বর মানুষকে ভয়ংকর কাণ্ড করার ক্ষমতা দিয়ে পাঠান কিন্তু বার বার বলে দেন — "তোমরা ভয়ংকর কিছু করো না। সাবধান, সাবধান, সাবধান।" তিনি যদি চাইতেন মানুষ ভয়ংকর কিছু করবে না তাহলে তাদের সেই ক্ষমতা না দিলেই পারতেন। তাদের প্রজাপতি বানিয়ে পাঠালেই হত। তারা রঙ্গিন পাখা মেলে ফুলে ফুলে উড়বে। কোনদিন ভয়ংকর কিছু করতে পারবে না।

সাজ্জাদ হাত বাড়িয়ে এডমন্ড স্পেনসারের কবিতার বই টেনে নিল। কোন বাছাবাছি না। বই খুললে প্রথম যে কবিতাটি বের হবে সেটাই পাঠ করা হবে। পাঠ এবং তাৎক্ষণিক অনুবাদ। লীলাবতী পাশে থাকলে ভাল হত। তাকে বলা যেত — লীলা তুমি হাতে কলম নাও। নাচের মুদ্রার মত কলমটা ধর যেন এটা কলম না, এটা একটা পদ্মফুল। তারপর আমি যা বলব তুমি লিখে ফেলবে। কবিতার পালা শেষ হলে নাচ হবে — তুমি নাচবে আমি দেখব। ঘরে বাতি থাকবে না। তুমি নাচবে অন্ধকারে আমি অন্ধকারেই তোমাকে দেখার চেষ্টা করব। পৃথিবীর প্রকৃত রূপ লুকিয়ে থাকে অন্ধকারে। কারণ কল্পনার জন্ম অন্ধকারে, পরাবাস্তবে। সাজ্জাদ বই খুলল —

"Unhappy verse, the witness of my unhappy state,"

লীলাবতী তাড়াতাড়ি লেখ —

"অসুখী পংক্তিমালা, দেখো দেখো আমার অসুখ দেখো"

হচ্ছেনা অসুখী পংতিমালা অসুখ দেখবে না সে অসুখের সাক্ষি হবে। তাছাড়া পংক্তিমালা কখনো অসুখী হয় না . . . এডমন্ড স্পেনসার সাহেব এইসব কি হাবিজাবি লিখছেন?

বরিশালের ছায়াময় শহরের জীবনানন্দ দাস কি বলেন?

"নির্জন আমের ডালে দুলে যায় — দুলে যায় — বাতাসের সাথে বহুক্ষণ
শুধু কথা, গান নয় — নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন।"

মন্দ না — "নীরবতা রচিতেছে আমাদের সবের জীবন।" এক আশ্চর্য নীরবতা আমাদের ভেতর অথচ আমরা বাস করি সরব পৃথিবীতে। এক আশ্চর্য অন্ধকার আমাদের ভেতর — অথচ আমরা বাস করি আলোর ভুবনে। মাতৃ জঠরের অন্ধকারের স্মৃতি মাথায় নিয়ে আমরা আলোর আরাধনা করি। উল্টোটা করাই কি যুক্তিযুক্ত না?

সাজ্জাদ ড্রয়ার খুলল। তার পা টলছে, হাত কাঁপছে তাকে কেমন যেন নেশাগ্রস্ত মনে হচ্ছে। অথচ সে কোন নেশা করেনি। এখন করবে। আফিং-এর একটা ডেরিভেটিভ

শরীরে ঢুকিয়ে দেবে। মরফিনকে এসিটিক এনহাইড্রাইড দিয়ে মিশিয়ে যে বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে যার নাম হেরোইন। হেনরিখ ড্রেসার সাহেবের মহান (?) আবিষ্কার! যখন প্রথম তৈরি করা হল তখন পৃথিবীর প্রথম সাড়ির বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন — এটি একটা বড় ধরনের আবিষ্কার। এই আবিষ্কার ব্যবহৃত হবে মানব কল্যাণে। আজ উল্টোটা হয়েছে। হেনরিখ ড্রেসার সাহেব ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরি করেছেন।

সাজ্জাদ শাদা পাউডারের দ্রবণ তৈরি করল খুব সাবধানে। পাকা কেমিষ্টের মত। হাইপারডারমিক সিরিঞ্জে দ্রবণটা ঢুকাল। এই কাজটিও করা হল নিখুঁতভাবে। এখন শুধু শরীরে ঢুকিয়ে দেয়া — ব্যাপারটা দু'ভাবে করা যেতে পারে। চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া, কিংবা সরাসরি কোন রক্তবাহী শিরায় ঢুকিয়ে দেয়া। রক্তে ঢোকার সঙ্গে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠবে। প্রচণ্ড একটা ঝড় শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাবে। শরীরের প্রতিটি জীবকোষ এক সঙ্গে নেচে উঠবে।

লীলাবতী তুমি কি এই নাচের খবর জান? না, তুমি এই নাচের খবর জান না। এ এক অদৃশ্য নাচ।

তারপরের সময়টা নৃত্যক্লান্ত নর্তকীর অবসাদের মত। সে অবসাদও আনন্দময় অবসাদ। এক ধরনের মুক্তি। সরব পৃথিবী থেকে মুক্তি, আলো থেকে মুক্তি। উল্টো যাত্রা।

> 'If in bed, tell her that my eyes can take not rest ;
> If at board, tell her that my mouth can eat no meat ;
> If at her virginals, tell her I can hear no mirth.'

এটা কার কবিতা? কে আবৃত্তি করছে? সাজ্জাদ কুণ্ডুলি পাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে শীতল হাওয়া আসছে। শীত লাগছে। শরীর কাঁপছে। ভাল লাগছে। খুব ভাল লাগছে। যিনি কবিতা আবৃত্তি করছেন তার কণ্ঠ ভরাট। কে এই ভদ্রলোক কে? ঘরে বাতি জ্বলছে। বাতির আলো ধীরে ধীরে কমে আসছে। কি সুন্দর করেই না আলো কমছে। আহ্ অন্ধকারের দিকে যাত্রা এত আনন্দময়?

সাজ্জাদ চোখ বন্ধ করে গাঢ় স্বরে বলল, লীলাবতী এসো, তুমি এসো। বিছানায় উঠে এসো। না আমাকে স্পর্শ করার কোন দরকার নেই। তুমি শুধু তাকিয়ে থাক আমার দিকে — আমি তাকিয়ে থাকব তোমার আশ্চর্য সুন্দর চোখের দিকে। তুমি জান তোমার চোখের দিকে তাকালে আমি কি দেখি? "I can see the universe." তুমি কি একটা কাজ করতে পারবে? তোমার চোখ দু'টা আমাকে দিয়ে দেবে? তোমার শরীর তোমারই থাকুক। সেই শরীর নিয়ে যত ইচ্ছা তুমি নেচে বেড়াও শুধু চোখ দু'টা আমাকে দিয়ে দাও। আমি একটা হরলিক্সের কৌটায় দু'টা চোখ রেখে দেব। না চোখ নষ্ট হবে না। আমি ফরমালিনে ডুবিয়ে রাখব। তুমি কি জান ফরমালিন কি? ফরমালিন হচ্ছে ফাইভ পার্সেন্ট ফরমালডিহাইডের দ্রবণ।

এর রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে — HCHO

সাজ্জাদ নিজের মনেই হাসল। ঘরের আলো আরো কমে আসছে — সুন্দর একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কে এসেছে ঘরে? লীলাবতী? তার কি হেলোসিনেশন হচ্ছে? মরফিন ডিরিভেটিভের কি হেলোসিনেটিং এফেক্ট আছে? সাজ্জাদ বিড় বিড় করে বলল, এসো লীলাবতী, এসো!!

সুন্দর একটা গান ছিল না ঘরে আসা নিয়ে? "এসো আমার ঘরে এসো. . ." এই জাতীয়। গানের সুর মাথায় আসছে, কথা আসছে না। আবার যখন কথা মনে আসছে তখন সুর মনে আসছে না। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রের মত। যখন গতি জানা যায় তখন অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দু'টি অনিশ্চয়তার গুনফল সমান 'h' প্ল্যাংক কনসটেন্ট। এই ভদ্রলোক ১৯০৫ সনে জার্মান ফিজিক্যাল সোসাইটির মিটিং-এ বলেছিলেন — আচ্ছা মাথার মধ্যে অংক ঘুরছে কেন? গান কোথায় গেল? গান?

"এসো আমার ঘরে. . ."

কবি

মিলির বিয়ে বেশ স্বাভাবিকভাবে হয়ে গেল। বাঙালী বিয়ে যেভাবে যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবেই হল। গায়ে-হলুদে মাছ পাঠাল বরের বাড়ি থেকে। সেই মাছ সাইজে প্রকাণ্ড হল না। মাঝারি সাইজের কাতল। মিলির মামি বললেন, মনে হচ্ছে ফকিরের পুলা। সরপুটি পাঠিয়ে দিয়েছে।

মিলির দুঃখে কান্না পেতে লাগল। এখনো বিয়ে হয়নি তারপরেও বরপক্ষের বিরুদ্ধে উচ্চারিত প্রতিটি বাক্য তার গায়ে লাগছে। তার কাছে মনে হচ্ছে মাছটা তো বেশ বড়ই লাগছে। এরচে' বড় মাছের দরকার কি?

বিয়েতে আনা গয়নাগাটি নিয়ে খুব হাসাহাসি হতে লাগলো। মিলির দূর সম্পর্কের এক বোন গলার হারটা নিয়ে টেবিল ল্যাম্পের সামনে ধরে হাসতে হাসতে ভেঙে গড়িয়ে পড়ে গেল।

'কি রকম পাতলা দেখেছ? গয়নার ভেতর দিয়ে লাইট পাস করছে।'

মিলিকে মুখ হাসি হাসি করে রাখতে হচ্ছে, নয়ত সবাই ভাববে কথাগুলি সে গা পেতে নিচ্ছে। সে মুখ হাসি হাসি করে রাখল। তবে মনে মনে বলল, লাইট তোর মোটা মাথা দিয়ে পাস করছে — হাঁদিরাম কোথাকার।

বরকে নিয়েও অনেক হাসাহাসি হল। অপরিচিত সুন্দরমত একজন মহিলা বললেন, বর দেখেছ? হাতভর্তি গরিলার মত লোম। এই ভদ্রলোকের শীতকালে কোন কম্বল লাগবে না। ন্যাচারেল উলেন কম্বলে গড অলমাইটি উনাকে ঢেকে দিয়েছেন। এই জাতীয় কুৎসিত কথাতেও মিলিকে অন্যদের মত হাসতে হল। সে লক্ষ্য করল, সবাই হাসছে, শুধু তার দুই ভাই মুখ কাল করে দাঁড়িয়ে আছে। সবচে' তাকে যে ব্যাপারটা কষ্ট দিল তা হচ্ছে আতাহারের চোখে পানি ছল ছল করছে। ভাইয়া কখনো কাঁদে না। বাবার মৃত্যুর দিন সবাই হাউমাউ করে কেঁদেছে, ভাইয়া কাঁদেনি। মনে হচ্ছে আজ বোনের অপমানে সে কেঁদে ফেলবে।

মিলি মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগল। হে আল্লাহ! ভাইয়া যেন কেঁদে না ফেলে। ভাইয়া যেন কেঁদে না ফেলে। ভাইয়া কেঁদে ফেললে সে আর নিজেকে সামলাতে পারবে না। মিলি মনে মনে আতাহারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তার মন বলছে, মনের কথাগুলি কোন না কোনভাবে ভাইয়ার কাছে পৌছে যাবে। মনে মনে কথা বলার এই কৌশল আল্লাহ মানুষকে যখন দিয়েছেন তখন কোন উদ্দেশ্য নিয়েই দিয়েছেন। শুধু শুধু

তো দেননি। মিলি বলতে লাগল —

'ভাইয়া তুই এমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? বিয়ে হচ্ছে ভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ পৃথিবীতে জোড়া মিলিয়ে মানুষ পাঠান। যার যেখানে বিয়ে হবার সেখানেই হয়। আমার এই মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হবার ছিল বলেই হচ্ছে। মানুষটার গাভর্তি গরিলার মত লোম থাকলেও কিচ্ছু করার নেই। মানুষের চেষ্টায় যদি কিছু হত তাহলে তো বড় আপু আমেরিকায় যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেছিল তার সঙ্গেই বিয়ে হত। আমি তো রাজিই ছিলাম। ছেলেটা আমাকে দেখে পছন্দ করে গেছে। তারপর দু'দিন পর অন্য একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। আমাদের খবর দেবারও দরকার মনে করেনি। এই ছেলের গাভর্তি লোম থাকুক বা না থাকুক, সে তো আমাকে এরকম অপমান করেনি। ভাইয়া, আমি এই ছেলেকে আমার সমস্ত ভালবাসা দিয়ে ভালবাসব। তুই দেখিস আমি কত সুখী হব। সুন্দর সুন্দর ছেলেমেয়ে হবে আমার। তুই যখন আমাকে দেখতে যাবি তখন তারা 'মামা মামা' বলে তোর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তুই হাসতে হাসতে কপট বিরক্তিতে বলবি, মিলি, তোর বাচ্চাগুলি তো দুষ্টের শিরোমণি হয়েছে। না, তোদের বাসায় আর আসা যাবে না।

ভাইয়া, আমাদের সংসারটা ভেঙে গেছে। আমাদের খুব সুন্দর সংসার ছিল। বাবা গেলেন মরে। মা'র এখন আর কোন হুঁশ-জ্ঞান নেই। তুই আর ছোট ভাইয়া আশ্রিতের মত অন্যের বাড়িতে আছিস। আমি জানি, এইসব তোর গায়ে লাগে না। কোন কিছুই তোর গায়ে লাগে না। তুই ফুটপাতেও চাদর গায়ে দিয়ে জীবন পার করে দিতে পারবি। কিন্তু আমার খুব লাগে। আমি রাত-দিন কি প্রার্থনা করি জানিস? আমি রাত-দিন প্রার্থনা করি — যেন তোর একটা বিয়ে হয়। ভেঙে যাওয়া সংসার আবার জোড়া লাগে। কোন এক ছুটিছাটায় আমি আমার স্বামী এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে তোর বাড়িতে উপস্থিত হব। আমরা খুব হৈ-চৈ করব। সেকেন্ড শোতে ভাবীকে নিয়ে আমি সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যাব। আমার বরকে সঙ্গে নিতে হবে, নয়ত টিকিট কাটবে কে? তাছাড়া অত রাতে আমরা দু'জন মেয়ে মানুষ তো আর ফিরতে পারব না। তুই বাসায় বসে তোর ভাগ্নে-ভাগ্নিকে নিয়ে খেলবি। গল্প বলে ওদের ঘুম পাড়াবি?

বিয়ে হয়ে গেল। কনেকে স্বামীর হাতে তুলে দেবার একটা অনুষ্ঠান আছে। মিলির বড় মামা এই দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলেন। মিলি ক্ষীণ গলায় বলল, মামা, ভাইয়াকে আসতে বলুন। এই কাজটা ভাইয়া করুক। মিলির বড়মামা মিলির কথায় আহত হলেন, তবে আতাহারকে ডেকে নিয়ে এলেন। রাগী গলায় বললন, বোনের হাত ধর। হাত ধরে ছেলের হাতে তুলে দাও।

আতাহার মিলির হাত ধরল।

মিলির বড়মামা বললেন, হাত ধরে বেকুবের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? বল, আমার বোনকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে সুখে রাখবেন।

আতাহার বলল, আমার বোনকে আমি আপনার হাতে তুলে দিলাম। তাকে আপনি

সুখে রাখুন বা না রাখুন সে আপনাকে সারাজীবন সুখে রাখবে।

মিলি দেখল, আল্লাহ তার প্রার্থনা শুনেননি। আতাহার কাঁদছে। ছোট বাচ্চাদের মত ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে।

মিলির ইচ্ছা করছে ভাইয়াকে বুকে চেপে ধরে বলে, কি করছিস তুই! কান্না বন্ধ কর তো, কান্না বন্ধ কর।

সে কিছুই বলতে পারল না। অপরিচিত একটা ছেলের হাত ধরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মিলি তার স্বামীর কর্মস্থল ঠাকুরগাঁয়ে চলে যাচ্ছে। মিলির স্বামী মোঃ জহির উদ্দিন ঠাকুরগাঁ পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার। মিলি ট্রেনে জানালার পাশে বসেছে। নতুন বউদের মাথাভর্তি ঘোমটা থাকার নিয়ম। মিলির মাথায় ঘোমটা নেই। সে জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকিয়ে আছে। প্ল্যাটফরমে আতাহার ও ফরহাদ দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ছাড়তে এখনো দেরি আছে। তারা ট্রেনের জানালার কাছে এসে গল্প করতে পারে, তা করছে না। চুপচাপ দূরে দাঁড়িয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে গল্প করলেও হত। তাও করছে না। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কেউ কাউকে চেনে না। দু'জন অপরিচিত মানুষ কি এমন ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকে? আতাহারকে সাধারণ একটা শার্ট-পেন্টে কি সুন্দর লাগছে।! ফরহাদকে লাগছে না। সে এমন কুঁজো হয়ে আছে কেন? সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না?

জহির উদ্দিন জানালার কাছে এসে বলল, মিলি, ট্রেন লেট হবে। তুমি চা খাবে?

মিলির হাসি পেয়ে গেল। লোকটার কাণ্ডকারখানা দেখে কাল রাত থেকেই তার হাসি পাচ্ছে। কিভাবে সে স্ত্রীর সেবা করবে, যত্ন করবে তা নিয়ে অতি ব্যস্ত। ব্যস্ততাটা যে খুব হাস্যকর লাগছে তাও লোকটা বুঝতে পারছে না।

তাদের বাসর হয়েছে জহির উদ্দিনের খালাতো বোনের বাড়িতে। রাত একটার দিকে জহির ব্যস্ত হয়ে বলল, মিলি, তোমার কি মাথা ধরেছে? বলেই সে পাঞ্জাবির পকেট থেকে প্যারাসিটামল ট্যাবলেট বের করল। তার স্ত্রীর মাথা ধরবে এই ভেবে লোকটা কি আগে থেকেই পাঞ্জাবির পকেট ভর্তি করে মাথাধরার অষুধ নিয়ে বসে ছিল?

মিলি বলল, মাথা ধরবে কেন?

'তুমি ভুরু কুঁচকাচ্ছ এই জন্যে বললাম। সারাদিনের টেনশানে মাথা ধরা তো স্বাভাবিক। আমার কখনো মাথা ধরে না। সেই আমারই মাথা ধরে গেছে।'

'না, আমার মাথা ধরেনি।'

রাতে ঘুমুতে যাবার সময় সে বলল, মিলি, তুমি খাটের কোনদিকে ঘুমুতে পছন্দ কর?'

'মিলি বলল, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'অনেকে খাটের দেয়ালের দিকে শুতে পারে না — এ জন্যে জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা তুমি বরং বাইরের দিকে শোও — বাতাস বেশি পাবে। ফ্যানের হাওয়া গায়ে লাগবে।'

মিলি মনে মনে হাসল। জহির উদ্দিন বলল, বাসররাতে নিয়ম হল সারারাত বাতি

জ্বালিয়ে রাখা। তুমি কি এই নিয়মটার কথা জান?'

'জানি।'

'নিয়মটা কোত্থেকে এসেছে জান?'

'বেহুলাকে সাপে কাটার পর থেকে এসেছে।'

'ঠিক বলেছ তো। মিলি, আলো জ্বালা থাকলে কি তোমার অসুবিধা হয়?'

'আমার কোন কিছুতেই অসুবিধা হয় না।'

'বিসকিট খাবে মিলি?'

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, বিসকিট খাবো কেন?

'আমি খবর নিয়েছি রাতে তুমি ভাল করে খাওনি। এই জন্যে বিসকিট এনে রেখেছি। খাবে? ভাল বিসকিট। দু'টা বিসকিট খেয়ে একগ্লাস পানি খাও।'

মিলির বিসকিট খাওয়ার কোন রকম ইচ্ছা ছিল না। শুধু লোকটার আগ্রহ দেখে বলল, আচ্ছা। বিসকিট এবং পানি খাওয়া হল।

জহির উদ্দিন বলল, তোমার ঠোঁটে বিসকিটের গুড়া লেগে আছে। দাড়াও মুছে দিচ্ছি। সে হাত দিয়ে মুছে দিল। মিলি মনে মনে হাসল। ঠোঁটে হাত দিতে ইচ্ছে করছে — হাত দিলেই হয়? এত ফন্দি কেন?

জহির উদ্দিন বলল, পান খাবে? পান খেলে মুখের মিষ্টি ভাবটা কাটা যাবে।

'পানও কি আপনার পাঞ্জাবির পকেটে?'

'না, ড্রয়ারে রেখেছি। স্টেডিয়াম থেকে এনেছি। স্টেডিয়ামে একটা পানের দোকান আছে — খুব ভাল পান বানায়।'

দু'জন দু'টা পান খেল। মানুষটার চেহারা মিলির মোটেই ভাল লাগছিল না। কি রকম বিশাল গোলাকার একটা মুখ! ঠোঁটের নিচে ফিনফিনে গোঁফ। কানগুলি ছোট ছোট। দাঁত ছোট ছোট — হাসলে কালো মাড়ি বের হয়ে পড়ে। তারপরেও গভীর রাতে লোকটার খুশি খুশি মনে পান খাওয়া দেখতে দেখতে মিলির মনে হল — লোকটা তো দেখতে খারাপ না। চেহারার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা ভালমানুষী লুকিয়ে আছে। বিশাল শরীরের ভেতর লুকিয়ে আছে লাজুক ধরনের ছোট্ট একটা শিশু। মিলির ইচ্ছা করতে লাগল সে তার হাত বাড়িয়ে দেয়। যেন লজ্জা ভেঙে লোকটা তার হাত ধরতে পারে। লোকটার লজ্জা আবার বেশি বেশি। এখনো স্ত্রীর হাত ধরেনি। শুধু একটা ফন্দি করে একবার ঠোঁট ছুঁয়ে দিয়েছে।

এই যে এখন জানালা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চা খাবে কিনা মিলিকে জিজ্ঞেস করছে। লোকটার আসল উদ্দেশ্য জানালা ধরার অজুহাতে মিলির হাত ছুঁয়ে দেয়া। মিলির দু'টা হাতই জানালায়। মিলি বলল, আমি চা খাব না, তুমি দেখ, ভাইয়ারা খাবে কিনা।

কত সহজে মিলি ভোরবেলা থেকে মানুষটাকে তুমি ডাকছে। যতবারই ডাকছে ততবারই কি যেন দলা পাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে চাচ্ছে। এর নাম কি ভালবাসা? এতদিন এই ভালবাসা কোথায় ছিল? এই ভালবাসার জন্ম কি শরীরে? দু'টা শরীর পাশাপাশি এলেই কি এই ভালবাসা জন্মায়? তাহলে তো খুবই ভয়ংকর কথা।

জহির উদ্দিন বলল, মিলি, এক কাজ করি, ছোট ভাইজানকে বলি আমাদের সঙ্গে যেতে। তুমি একা একা যাবে — তোমার খারাপ লাগবে। ছোট ভাইজান কয়েকদিন থেকে আসুক। বলব?

'আচ্ছা বল।'

'উনি বোধহয় যেতে চাইবেন না।'

'বললেই ও যাবে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে না বললেও ট্রেন যখন ছাড়বে ও লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠে পড়বে।'

মিলি হাসছে। হাসতে হাসতেই মিলির মনে হল —

বাবার মৃত্যুর পর এমন আনন্দ নিয়ে সে আর হাসেনি। এই প্রথম হাসল। বাবা কি অনেক দূরের কোন ভুবন থেকে মিলির এই হাসি দেখছেন?

ফরহাদ গাড়িতে উঠে বসেছে। জহির গেছে ফরহাদের জন্যে টিকিটের খোঁজে। আতাহার এখনো সেই আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকে একেবারে গাছের মত লাগছে। গাছও মাঝে মধ্যে বাতাস পেলে ডালপালা নাড়ায় — এই মানুষটা তাও নাড়াচ্ছে না। দাঁড়িয়েই আছে। মিলি হাত ইশারা করে ভাইকে ডাকল। আতাহার এগিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে নিতান্ত অনিচ্ছায় আসছে।

মিলি বলল, ভাইয়া, এত দূরে দাড়িয়ে আছিস কেন?

আতাহার বলল, খুব কাছ থেকে কিছু দেখা যায় না রে মিলি। ভাল করে দেখতে হলে একটু দূরে যেতে হয়। দূরে দাঁড়িয়ে তোর আনন্দ দেখছি।

'আনন্দ?'

'আনন্দ তো বটেই। আনন্দে তুই খাবি খাচ্ছিস। কাতলা মাছের মত স্বামী নিয়ে কোন মেয়েকে এত আনন্দিত হতে আমি প্রথম দেখলাম।'

মিলি রাগ করল না। হেসে ফেলল। আতাহার বলল, বড়ভাই হিসেবে তোর বিয়েতে তোকে কিছু দিতে পারলাম না। একটা টাকা নেই পকেটে, কোত্থেকে দেব বল? যাই হোক, তোর জন্যে একটা জিনিস নিয়ে এসেছি। ট্রেন ঠিক যখন ছাড়বে তখন তোর হাতে দেব।

'জিনিসটা কি?'

'তা বলা যাবে না।'

'ভাইয়া, তুই চাকরি-বাকরি কিছু করবি না?'

'করব না কেন? অবশ্যই করব। আজ থেকেই চাকরি খোঁজা শুরু করব।'

'মা'কে রোজ দেখতে যাবি।'

'মা'কে দেখতে যাওয়া অর্থহীন। কে তাকে দেখতে আসছে কে আসছে না, মা তা জানে না। কোমা-তে থেকে কিছু বোঝা যায় না। আমার ধারণা, কোমা-তে থেকে মা খুব কষ্ট পাচ্ছে। আমাদের উচিত মা'কে সহজভাবে মরতে দেয়া।'

'এই ধরনের কথা মনেও আনবি না। আমি নিশ্চিত মা কোমা থেকে ফিরে আসবে। কিছুদিন আগে আমি স্বপ্ন দেখেছি — তোর বিয়ে হচ্ছে। মা তোর বৌকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন।'

'বউটা দেখতে কেমন?'

'দেখতে বেশি ভাল না। রোগা কালো, দাঁতগুলি উঁচু উঁচু . . .'

আতাহার বিরক্ত গলায় বলল, স্বপ্নে একটা মেয়েকে দেখবি — তাকেও কুৎসিত দেখতে হবে? মেয়েদের ঈর্ষাবোধ এত প্রবল যে তারা স্বপ্নেও কোন সুন্দর মেয়ে দেখে না।

'মিলি হাসি হাসি মুখে বলল, ভাইয়া স্বপ্ন কি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে?'

'অবশ্যই করে। আমি এখন পর্যন্ত স্বপ্নে কোন অসুন্দর মেয়ে দেখিনি। আমার স্বপ্নে সব রূপবতীরা ভিড় করে।'

'তুই কবি-মানুষ, তোর কথা আলাদা।'

'সেটাও একটা কথা।'

'ভাইয়া, একটা পান খাব। মিষ্টি পান। আশা করি একটা মিষ্টি পান কেনার মত টাকা তোর কাছে আছে।'

'তা আছে।'

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। মিলি উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, ভাইয়া, ট্রেন তো ছেড়ে দিচ্ছে। তুই আমার উপহার দিলি না? দে, কবিতাটা দে। তুই যে পকেটে করে কবিতা নিয়ে এসেছিস সেটা আমি জানি। আতাহার কাগজটা হাতে দিল। ট্রেনের গতি বাড়ছে — আতাহারের হাঁটার গতিও বাড়ছে। জহির উদ্দিন জানালা দিয়ে গলা বের করে বলল, ভাইজান থামেন থামেন — একসিডেন্ট করবেন, একসিডেন্ট।

মিলি জলে ভেজা চোখ নিয়ে ভাইয়ের কবিতা পড়ছে। লেখাগুলি ঝাপসা লাগছে।

> শোন মিলি !
> দুঃখ তার বিষমাখা তীরে তোকে
> বিঁধে বারংবার।
> তবুও নিশ্চিত জানি, একদিন হবে তোর
> সোনার সংসার॥
> উঠোনে পড়বে এসে একফালি রোদ,
> তার পাশে শিশু গুটি কয়
> তাহাদের ধুলোমাখা হাতে — ধরা দেবে
> পৃথিবীর সকল বিস্ময়॥

মিলি ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। জহির উদ্দিন বিব্রত মুখে স্ত্রীর পাশে বসে আছে। মিলির কান্নায় ট্রেনের যাত্রিরা কিছু মনে করছে না। স্বামীর বাড়িতে যাবার সময় সব মেয়েই কাঁদে। কাঁদাটাই স্বাভাবিক।

কবি

মা'কে দেখে আতাহার ফিরে যাচ্ছিল। হাসপাতালের টানা বারান্দা, রাত বেশি বলেই বারান্দা নির্জন। হাসপাতালের নির্জন টানা বারান্দায় হাঁটতে আতাহারের গা সব সময়ই ছমছম করে। মনে হয়, এই বুঝি মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। কুঁজো বিকট-দর্শন এক বৃদ্ধ যার চোখে কোন পাতা নেই বলে পলক পড়ে না। যার গলার স্বর তীব্র, তীক্ষ্ণ ও হিম-শীতল। কথা বলার সময় এই বৃদ্ধের মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ লালা পড়ে। হাসপাতালের নির্জন বারান্দায় হাঁটার সময়ই শুধু আতাহারের মনে হয় মানুষের মাথার পেছন দিকে দু'টা চোখ থাকলে ভাল হত। পেছনে কেউ আসছে কিনা বোঝা যেত।

'কবি সাহেব, কেমন আছেন?'

আতাহার থমকে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে পেছন ফিরল। যদিও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। পেছন থেকে 'কবি সাহেব' বলে যে তাকে ডাকছে সে আর যাই হোক মৃত্যু নয়।

এপ্রণ পরা হাসি হাসি মুখের তরুণী আতাহারকে পেছন ফিরতে দেখে বলল, এ রকম চমকে উঠলেন কেন? ভয় পেয়েছেন?

আতাহার বলল, পেছন থেকে কেউ ডাকলেই আমি চমকে উঠি। তার উপর আপনি 'কবি সাহেব' ডাকলেন।

'মা'কে দেখে ফিরছেন?'

'জ্বি।'

আতাহার এই ডাক্তার মেয়েটিকে চেনে। কয়েকবার দেখা হয়েছে। কখনোই মেয়েটিকে তেমন রূপবতী মনে হয়নি। আজ হচ্ছে। রূপ সম্ভবত সময় ও পরিবেশ-নির্ভর। হাসপাতালের নির্জন টানা বারান্দায় সাধারণ রকম সুন্দর মেয়েকেও হয়ত অসাধারণ মনে হয়।

'মা'কে কেমন দেখলেন?'

'আগে যেমন দেখেছি এখনো তাই। জ্ঞান নেই — ডাকলে সাড়া দেন না। আজ কি আপনার নাইট ডিউটি?'

'জ্বি।'

সারারাত জেগে থাকবেন?'

'তা তো থাকতেই হবে।'

'সারারাত জেগে থেকে কি করেন?'

'যখন কাজ থাকে কাজ করি। যখন কাজ থাকে না — গল্পের বই পড়ি। বাসা থেকে গল্পের বই নিয়ে আসি।'

'কবিতা পড়েন না?'

'না, কবিতা পড়ি না।'

'আজ কোন্ বইটা পড়বেন?'

'আজ একটা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে এসেছি — Death in the maidem. আপনি পড়েছেন?'

'জ্বি না।'

'এর ছবিও হয়েছে। রোমান পলনস্কি ছবি করেছেন। ভিসিআর-এ প্রিন্ট পাওয়া যায়। আমি অবশ্যি এখনো দেখিনি। আপনি দেখেছেন?'

'জ্বি-না। আমাদের ভিসিআর নেই।'

ডাক্তার মহিলা চলে যাবার মত ভঙ্গি করেও আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। আতাহার নিজেও অবাক হচ্ছে হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এতগুলি কথা ডাক্তার মেয়েটা কেন বলল। মনে হয় সে রোগীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত। কিংবা কে জানে এই মেয়েটিরও হয়ত মৃত্যুর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবার ভয় আছে। একা বারান্দায় হাঁটতে গিয়ে ভয় পাচ্ছিল বলে আতাহারকে দেখে এতগুলি কথা বলছে।

আতাহার বলল, আপনার যখন ঘুম পায় তখন কি করেন?

'নাইট ডিউটি যখন থাকে তখন ঘুম পায় না। তারপরেও ঘুম পেলে চা-কফি খাই।'

'নিজেই বানিয়ে নেন, না বাইরে থেকে আনান?'

'নিজেই বানাই। ইলেকট্রিক কেটলি আছে — আপনার কি চা বা কফি খেতে ইচ্ছে করছে?'

'জ্বি-না। চা-কফি কোনটাই খেতে ইচ্ছে করছে না। আপনার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে করছে।'

ডাক্তার মেয়েটির চোখ তীক্ষ্ণ হতে গিয়ে হল না। রাগ করতে গিয়ে সে রাগ করল না। খানিকটা গম্ভীর গলায় বলল, আসুন। আমি তিন তলায় বসি। আপনার মা'র সঙ্গে আমার প্রায়ই কথা হত সেটা কি আপনি জানেন? আপনার মা কি আপনাকে কখনো বলেছেন?

'জ্বি-না।'

'আপনি যে একজন কবি সেটা আপনার মা'র কাছ থেকেই শোনা।'

'মা আমাকে বটু ডাকেন, সেটা কি জানেন?'

'হ্যাঁ জানি। তাও জানি।'

'আপনার নাম কি জানতে পারি?'

'আমার নাম হোসনা। এর মানে হচ্ছে সৌন্দর্য। নামকরণের সার্থকতা বিষয়ে কিছু লিখতে বললে আমার বাবা-মা বিপদে পড়বেন। আমি সুন্দর নই। আমার

আরেকটা নাম আছে বুড়ি। এই নামটা মোটামুটি সার্থক বলতে পারেন। আমাকে দেখে বুড়ি-বুড়ি লাগছে না?'

'জ্বি লাগছে।'

হোসনা ইলেকট্রিক কেটলিতে চা চাপিয়েছিল। আতাহারের কথায় চমকে গিয়ে তাকাল। আতাহার বলল, আপনাকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে বললাম — 'লাগছে'।

হোসনা চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে। ইলেকট্রিক কেটলিতে পানি অতি দ্রুত ফুটে। চা তৈরি হচ্ছে — তার অপেক্ষায় যে আনন্দ তা পাওয়া যায় না।

আতাহার বলল, আমার মা'র অবস্থাটা কি বলবেন?

'উনি 'ডীপ কমায়' আছেন।'

'তার থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা কতটুকু?'

'সম্ভাবনা কম। মেডিকেল সায়েন্স এই ডীপ কমা বিষয়ে তেমন কিছু বলতে পারে না। কেউ কেউ ফিরে আসেন। কেউ কেউ ফিরে আসে না। আট বছর কমাতে থেকে রোগীর জ্ঞান ফিরেছে, সে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছে, জীবন শুরু করেছে — এ রকম নজির আছে।'

'যে কমায় থাকে তার কি কোন কষ্ট হয়?'

'আমি জানি না।'

'যে ভদ্রলোক আট বছর কমায় থেকে নতুন জীবন পেয়েছেন তিনি এই বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'বললেও আমি পড়িনি।'

'যে রোগী কোমায় আছে তার পাশে বসে আমি যদি কথা বলি সে কি শুনবে?'

'আমি বলতে পারছি না।'

'আপনার এখানে সিগারেট খেতে পারি?'

'হ্যাঁ, খেতে পারেন।'

আতাহার সিগারেট ধরাল। হোসনা বলল, আপনি আপনার মায়ের পাশে বসে গুনগুন করে প্রচুর কথা বলেন। তাই না?

'জ্বি বলি। আপনি জানেন কিভাবে?'

'আমরা অনেকেই জানি। আপনি আপনার মা'কে কি বলেন?'

'কিছু বলি না। গল্প করি।'

'গল্প করেন?'

'জ্বি। আমি নানান কথা বলি, মা জবাব দেন।'

'হোসনা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কথা বুঝতে পারছি না — উনি জবাব দেন মানে কি?'

'মা'র জবাবগুলি আমি কল্পনা করে নেই।'

'ও, আচ্ছা।'

'এই টেকনিকটা আমি শিখেছি নীতুর কাছে।'

'নীতু কে?'

'নীতু আমার এক বন্ধুর বোন। ও করে কি জানেন? টিভি নাটক দেখার সময় সাউন্ড অফ করে দেয় — এবং পাত্র-পাত্রীদের ডায়ালগ কল্পনা করে নেয়। এতে নাকি গল্পটা অনেক ইন্টারেস্টিং করা যায়।'

'নীতু কি আপনার প্রেমিকা?'

'আরে না। সামনের মাসের ১১ তারিখ নীতুর বিয়ে হচ্ছে। আরো আগেই হত। হঠাৎ নীতুর শরীর খারাপ করায় ডেট পেছানো হয়েছে।'

'আজ আপনি আপনার মা'র সঙ্গে কি গল্প করলেন?'

'ঢাকায় কি ঘটছে না ঘটছে সব তাঁকে বললাম। দু'টা মজার রসিকতা করলাম। তারপর মা'কে জিজ্ঞেস করলাম — তাঁর কষ্ট হচ্ছে কি-না।'

'আপনার মা কি বললেন?'

'মা বললেন, হচ্ছে।'

'আপনি যখন আবার কোনদিন আপনার মা'র সঙ্গে কথা বলবেন তখন কি আমি পাশে থাকতে পারি?'

'হ্যাঁ, পারেন।'

'আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বি-না। আজ উঠি।'

আতাহার উঠে দাঁড়াল। হোসনা বলল, আসুন আমি একটা শর্টকাট পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি। মেয়েটির ভদ্রতায় আতাহার অবাক হয়ে গেল। মনে মনে সে বলল, বাহ, চমৎকার তো!

আতাহার হেঁটে হেঁটে ফিরছে। বড় মামার কারখানায় ফেরার ব্যাপারে কখনোই সে তেমন আগ্রহবোধ করে না। যত দেরিতে ফেরা যায় ততই ভাল। টিফিন কেরিয়ারে তার জন্যে খাবার টেবিলে থাকে। প্রতিদিন একই খাবার। ঠাণ্ডা কড়কড়া একগাদা ভাত। ডাল। একটা তরকারি। ভাতের উপর বিশাল এক টুকরা পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা কেন দেয়া হয় কে জানে। আতাহারের ঘরে আরো একজন থাকেন, অফিসের ম্যানেজার পরিমল বাবু। তিনি সারারাত কাশেন। 'রাত-কানা' মানুষ আছে, 'রাত-কাশি' লোকও যে আছে আতাহার জানত না। পরিমল বাবুকে দেখে জানল। দিনের বেলা ভদ্রলোক একবারও কাশেন না। তাঁর কাশি শুরু হয় সূর্য ডোবার পর পর। এক একবার আতাহারের মনে হয় — কাশতে কাশতে ভদ্রলোকের ফুসফুসের টুকরা-টাকরা বোধহয় বের হয়ে পড়বে। কাশির বেগ প্রচুর বেড়ে গেলে ভদ্রলোক বিছানায় উঠে চোখ বড় বড় করে বলেন — "আতাহার, কি দীর্ঘ জীবন ভগবান দিয়েছেন। জীবনটা ছোট হলে বাঁচতাম।"

সম্পূর্ণ উল্টো ধরনের কথা। তারাশংকরের উপন্যাসের এক নায়ক বলত —

"জীবন এত ছোট কেনে?" কে জানে কোনটা সত্য।

দু'টোই বোধ হয় সত্য। আতাহার পাঞ্জাবি খুলে বিছানায় বসল। গরম লাগছে। সিলিং ফ্যানটা বন্ধ। আতাহার ফ্যান ছাড়তে গেল। পরিমল বাবু বললেন, প্লীজ, নো নো।

আতাহার বলল, না কেন?

'বাতাসে বুকে ঠাণ্ডা বসে যায়। ঠাণ্ডা একবার বসে গেলে আমি আর বাঁচবনা ব্রাদার।'

'বেঁচে থেকে করবেন কি? দীর্ঘ জীবন নিয়ে কি হবে? মরে যাওয়াটা ভাল না? দেই ফ্যান খুলে?'

'নো নো। প্লীজ নো।'

'জানালাও দেখি বন্ধ করে রেখেছেন। দমবন্ধ হয়ে আমি নিজে মারা যাবো।'

'আমার দিকে তাকিয়ে একটু কষ্ট করুন।'

পরিমল বাবু কাশতে শুরু করেছেন। তাঁর চোখ ঠিকরে বের হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন — আতাহার এই দীর্ঘ জীবন আর সহ্য হচ্ছে না। জীবনটা ছোট হলে বাঁচতাম।

কবি

হোসেন সাহেব সুন্দর একটা পাঞ্জাবি পরেছেন। গলার কাছে কাজ করা শাদা পাঞ্জাবি। গায়ে হালকা সেন্ট দিয়েছেন। সকালে সেলুনে চুল কাটাতে গিয়েছিলেন। মূল উদ্দেশ্য চুল কাটা না, কানের দু'পাশে যেখানে চুল বেশি শাদা হয়ে গেছে সেখানে হালকা করে কলপ দেয়া। সেলুনের নাপিত কাজটা ভাল করেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হল — বয়স বেশ কয়েক বছর কমে গেছে।

তিনি অপেক্ষা করছেন আতাহারের জন্যে। আতাহারকে নিয়ে আজ তিনি নীতুর বিয়ের কয়েকটা চিঠি বিলি করবেন। সেই কয়েকটা চিঠির একটা হচ্ছে ফরিদার। মেয়ের মা হিসেবে দাওয়াতের একটা চিঠি ফরিদার প্রাপ্য। সেই চিঠি যদি তিনি নিয়ে যান তাতে ক্ষতি কিছু নেই বরং সেটাই স্বাভাবিক। মেয়ে তার নিজের বিয়ের চিঠি নিজে নিয়ে যাবে এটা লজ্জা ও অস্বস্তির ব্যাপার। সাজ্জাদের তো কিছুদিন ধরে কোন খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না। নিমন্ত্রণের এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি তিনি ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন না। কিংবা ডাকেও পাঠাতে পারেন না। সঙ্গত কারণেই তাকে যেতে হচ্ছে।

চিঠি দিয়েই চলে আসবেন সেটাও ভাল হবে না। কিছুক্ষণ বসতে হবে। সাধারণ কিছু কথাবার্তা বলতে হবে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে ছেলেটা কেমন — এইসব। কথা বলতে তাঁর অস্বস্তি লাগবে। যে মেয়েটি এক সময় তার স্ত্রী ছিল সে অন্যের স্ত্রী। তার সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও এক ধরনের গ্লানি আছে। থাকলেও কি আর করা। সহজ স্বাভাবিকভাবে গল্প করে চলে আসবেন। চা তো দেবেই। চা খাবেন। চা যখন দেবে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি যে চায়ে এক চামচ চিনি খান এটা ফরিদার মনে আছে কি না। অবশ্যই মনে থাকবে। মেয়েরা এইসব খুঁটিনাটি জিনিস খুব মনে রাখে। ফরিদার স্বামী বাসায় থাকলে খারাপ হবে না। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হবে।

সৌজন্যমূলক কথা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কি নিয়ে কথা বলবেন তাও মোটামুটি ঠিক করে রেখেছেন — তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব। বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম নিয়ে কথা বলতে সবাই ভালবাসে। ভদ্রলোকও নিশ্চয়ই তাঁর মতই বুড়ো। বিজ্ঞান নিয়েও আলোচনা করা যায়। স্টিফেন হকিংসের নতুন বইটা — কি যেন নাম 'Baby Universe' . . . বইটা কিনেছেন। এখনো পড়া হয়নি।

ফরিদার জন্যে একটা উপহার-টুপহার কিছু নেবেন কি-না এটা অনেক দিন

ধরেই ভেবেছেন। সাধারণ উপহার। যেমন ফুলের তোড়া . . . না, ফুলের তোড়া নেয়া ঠিক হবে না — বই নেয়া যেতে পারে। এক প্যাকেট চকলেট নেয়া যায়। এতে দোষের কিছু নেই।

আতাহারের আসার কথা ঠিক দশটায়। আতাহার দশটা বাজার পাঁচ মিনিট আগেই চলে এল। ভালই হল, মিনিট দশেক সময় পাওয়া গেল। এক কাপ কফি খেয়ে বিসমিল্লাহ্ করে রওনা দেয়া।

'কেমন আছ আতাহার?'

'জ্বি চাচা, ভাল।'

'তোমাকে খুব ফ্রেস লাগছে।'

'আপনি বলেছিলেন গোসল-টোসল করে ফ্রেস হয়ে আসবে। তাই এসেছি।'

'গুড, ভেরী গুড। নানান জায়গায় যাব তো —প্রেজেন্টেবল হয়ে যাওয়াই ভাল। এক কাপ কফি খেয়ে রওনা দি — কি বল?'

'জ্বি আচ্ছা।'

'নীতুর আবার জ্বর এসেছে — বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে মেয়েটা দু'দিন পরপর অসুখে পড়ছে। টেনশান থেকে হচ্ছে। বিয়ের ব্যাপারে এক ধরনের টেনশান সব সময় কাজ করে। এমন একটা মেয়েকে তুমি বিয়ে করছ যার সঙ্গে তোমার দীর্ঘদিনের পরিচয় কিংবা ইয়ে কি যেন বলে প্রণয়। তার সঙ্গে বিয়ে হলেও তুমি টেনশানে ভুগবে।'

'জ্বি, ঠিকই বলেছেন।'

'নীতুর মা'র সঙ্গে আমার যখন বিয়ে ঠিক হল — সে সময়ের কথাই ধর — তার সঙ্গে আমার অবশ্যি পূর্ব পরিচয় ছিল না। এরেঞ্জড ম্যারেজ। যাই হোক, বিয়ের দিন-তারিখ ফাইন্যাল হবার পর— টেনশানে রাতে আমি এক ফোঁটা ঘুমাতে পারি না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডাক্তার আমাকে লিকুইড ব্রোমাইড দিল। শুতে যাবার আগে দু'চামচ খেলে মরার মত ঘুম হবার কথা। আমি তিন চামুচ খেয়ে শুয়েছি, তারপরেও এক ফোঁটা ঘুম হয়নি।

'বলেন কি?'

'তুমি বস। আমি কফির কথা বলে আসি। না-কি চা খাবে?'

'একটা কিছু খেলেই হয়।'

'আরেকটা কথা — নীতুর মা'র জন্যে কোন উপহার-টুপহার কি কিছু নিয়ে যাব? ধর বই বা ফুল এই জাতীয় কিছু?'

'নিতে পারেন।'

'ও চকলেট পছন্দ করত। এক প্যাকেট ভাল চকলেট নিলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়।'

'শুধু চকলেট নেব না ফুলও নেব?'

'দু'টাই নিন।'

'অন্য কিছু ভাববে না তো আবার?'

'ভাবাভাবির কি আছে। একটা আনন্দ সংবাদ দিতে যাচ্ছেন — ফুল নিয়ে যাচ্ছেন। এতে ভাবাভাবির কি আছে?'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এই লাইনে চিন্তা করিনি। ঠিকই তো, আনন্দ সংবাদ দিতে যাচ্ছি, ফুল নিয়ে তো যাবই। এই ফুল হচ্ছে — মিলির বিয়ে হচ্ছে সেই আনন্দের ফুল। ধর, কোন রকম কারণ ছাড়া যদি আমি যেতাম, সঙ্গে এক গাদা ফুল, তাহলে তার ভিন্ন অর্থ হত। তা তো যাচ্ছি না। কথাটা তো তুমি খুবই ভাল বলেছ আতাহার। বাংলা প্রবচনে আছে — বুদ্ধি নিতে হলে তিন মাথাওয়ালা বুড়োর কাছে যাও। এখন তো মনে হচ্ছে তরুণদের মাথা বুড়োদের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। ভাল চকলেট কোথায় পাওয়া যায় জান আতাহার?'

'জ্বি না।'

'গুলশানের দিকে পাওয়া যাবে। ঐখানে কিছু ভাল ভাল দোকান আছে।'

'জ্বি, চলুন যাই।'

'কফি খেয়ে যাই। কফি খেতে আর কতক্ষণ লাগবে।'

ফরিদার গুলশানের বাড়িটা দোতলা। লাল এবং হলুদ বাগানবিলাসে ঝলমল করছে। মূল বাড়ি ঢাকা পড়েছে রঙের ভিড়ে। বাড়ির দারোয়ান তাদের নিয়ে ড্রয়িংরুমে বসাল। ছিমছাম সুন্দর ড্রয়িংরুম। নিচু দু'সেট সোফা, দেয়ালে কয়েকটা পেইনটিং। এতেই ঘরটা এত সুন্দর লাগছে! ঘরের দুই কোণায় মার্বেলের টেবিলে দু'টা ক্রিস্টালের মূর্তি। মূর্তি দু'টা দেখার মত। এসব বাড়িতে সাধারণত খুব দামী পার্সিয়ান কার্পেট থাকে। এ বাড়িতে কার্পেটের বদলে শীতল পাটি। আতাহার বলল, ড্রয়িংরুমটা তো সুন্দর করে সাজানো। হোসেন সাহেব তৃপ্তির সঙ্গে বললেন, ঘর-দুয়ার সাজানোর ব্যাপারে ফরিদার খুব ঝোঁক।

কাজের একটা মেয়ে দোতলা থেকে নেমে এসেছে। হোসেন সাহেব ফরিদা এসেছে ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার দেখাদেখি আতাহারও উঠে দাঁড়াল। কাজের মেয়েটিকে দেখে হোসেন সাহেব খুব লজ্জা পেলেন। মেয়েটি বলল, কার কাছে আসছেন?

'ফরিদার কাছে। ও আছে না?'

'জ্বি আছেন। আপনারা কি জন্যে এসেছেন? আপনাদের নাম?'

'তুমি গিয়ে বল নীতুর বাবা এসেছেন — হোসেন সাহেব। এই কার্ডটা নিয়ে দাও। কার্ড হাতে দিলেই বুঝবে।'

কাজের মেয়েটা কার্ড হাতে নিয়ে চলে গেল। হোসেন সাহেব আনন্দ নিয়ে বসার ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছে ঘরের পর্দাগুলি একটু যেন ময়লা। ঝকঝকে ইস্ত্রি করা পর্দা ছাড়া এ বাড়ি মানায় না। ফরিদাকে পর্দার কথাটা বলবেন কি-না বুঝতে পারছেন না। বললে মনে কষ্ট পেতে পারে। একটা আনন্দের দিনে মনে কষ্ট পাওয়া যায়, এমন কিছু বলা উচিত না।

কাজের মেয়েটি নেমে এল। আগের মতই গম্ভীর গলায় বলল, আম্মার শরীর ভাল না। শুয়ে আছে। নিচে আসতে পারবে না। বলেছে আপনাদের চা খেয়ে যেতে।

হোসেন সাহেব অবাক হয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন মেয়েটার কথা তিনি বুঝতে পারছেন না। আতাহার বলল, আমরা চা খেয়ে এসেছি। চা খাব না। আপনি ফুল আর চকলেটগুলি উপরে নিয়ে যান।

বর্ষা শেষের রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। ড্রাইভার গাড়ি চালাছে। হোসেন সাহেব এবং আতাহার পেছনের সীটে বসে আছে। আতাহার বলল, চাচা, আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

'না।'

'বাকি কার্ডগুলি কি আজ বিলি করবেন?'

'না, আজ থাক।'

'চলুন কোন জায়গা থেকে ঘুরে আসি।'

'কোথায় যাবে?'

'চিড়িয়াখানায় যাবেন চাচা? মাঝে মাঝে চিড়িয়াখানায় যেতে খুব ভাল লাগে।'

'চল যাই।'

আতাহার গাড়ির ড্রাইভারকে মীরপুরের দিকে যেতে বলল। হোসেন সাহেব ডাকলেন, আতাহার!

'জ্বি চাচা।'

'ফরিদার ব্যবহারে তুমি মনে কষ্ট পাওনি তো?'

'জ্বি না।'

'কষ্ট পেও না — বোধহয় কোন কারণে মন-টন খারাপ ছিল এই জন্যে দেখা করেনি। মানুষের মন বড় বিচিত্র আতাহার। মন একমাত্র জিনিস যার উপর মস্তিষ্কের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।'

'জ্বি চাচা।'

'আমরা ইচ্ছা করলে চোখের পাতা বন্ধ করি। হাত নাড়তে পারি, পা নাড়তে পারি কিন্তু ইচ্ছা করলেই হৃদপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করতে পারি না। কেন পারি না জান আতাহার?'

'জ্বি না, চাচা।'

'কারণ মন বাস করে হৃদপিণ্ডে। মনের উপর মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ নেই — এই কারণে।'

আতাহার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই বৃদ্ধ মানুষটির প্রতি মমতায় তার চোখে পানি এসে যাবার মত হচ্ছে।

কবি

মোসাদ্দেক সাহেব পেইনটিংটা শেষ করেছেন। তিনি ক্লান্ত, কিন্তু তাঁর চোখ ক্লান্ত না। তিনি প্রায় পলকহীন চোখে তাঁর শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে আছেন। ছবিটা এত সুন্দর হবে তিনি ভাবেননি। সাজ্জাদ যেমন বলেছিল তিনি ছবিটা তেমন আঁকেননি। প্রহর শেষের রাঙা আলোয় নৃত্যের দৃশ্য নয় — তিনি এঁকেছেন ভরা পূর্ণিমায় নৃত্যের ছবি।

এতে একটা বড় লাভ হয়েছে — মেয়েটির শরীরে তিনি জোছনার কাপড় পরিয়ে দিতে পেরেছেন। মেয়েটি নগ্ন, তারপরেও তাকে নগ্ন মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে প্রকৃতির একটা অংশ। মোসাদ্দেক সাহেবের মনে হল, এই ছবিটি এক্সিবিশনে পাঠাতে পারলে অনেকেই অপূর্ব একটা শিল্পকর্ম দেখতে পারত। তিনি ছবির শিরোনাম দিতেন —

"আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে"

ছবির মূল্য তালিকায় লিখে দিতেন — বিক্রয়ের জন্যে নয়। কিছু কিছু ছবির ভেতর আত্মা জেগে উঠে। আত্মা বিক্রি হয় না বলে সেই সব ছবির মূল্য তালিকায় লিখতে হয় — বিক্রয়ের জন্যে নয়।

আত্মা বিক্রয়ের জন্যে নয় — তাও কি ঠিক? আত্মাও বিক্রি হয়। কে যেন তার নিজের আত্মা শয়তানের কাছে বিক্রি করল। কি নাম তার —

ড: ফস্টাস?

নাকি মেফিস্টোফিলিস? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তিনি নিজেও কি তাঁর আত্মা বিক্রি করে দেননি? হ্যাঁ, বিক্রি করেছেন। খুব অল্প দামে বিক্রি করেছেন। মোসাদ্দেক সাহেব খাটের নিচ থেকে হুইস্কির বোতল বের করলেন। তিনি ক্ষুধার্ত। সকাল থেকে কিছু খাননি। এখন প্রায় তিনটার মত বাজে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় 'র' হুইস্কি দ্রুত কাজ করবে। অতি অল্প সময়ে তিনি ঘোর এবং আচ্ছন্নতার একটা জগতে পৌছে যাবেন। সেখান থেকে তিনি তাঁর আঁকা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ছবিটা প্রাণভরে দেখে নিতে হবে। কারণ সাজ্জাদ সন্ধ্যার দিকে এসে ছবিটা নিয়ে যাবে। ছবির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আত্মার একটা অংশও চলে যাবে। তাকে আর কখনো পাওয়া যাবে না।

মোসাদ্দেক সাহেব এক চুমুকে অনেকখানি হুইস্কি খেয়ে ফেললেন। মাথার শিরা

দপদপ করছে। হাতের আঙ্গুলগুলি মনে হচ্ছে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ধ্বক ধ্বক শব্দ হচ্ছে — কিসের শব্দ? হৃদপিণ্ডের শব্দ? নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হৃদপিণ্ডের শব্দ এত স্পষ্ট হয় — আগে লক্ষ্য করেননি তো! তিনি আরো খানিকটা হুইস্কি গলায় ঢাললেন। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল — তাঁর কাছে মনে হল ক্যানভাসে আঁকা মেয়েটা নাচছে। হেলোসিনেশন তো বটেই। প্রচুর মদ্যপান করলে এ রকম হয় — একটা মানুষকে দু'টা দেখা যায়। এই ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। মন্দ না তো। মেয়েটা তো ভারি সুন্দর করে নাচছে। নূপুরের শব্দ হচ্ছে না কেন? নাচলে নূপুরের শব্দ তো হবার কথা। নূপুরের শব্দ না হবার কারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট হল। মেয়েটির পায়ে তিনি নূপুর আঁকেননি। নূপুর এঁকে দেয়া যাক। কতক্ষণ আর লাগবে। তাঁর হাত অবশ্যি কাঁপছে। তবে এই কম্পন তুলি হাতে নেয়ামাত্র থেমে যাবে।

তিনি তুলি হাতে নিলেন। নৃত্যরতা মেয়েটি মনে হল তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল। নূপুর ছাড়া নেচে সেও বোধহয় আরাম পাচ্ছে না। মোসাদ্দেক সাহেব নূপুর আঁকতে বসলেন।

সাজ্জাদের ঘরে অনেকক্ষণ ধরে টেলিফোন বাজছে। সাজ্জাদ হাত বাড়ালেই টেলিফোন ধরতে পারে। তার ধরতে ইচ্ছা করছে না। টেলিফোনের শব্দে তার বিরক্তিও লাগছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে টেলিফোনটা খুব করুণ সুরে বাজছে। কান্নার একটা সুর আসছে। যন্ত্রটা কাঁদতে কাঁদতে বলছে — প্লীজ, আমাকে হাতে নাও। আমার প্রতি দয়া কর, তুমি আমাকে হাতে নাও।

সাজ্জাদ টেলিফোন হাতে নিয়ে সত্যি সত্যি কান্না শুনল — ওপাশ থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে যেন কাঁদছে।

সাজ্জাদ বলল, কে?

ওপাশ থেকে লীলাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি লীলা।

'কাঁদছ কেন?'

'আপনার উপহার পেয়েছি। লজ্জা, দুঃখ এবং অপমানে কাঁদছি।'

'ছবিটা তো খুব সুন্দর।'

'সাজ্জাদ ভাই — আপনি একজন ভয়ংকর অসুস্থ মানুষ। ভয়ংকর অসুস্থ।'

'সুস্থ-অসুস্থ পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। আমার কাছে অন্যদের অসুস্থ মনে হয়।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল। কান্না থামাও, কান্না থামিয়ে বল। কান্নার জন্যে আমি তোমার কোন কথাই শুনতে পারছি না।'

'আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় কখন থেকে আপনি জানেন?'

'মনে নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমার মনে থাকে না।'

'আমার তখন তের বছর বয়স। মাত্র তের বছর।'

'আনলাকি থার্টিন?'

'আনলাকি তো বটেই, নয়ত আপনার সঙ্গে দেখা হবে কেন? সেদিন আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছিল মনে আছে?'

'না'

'আমার মনে আছে। শুধু সেদিন না — এই পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমি যে ক'টা কথা বলেছি আমার সব মনে আছে। আমার প্রতিটি বাক্য দাড়ি–কমাসহ মুখস্থ আছে। আপনার স্মৃতিশক্তি আমার চেয়ে হাজারগুণে ভাল। কিছু কিছু মানুষের স্মৃতিশক্তি অপ্রয়োজনীয় তথ্য মনে রাখার জন্যে অসম্ভব ভাল। আমি সেই রকম একটা মেয়ে।'

'কান্না বন্ধ করে কথা বল লীলাবতী। আমি বেশির ভাগ কথাই বুঝতে পারছি না।'

'আপনার সব কথা না বুঝলেও হবে। আমার কথাগুলি বলা দরকার। আমি বলব তারপর টেলিফোন রেখে দেব।'

'আচ্ছা বেশ।'

'তের বছর বয়স থেকে আমার একটাই স্বপ্ন — আপনাকে পাশে পাওয়া। কত হাস্যকর ব্যাপার তার জন্যে করেছি শুনবেন? কার কাছে যেন শুনলাম আজমীর শরীফে গিয়ে যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। আমি মা'কে নিয়ে আজমীর শরীফ গেলাম। আপনি কি হাসছেন না?'

'না, হাসছি না। সিগারেট ধরিয়েছি। তারপর বল . . . '

'থাক, আর বলব না। শুনুন সাজ্জাদ ভাই, আপনি আমাকে কঠিন অপমান করেছেন। সেই অধিকার আপনার ছিল না। আপনি জানেন না — আমার জন্মদিনে এসে আমার খাটে ঠিক যে জায়গাটায় বসেছিলেন বাকি রাতটা আমি সেখানে বসেছিলাম — কারণ সেখানে আপনার গায়ের গন্ধ লেগে ছিল। আপনি কি হাসছেন সাজ্জাদ ভাই?'

'না। সিগারেট নিভে গিয়েছিল আবার ধরিয়েছি।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল।'

'আমি নাচ শিখেছিলাম শুধু আপনার জন্যে?'

'জানতাম না তো?'

'এগারো বছর বয়সে আপনার সঙ্গে যখন প্রথম দেখা তখন আপনি আমাকে বললেন — তুমি যে ড্রেসটা পরে আছ সেটা কি নাচের ড্রেস? তুমি কি এই অনুষ্ঠানে নাচবে? আমি বললাম, না। আপনি বললেন, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সুন্দর নাচতে পার।'

'ও, আচ্ছা।'

'সাজ্জাদ ভাই!'

'বল।'

'আপনি আর কোনদিন আমাদের বাসায় আসবেন না।'

'সেটা তো আগে একবার বলেছ।'

'আবার বললাম। আপনার দেয়ালে যে টেলিফোন নাম্বারটা লিখে রেখে এসেছি

সেটা মুছে ফেলবেন।'

'আচ্ছা। তুমি কি পেইনটিংটা নষ্ট করে দিয়েছ?'

'না। ছবিটা আমি সারাজীবন আমার শোবার ঘরে টানিয়ে রাখব। আমি ঠিক করেছি জীবনে আর কোনদিনই নাচব না। এক সময় নাচতাম সেই স্মৃতিটি ছবিতে থাকুক।'

'লীলাবতী, পেইনটিংটা কি সুন্দর হয়েছে?'

লীলাবতী কাঁদতে কাঁদতে বলল, হ্যাঁ।

'লীলাবতী, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

'না।'

'না বলছ কেন? আমার মনের কথা তোমার জানার কথা না।'

'আপনি নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালবাসেন না। এবং অন্য কারো ভালবাসাও বুঝতে পারেন না। আপনাকে আল্লাহ্ অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু ভালবাসার এবং ভালবাসা বোঝার ক্ষমতা দেন না।'

'হতে পারে।'

'টেলিফোন রেখে দিচ্ছি সাজ্জাদ ভাই।'

'আচ্ছা রেখে দাও। হ্যালো শোন, টেলিফোন রেখে দেবার আগে কি দু লাইন কবিতা শুনবে?'

'না।'

'মাত্র দু'টা লাইন। বেশী সময় লাগবে না।'

'আচ্ছা বলুন।'

সাজ্জাদ হাসতে হাসতে বলল,

তুমি থাক জলে আর আমি থাকি স্থলে
আমাদের দেখা হবে মরণের কালে।

কবি

আতাহার তার মা'র পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকল, 'মা' !

গভীর কমা থেকে ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন না। আতাহার নিজেই তাঁর প্রশ্নের জবাব দিল — কিরে বটু ?

'কেমন আছ মা ?'

'গভীর নিদ্রায় আছি। ভালই আছি। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস।'

'বসার জায়গা দেখছি না। নল-টল লাগিয়ে তোমাকে যা করে রেখেছে — বসতে গিয়ে কোনটা খুলে পড়বে — কি বিপদ হবে কে জানে।'

'বিপদ আর কি হবে। দাঁড়িয়ে থাকিস না, বোস।'

আতাহার সাবধানে মা'র পাশে বসল। ঘরে একজন নার্স ছিলেন, তিনি আতাহারের দিকে এক পলক তাকিয়ে বাইরে চলে গেলেন। এই ঘরে আলো বেশ কড়া। একটা আলো একেবারে চোখে এসে লাগছে। যে ঘরে রোগীরা গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন সেই ঘরের আলো অনেক নরম হওয়া উচিত। জিরো পাওয়ারের নীল বাতি জ্বলবে। খুব মৃদু সংগীত বাজবে। ঘুম পাড়ানো গান —

খোকা ঘুমুল
পাড়া জুড়ালো
বর্গি এল দেশে।

ঘরটা অন্যান্য ঘরের তুলনায় ঠাণ্ডা। এসির কারণেই ঠাণ্ডা। হিম-হিম ভাব। এটা ঠিক আছে। গভীর নিদ্রা এবং মৃত্যু দুইই শীতল। ঘর শীতল হবেই।

'তুই কতক্ষণ থাকবি রে বটু?'

'বেশিক্ষণ থাকব না মা। রাত দশটার ট্রেনে নেত্রকোনা যাচ্ছি। মজিদকে দেখতে যাচ্ছি।'

'কোন মজিদ ?'

'পাগলা মজিদ — তোমাকে যে মাসি ডাকতো সেই মজিদ। মনে পড়েছে ?'

'উহুঁ।'

'ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। মোটাগাটা, থপ থপ করে হাঁটে। তোমাকে মাসি ডাকায় তুমি বললে — বাবা, তুমি আমাকে মাসি ডাকছ কেন ? খালা ডাক। তখন সে বলল, আপনার হিন্দু হিন্দু চেহারা এই জন্যে আপনাকে মাসি ডাকছি। এখন মনে পড়েছে মা ?'

'হুঁ, মনে পড়েছে।'

'অনেক দিন তাকে দেখি না — দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'তুই একা যাচ্ছিস?'

'আমি একা যাব কি করে? আমার সঙ্গে কি টাকাপয়সা আছে? নেত্রকোনা যেতে ট্রেন ভাড়া লাগবে না? সাজ্জাদ আমাকে নিয়ে যাচ্ছে।'

'তোর হাতে টাকাপয়সা নেই?'

'কিচ্ছু নেই। কে এখন আমাকে টাকা দেবে? একশ' টাকা পরিমল বাবুর কাছ থেকে ধার নিয়েছিলাম — সেটা কবেই শেষ। উনি প্রতি দিন তিন-চারবার করে টাকাটা ফেরত চাইছেন। দিতে পারছি না।'

'তোর তো খুব খারাপ অবস্থা।'

'ভয়াবহ অবস্থা। তোমার অবস্থার চেয়েও একশ' গুণ ভয়াবহ। তুমি তো ঘুমে ঘুমে সব পার করে দিচ্ছ, কিছু টের পাচ্ছ না। আমি তো আর ঘুমুচ্ছি না। জেগে আছি।'

'সমস্যার কথা শুনতে ভাল লাগছে না রে বটু। ভাল কোন কথা বল।'

'ভাল কথা হচ্ছে — মিলি খুব সুখে আছে। ফরহাদ যে মিলির সঙ্গে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। সে চিঠিতে জানিয়েছে — ঐখানে থেকেই সে পড়াশোনা করবে।'

'ভালই তো। বোনের সঙ্গে থাকবে।'

'হুঁ ভাল।'

'তোর কি হবে?'

'বুঝতে পারেছি না মা।'

'তোর কবিতা লেখার কি হচ্ছে?'

'অনেক দিন কিছু লিখতে পারছি না।'

'কেন?'

'জানি না মা।'

'তোর মুখটা এমন শুকনা লাগছে কেন? দুপুরে কিছু খেয়েছিস?'

'খেয়েছি।'

'মিথ্যা কথা বলছিস কেন বটু?'

'ও আচ্ছা, খাওয়া হয়নি।'

'পেটে খিদে নিয়ে আমার পাশে বসে আছিস?'

'এখন আর বসে থাকব না, উঠে যাব।'

'এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবি কেন? তোর ট্রেন তো রাত দশটায়। এখন বাজে মাত্র আটটা। কমলাপুর যেতে কতক্ষণ আর লাগবে?'

'অনেকক্ষণ লাগবে। রাস্তায় খুব ট্রাফিক জ্যাম। তাছাড়া যাবার আগে এখানকার একজন মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করব। চা বা কফি খাওয়াবে।'

'বুঝেছি — বুড়ি। ও মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যায়। বড় ভাল মেয়ে।'

'হুঁ — একটু পাগলী ধরনের, তবে ভাল।'

'ওকে বিয়ে করবি?'

'কি আশ্চর্য, ওকে বিয়ে করব কেন?'

'তুই তো কিছুই করিস না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াস — মেয়েটাকে বিয়ে করলে অন্তত খাওয়া-পরার দুঃশ্চিন্তা থেকে বাঁচবি। তোর কি মেয়েটাকে পছন্দ হয় না?'

'পছন্দ হয়। যাদের পছন্দ হয় তাদের বিয়ে করতে নেই মা।'

'এটা আবার কেমন কথা?'

'বিয়ে করলেই রহস্য থাকে না।'

'তোর যে কি সব পাগলামী কথা!'

'মা, যাই?'

'চলে যাবি?'

'হুঁ।'

'আশ্চর্য, যাবার আগে তুই আমাকে একবার ছুঁয়েও দেখবি না?'

আতাহার মা'র কপালে হাত রাখল। কি অদ্ভুত অবস্থা!

ভালবাসা নিয়ে একজন স্পর্শ করছে। অন্যজন সেই স্পর্শ ফিরিয়ে দিতে পারছে না।

আতাহার ডাক্তার হোসনার ঘরের দিকে রওনা হল। তাকে পাওয়া যাবে কিনা কে জানে। হয়ত গিয়ে দেখা যাবে আজ তার নাইট ডিউটি নেই। ঘর তালাবন্ধ।

হোসনা টেবিল থেকে ড্রয়ার বের করে ড্রয়ারের জিনিসপত্র সারা টেবিলে ছড়িয়েছে। শিশি, বোতল, তুলা, কেঁচি, রাজ্যের জিনিস। আতাহারকে ঢুকতে দেখে বলল, কবি সাহেবের খবর কি?

আতাহার বলল, ভাল।

'মা'র সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'জ্বি।'

'কথা হয়েছে?'

'জ্বি, কথাও হয়েছে। আপনি কি খুঁজছেন?'

'টাং-ডিপ্রেসার — যা দিয়ে জিহ্বা চেপে ধরা যায়। জিহ্বা চেপে ধরলেই গলার ভেতরটা দেখা যায়।'

'খুঁজে পাচ্ছেন না?'

'পাব তো বটেই। সব ক'টা ড্রয়ার খুঁজতে হবে এবং মারফির সূত্র অনুসারে সবচে' শেষের ড্রয়ারে পাওয়া যাবে।'

'আজ তাহলে আমার চা খাওয়া হচ্ছে না।'

'না। আপনি বরং একটা কাজ করুন — কোন রেস্টুরেন্ট থেকে আমার একাউন্টে এক কাপ চা খেয়ে নিন।'

'আপনি টাকা দিচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু চা খাব নাকি? চায়ের সঙ্গে অন্য কিছুও খেতে পারি — চপ, সিঙ্গাড়া... ?'

হোসনা হেসে ফেলল। আতাহার লক্ষ্য করল, দারুণ ব্যস্ত ডাক্তার মেয়েও অন্যসব মেয়েদের মত সুন্দর করে হাসতে পারে।

'কবি সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনাকে আজ ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে কেন?'

'ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে, কারণ দুপুরে কিছু খাইনি।'

'সে কি? খাননি কেন?'

আতাহার হাসিমুখে বলল, মাঝে মাঝে উপোস দিতে ভাল লাগে। উপোস দিলে বোঝা যায় শরীর নামক একটা ব্যাপার আমাদের আছে। সেই শরীরের দাবী উপেক্ষা করা কঠিন।

'আপনি কি মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে পারবেন?'

'পারব।'

'তাহলে দয়া করে মিনিট দশেকের জন্যে বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমি টাং ডিপ্রেসারটা খুঁজে বের করে আসছি। আপনাকে আমার পরিচিত একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াব।'

'এখানে অপেক্ষা করলে অসুবিধা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমি কারো সামনে কিছু খুঁজতে পারি না।'

আতাহার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। স্ট্রেচারে করে একজন রোগীকে অতি ব্যস্ততার সঙ্গে নিয়ে [illegible]

পেক্ষা করা বোঝা যায় শরীর নামক একটা ব্যাপার আমাদের আছে। সেই শরীরের দাবী উ
কঠিন।

'আপনি কি মিনিট দশেক অপেক্ষা করতে পারবেন?'

'পারব।'

আমি টাং 'তাহলে দয়া করে মিনিট দশেকের জন্যে বারান্দায় গিয়ে অপেক্ষা করুন
টলে নিয়ে ডিপ্রেসারটা খুঁজে বের করে আসছি। আপনাকে আমার পরিচিত একটা হে
গিয়ে খাওয়াব।'

'এখানে অপেক্ষা করলে অসুবিধা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। আমি কারো সামনে কিছু খুঁজতে পারি না।'

ব্যস্ততার আতাহার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। স্ট্রেচারে করে একজন রোগীকে অ

মধ্যবয়স্ক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মনে হয় ওটি-তে নিচ্ছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে —
। একজন এই রোগীর মুখভর্তি হাসি। যেন সে আনন্দময় কোন কাজে রওনা হয়েছে
সবাই যদি মানুষ তার সমগ্র জীবনে কত অসংখ্য বিস্ময়কর মুহূর্তের সম্মুখীনই না হয়।
জন অন্য তাদের দেখা বিস্ময়কর মুহূর্তগুলো লিখে রাখত তাহলে চমৎকার হত — এ
একজনের সঙ্গে অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখতে পারত।

আতাহারকে চকচকে একশ' টাকার একটা নোট দিতে পেরে তার খুব ভাল লাগছে। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। পিটুইটারী গ্ল্যান্ড থেকে বিশেষ কোন এনজাইম হয়ত রক্তে চলে এসেছে। রক্ত সেই এনজাইম দ্রুত নিয়ে গিয়েছে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক সিগনাল পেয়ে আনন্দিত হয়েছে।

আতাহার টাকাটা খরচ করল না। রাতের খাওয়াটা সে সাজ্জাদের বাসায় সারতে পারে। খাওয়ার পর সাজ্জাদকে নিয়ে কমলাপুর রেল স্টেশনে চলে আসা। তাছাড়া এম্নিতে নীতুকে দেখার জন্যে হলেও তার যাওয়া দরকার। নীতুর জ্বর বেড়েছে। দেখতে যাওয়া উচিত। দু'দিন পর পর মেয়েটা অসুখে পড়ছে। বিয়ের আগে এত অসুখ-বিসুখ হলে বিয়ের দিন তাকে তো পুরোপুরি পেত্নীর মত লাগবে।

নীতু তার খাটে শুয়ে আছে। তার গায়ে হালকা খয়েরি রঙের একটা চাদর। তার ঘরের বাতি নেভানো। শুধু মাথার পাশের সাইড টেবিলে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সাইড টেবিলের পাশে এক গাদা কলা, কয়েকটা বেদানা এবং পলিথিনের ব্যাগে এক কেজির মত কালো আঙ্গুর। কামাল এইসব ফল-মূল নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই নীতুকে দেখে গেছে। সে প্রায় এক ঘন্টার মত ছিল। এই এক ঘন্টা সে নীতুর হাত ধরে বসেছিল। এখন কামাল নেই। কামাল যে চেয়ারে বসেছিল সেই চেয়ারে বসে আছেন হোসেন সাহেব। তিনিও নীতুর হাত ধরে বসে আছেন। নীতু ভাবছে — একেকজন মানুষ হাত ধরলে একেক রকম লাগে কেন? বাবা হাত ধরামাত্র তার সারা শরীরে প্রবল এক শান্ত ভাব ছড়িয়ে পড়েছে। মা যদি কোন এক অলৌকিক উপায়ে হঠাৎ উপস্থিত হতেন এবং তার হাত ধরতেন তাহলে নিশ্চয়ই অন্য রকম লাগত।

হোসেন সাহেব বললেন, শরীরটা এখন কেমন লাগছে রে মা?

নীতু বলল, ভাল।

'তোকে যে জিনিসে ধরেছে তার নাম ভাইরাস, অন্য কিছু না। ভাইরাস ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। মিউটেশনের ফলে ভাইরাস চেঞ্জ হচ্ছে — ক্রমেই বদলাচ্ছে। এন্টিবায়োটিক ভাইরাসের উপর কাজ করে না, এ হচ্ছে আরেক সমস্যা। বুঝতে পারছিস?'

'পারছি।'

'ভাইরাস জাতীয় সংক্রমণে প্রধান অষুধ হচ্ছে রেস্ট। রিলাক্সেশন এবং প্রচুর ভিটামিন-সি। গ্লাসভর্তি লেবুর সরবত খাবি, কমলার রস খাবি — দেখবি ভাইরাস কাবু হয়ে পড়ছে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং ভাইরাস বিষয়ে একটা চমৎকার কথা বলেছেন . . .'

নীতু বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বাবা, ভাইরাসের গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে না।

হোসেন সাহেব বললেন, ভাইরাসের গল্প শুনতে না চাইলে কি গল্প শুনতে চাস?

'কোন গল্পই শুনতে চাই না। তুমি চুপচাপ আমার হাত ধরে বসে থাক।'

'আচ্ছা। ঠিক আছে।. বসে থাকলাম।'

হোসেন সাহেব এক নাগাড়ে বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারেন না। তিনি উসখুস করতে লাগলেন। লিনাস পলিং-এর ভাইরাস ব্যাখ্যা তিনি কিছুক্ষণ আগে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা থেকে পড়ে এসেছেন। নীতুকে শোনাবার জন্যেই পড়া। মনে হচ্ছে পড়াটা জলে গেল।

নীতু বলল, বাবা, তোমাকে এখন খুব জরুরী একটা কথা বলি?

হোসেন সাহেব বললেন, বল।

'কথাটা শুনে তুমি আপসেট হয়ো না, ঘাবড়েও যেও না।'

হোসেন সাহেব শংকিত গলায় বললেন, কথাটা কি?

'আমি কামাল সাহেব নামের এই মানুষটাকে বিয়ে করব না।'

'কি বলছিস তুই?'

'আমি যা বলছি খুব ভেবেচিন্তে বলছি। আরো অনেক আগে বলা উচিত ছিল। আই এ্যাম সরি যে আগে বলিনি।'

'চিঠিপত্র সব দিয়ে দিয়েছি।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কামালকে কি বলব?'

'বলবে যে আমার মেয়ের ধারণা তুমি মহা লোভী একজন মানুষ। আমার মেয়ে লোভী মানুষ পছন্দ করে না।'

'আমার ধারণা অসুখ-বিসুখে তোর মাথাটা ইয়ে হয়ে গেছে।'

'আমার মাথা 'ইয়ে' হয়নি। মাথা ঠিক আছে। তুমি যাও তো বাবা, এখুনি গিয়ে টেলিফোন কর।'

'এখুনি টেলিফোন করতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখুনি করতে হবে।'

হোসেন সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, তুই বরং আরেকটু ভেবে-টেবে নে।

নীতু বিছানায় উঠে বসল। শান্ত গলায় বলল, আমার যা ভাবার আমি ভেবেছি — আর ভাবব না। তুমি যাও তো বাবা, টেলিফোন কর। হোসেন সাহেব বিরস মুখে উঠে দাঁড়ালেন। নীতু ড্রয়ার খুলে চিঠির কাগজ এবং কলম বের করল। তার গায়ে এখনো ভাল জ্বর। তাতে কিছু যায়-আসে না। জ্বর নিয়েও সে যা লেখার খুব গুছিয়ে লিখতে পারবে। হয়ত হাতের লেখা তত ভাল হবে না। ভাল না হলে না হবে। হাতের লেখা বড় কথা না, কি লেখা হচ্ছে সেটাই বড় . . .

আতাহার ভাই,

আপনি কেমন আছেন? চারদিন হল জ্বরে কষ্ট পাচ্ছি। এই চারদিনে একবারও মনে হল না — যাই মেয়েটাকে দেখে আসি। গতকাল বাসায় এসে ভাইয়ার সঙ্গে কিছুক্ষণ ফুসফাস করে চলে গেলেন। আমি নিশ্চিত ছিলাম আপনি আমাকে দেখতে আসবেন। কাজেই খুব তাড়াহুড়া করে শাড়ি পরলাম। আমি দেখতে খারাপ তো — শাড়ি পরলে মাঝে-মধ্যে একটু ভাল দেখায়, তাই শাড়ি পরা —

আপনি আসেননি। আমি পরে খোঁজ নিয়েছি, আমার জ্বর সম্পর্কে কিছু জানতেও চাননি।

দরজায় পায়ের শব্দ হল। নীতু চিঠি লেখা বন্ধ করে তাকাল। আতাহার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আতাহার বলল, কয়েকদিনের জ্বরে তুই দেখি একেবারে শুটকি হয়ে গেছিস। শুটকির দোকানে তোকে ঝুলিয়ে রাখলে ছুড়ি মাছের শুটকি হিসেবে বিক্রি হয়ে যাবি।

নীতুর চোখ ভিজে উঠার উপক্রম হল। সে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'করছিস কি?'

'চিঠি লিখছি।'

'প্রেমপত্র?'

'হ্যাঁ, প্রেমপত্র?'

'দু'দিন পর তো বিয়েই হচ্ছে — এর মধ্যে প্রেমপত্র লেখার দরকার কি?'

'আপনি কেন শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন?'

'তোকে বিরক্ত করছি?'

'হ্যাঁ, বিরক্ত করছেন। দয়া করে নিচে যান। চা-টা খেয়ে বিদেয় হোন।'

'অসুখে কাতর হয়ে আছিস, রোগী দেখে যাই — জ্বর আছে এখনো?'

'আতাহার ভাই, আপনি যান তো।'

'আচ্ছা রে ভাই যাচ্ছি। খ্যাক খ্যাক করিস না। প্রেমপত্র — লিখে শেষ কর। মেজাজ আকাশে তুলে রাখলে সুন্দর সুন্দর শব্দ মনে আসবে না। শুধু মনে আসবে কঠিন কঠিন তৎসম শব্দ — উৎপ্রেক্ষা, শ্লাঘা, বজ্রনাদ, বৃকোদর — এই টাইপ শব্দ।'

'আতাহার ভাই, আপনি যান।'

আতাহার চলে গেল। পরের তিন মিনিট নীতু ব্যাকুল হয়ে কাঁদল। চিঠিটা লেখার চেষ্টা করল। আসলেই সে এখন আর চিঠি নিয়ে এগুতে পারছে না। নীতু ঠিক করল, চিঠি না, যা বলার সরাসরি বলাই ভাল। আজ বলাই ভাল। আতাহার ভাইকে সে ছাদে ডেকে নিয়ে যাবে, তারপর এতদিনকার জমানো কথা সব বলবে। কাঁদতে কাঁদত বলবে। নীতু বাথরুমে ঢুকে চুল আচড়াল। অসুস্থ অবস্থায় মুখে পাউডার দিতে নেই — তারপরেও মুখে হালকা করে পাউডার দিল। ঠোঁট ফ্যাকাসে হয়ে আছে। হালকা করে একটু লিপস্টিক কি দেয়া যায় না? এমন হালকা করে দেয়া যেন কেউ কিছু বুঝতে না পারে। টিপের পাতাটা শেষ হয়ে গেছে। রোজ ভাবে আনাবে — আনানো হয় না। আজ একটা কাগজের উপর বড় বড় করে লিখবে 'টিপ', তারপর সেই কাগজটা আয়নার উপর স্কচ টেপ দিয়ে লাগিয়ে দেবে, যাতে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে আয়নার দিকে তাকালেই মনে পড়ে — টিপ কিনতে হবে।

নীতু নিচে নেমে এসে শুনল, আতাহার এবং সাজ্জাদ রাতের ট্রেনে নেত্রকোনা যাবে বলে বের হয়ে গেছে।

কবি

ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক আবদুল মজিদের ছাত্রীমহলে ভাল সুনাম আছে। ইনি ভাল পড়ান। ক্লাস ফাঁকি দেন না। ছাত্রীদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন না। ছাত্রীদের যখন পড়া জিজ্ঞেস করেন, তাদের চোখের দিকে তাকিয়েই করেন, কখনো তাদের বুকের উপর চোখ রেখে করেন না।

ছাত্রীরা আবদুল মজিদ সাহেবের কাব্যপ্রতিভার কিছু জানে না। দুর্দান্ত এই আধুনিক কবি, যাঁর একটি কবিতার নাম —

$$(\text{ঈশ্বর})^{\frac{১}{৩}} \times (\text{মৃত্যু})^{\frac{২}{৩}} = 0$$

প্রকাশিত হবার পর যে মোটামুটি হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে ছাত্রীরা অজ্ঞ।

ছাত্রীদের এই সম্মানিত শিক্ষক প্রতি শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করতে যান। কারণ তিনি থাকেন ওয়াদুদ সাহেবের বাড়িতে। ওয়াদুদ সাহেব গার্লস কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। এই অঞ্চলের ধনবান এবং ক্ষমতাবান ব্যক্তি। ওয়াদুদ সাহেবের নেক নজর লাভ করা ভাগ্যের কথা। আবদুল মজিদ তা লাভ করেছে। ওয়াদুদ সাহেব মজিদকে থাকার জন্যে নিজের বাড়ির একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। মজিদের জন্যে তার বাড়ির ভেতর থেকে খাবার পাঠানো হয়। বিনিময়ে মজিদকে ওয়াদুদ সাহেবের তৃতীয়া কন্যা জাহেদা খাতুনকে ঘন্টাদুই করে পড়াতে হয়। জাহেদা খাতুন এই বৎসর ইন্টারমিডিয়েট দেবে। সে পড়াশোনায় ভাল। এসএসসি-তে স্টার পেয়েছে। ইন্টারমিডিয়েটেও ভাল করবে।

জাহেদা খাতুন দেখতেও সুন্দর। কাটা কাটা চোখ-মুখ। মাথা ভর্তি চুল। স্যারের কাছে পড়তে যখন আসে তখন বেশ সেজেগুজে আসে। যেমন — চোখে কাজল থাকে। মেয়েটি খুবই শান্ত, চোখ তুলে তাকায় না বললেই হয়। আবদুল মজিদ যখন বলে — বুঝতে পারছ? জাহেদা তখন এত দ্রুত মাথা নাড়ে যে, মজিদের মনে হয় মেয়েটার মাথা বোধহয় শরীর থেকে ছিঁড়ে পড়ে যাবে। তার একেকবার বলতে ইচ্ছে করে — জাহেদা, এ রকম করে মাথা ঝাঁকিও না। মাথা ঘাড় থেকে খুলে পড়ে যাবে। তুমি কন্ধকাটা হয়ে যাবে। মজিদ বলে না, কারণ তার ধারণা মেয়েটা রসিকতা বুঝবে না। এই জাতীয় কোন কথা বললে কেঁদে-টেদে একটা কাণ্ড করবে। মূর্তির মত একটা মেয়েকে পড়াতে ভাল

লাগার কথা না, কিন্তু মজিদের ভাল লাগে।

শুক্রবার ছুটির দিন। জাহেদা শুক্রবারে পড়তে আসে না। এইদিন বিকেলের পর থেকে মজিদের খুব অস্থির লাগে। নিজের উপর রাগ লাগতে থাকে। যদিও রাগ লাগার কোনই কারণ নেই। সাপ্তাহিক ছুটি তো থাকবেই। একদিন পড়তে না এলে কি হয়? শুক্রবার ছাড়াও মেয়েটা অন্যান্য দিন হঠাৎ হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই পড়তে আসে না। মজিদ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভেতর বাড়ি থেকে মোটাসোটা একটি কাজের মেয়ে এসে বলে, রাঙ্গা আফা আইজ পড়ত না।

মজিদ গম্ভীর মুখে বলে, আচ্ছা। বলার পরেও সে নিজের চেয়ারে বসে থাকে। তার উঠে যেতে ইচ্ছা করে না। পরীক্ষার আগে আগে এরকম কামাই দেবার মানে কি? একদিন সে জাহেদাকে বলল —

'শোন জাহেদা, কোন কারণ ছাড়া হুট করে পড়া বন্ধ করবে না। পরীক্ষা ঘাড়ের উপর চলে এসেছে। এই সময় পড়া বন্ধ করবে না। মনে থাকবে?'

জাহেদা তার স্বভাবমত প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়েছে।

'শুক্রবারে তুমি আস না এটাও ঠিক না। আমি তো আর অফিস খুলে বসিনি যে শুক্রবারে অফিস ছুটি। আমি যখন আছি তখন তোমার পড়তে আসার সমস্যা কি? এরপর থেকে শুক্রবারেও আসবে।'

জাহেদা আবার মাথা নেড়েছে। তার সেই বিখ্যাত মাথা নাড়া। মনে হচ্ছে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

জাহেদা শুক্রবারে পড়তে আসেনি। শুধু শুধুই মজিদ অপেক্ষা করেছে। শেষে মেজাজ এত খারাপ হয়েছে যে, রাতে যখন নসু নামে কাজের ছেলেটা ভাত নিয়ে এসেছে তখন বলেছে — ভাত নিয়ে যাও। ভাত খাব না।

নসু বলেছে, খাইবেন না ক্যান?

'শরীর ভাল না। মনে হয় জ্বর।'

'রুটিপিঠা খাইবেন?'

'কিছুই খাব না। তুমি এইসব নিয়ে যাও তো।'

নসু টিফিন কেরিয়ার নিয়ে চলে গেল। মজিদের ক্ষীণ সন্দেহ হল, জ্বরের কথা শুনে হয়ত জাহেদা তাকে দেখতে আসবে। দেখতে আসাটাই স্বাভাবিক। সে তার শিক্ষক। যথেষ্ট যত্ন নিয়ে তাকে সে পড়াচ্ছে। সেই শিক্ষকের শরীর খারাপ, জ্বর। জ্বর বেশি বলেই রাতের খাবার খায়নি। এ রকম অবস্থায় সাধারণ ভদ্রতা হচ্ছে ছাত্রীর এসে খোঁজ নেয়া।

মজিদ গরমের মধ্যেই একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিল। জাহেদা যদি এসে দেখে সে হাফ শার্ট গায়ে দিয়ে ঘুরছে তাহলে সে কি ভাববে?

জাহেদা দেখতে এল না। শুধু তাই না, পরের দিন পড়তে এসে একবারও জিজ্ঞেস করল না — স্যার, আপনার শরীর এখন কেমন?

মেয়েটা যদি কথাবার্তা বলতো তাহলে অনেক মজা করা যেত। মজিদ কয়েক লাইন কবিতা মেয়েটার হাতে দিয়ে বলত —

'জাহেদা — কবিতাটা মন দিয়ে পড়ে আমাকে বল অর্থ কি?'

জাহেদা মাথা ঝাঁকিয়ে বলত, আমি পারব না স্যার।

'না পড়েই বললে পারব না। এটা তো ঠিক না। আগে পড়, খুব মন দিয়ে পড়।'

"জানি না ওপাশে কে আছে।
হেসে হেসে কি কথা সে কয়?
দাঁড়ায় না পায় শুধু ভয়।"

'কবিতাটার তো স্যার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মন দিয়ে পড়ছ না। মন দিয়ে পড়লেই বুঝতে।'

'হাজারো মন দিয়ে পড়লেও কিচ্ছু বুঝব না। আপনি বুঝিয়ে দিন।'

'প্রতিটি বাক্যের প্রথম অক্ষরটা নিয়ে দেখ কি হয়? প্রথম বাক্যের প্রথম অক্ষর জা, দ্বিতীয়টার হে, তৃতীয়টার দা। কি হল?'

'আপনার মাথা হল।'

'স্যারের সঙ্গে এ আবার কি ধরনের কথা?'

'স্যারেরই বা কি ধরনের কাণ্ড! ছাত্রীকে নিয়ে কবিতা লেখা! তাও যদি ঠিকমত হত। দাঁড়ায় বানান হল চন্দ্রবিন্দু দিয়ে — তাহলে নামটা হয় "জাহেদাঁ"। মনে হচ্ছে ভূতের নাম।'

'তোমার নামটা এরকম যে সুন্দর কবিতা হয় না।'

'তাহলে আমাকে আপনার পড়ানো দরকার নেই। এমন কাউকে পড়ান যার নাম দিয়ে সুন্দর কবিতা হয়।'

জাহেদা ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মজিদ হাত ধরে তাকে বসাতে গেল। শক্ত করে হাত ধরতে গিয়ে কাঁচের চুড়ি একটা ভেঙে গেল। গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। মজিদ বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, ইশ! হাত কেটেছে!

জাহেদা বলল, হাত কাটুক কিন্তু আমার চুড়িটা যে ভেঙেছে তার কি হবে? এত শখ করে কাঁচের সবুজ চুড়ি কিনেছি। আপনি কি জানেন — সবুজ চুড়ি পাওয়া যায় না? আপনি কি কিনে দিবেন সবুজ চুড়ি?

এইসব হাস্যকর পরিকল্পনা মজিদ কেন করে সে জানে না। জাহেদা হাতে কাঁচের চুড়ি পরে না। তার হাত ধরার কল্পনাটা তো ভয়াবহ। একবার জাহেদার হাত থেকে কলম নেবার সময় হাতে হাত লেগে গিয়েছিল। এতে জাহেদা যেভাবে চমকে উঠে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল তা দেখে মজিদর প্রায় দু'দিন মন খারাপ ছিল। এরপর থেকে কলমের দরকার হলে সে বলে, জাহেদা, কলমটা দাও তো। জাহেদা কলম দেয়। তবে হাতে দেয় না, তার সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখে। তখন মজিদের নিজেকে খুব তুচ্ছ, খুব

ক্ষুদ্র মনে হয় — ইচ্ছে করে ওয়াদুদ সাহেবকে বলে, আপনার নৈঃশব্দবতী কন্যাকে আমি পড়াব না। তার জন্যে অন্য মাস্টার রাখুন। সবচে' ভাল হয় যদি মাস্টারের বয়স ৮০-র উপরে হয় এবং মাস্টার সাহেবের দু'টা হাত হয় কাঠের।

এই জাতীয় কথা কখনো বলা হয় না। মজিদ সন্ধ্যার পর থেকে তীব্র আনন্দ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে — কখন আসবে জাহেদা। এক পলক তার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে বসবে চেয়ারে, পরবর্তী দেড় ঘন্টা সেই মাথা সে আর উঁচু করবে না।

মজিদ তার ছাত্রীর জন্যে অপেক্ষা করছিল। জাহেদা আসতে দেরি করছে। মজিদের বুক ধড়ফড় করতে লাগল — আজ আবার কোন কারণে সে আসা বাদ দেবে না তো? কাজের মেয়েটা এসে বলবে না তো — রাঙ্গা আফা আইজ পড়ব না।

না, তা হবে না। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মজিদ পায়ের শব্দে কাউকে চিনতে পারে না — শুধু একজনকে পারে। এটাও কি খুব আশ্চর্য ব্যাপার না? বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষ হেঁটে গেলে সে বলতে পারবেনা কে হেঁটে যাচ্ছে — শুধু জাহেদা হেঁটে গেলে বলতে পারবে। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা কোনদিন মেয়েটি জানবে না — এই ট্রাজেডির কোন তুলনা হয়?

জাহেদা চেয়ারে এসে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নসু এসে বলল, ঢাকা থাইক্যা আফনের দুই বন্ধু আসছে — নাম বলছে সাজ্জাদ আর আতাহার।

দু'জনই মজিদের অতি প্রিয়জন। অনেক দিন সে তাদের দেখে না, আনন্দে মজিদের লাফিয়ে উঠা উচিত। কিন্তু মজিদের মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল। তার ইচ্ছা করল সে চিৎকার করে বলে — এদের চলে যেতে বল। এদের আমি চিনি না।

মজিদ জাহেদার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ আমি পড়াব না। কাল বেশি করে পড়াব। কেমন?

নৈঃশব্দবতী কথা বলল না, শুধু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

সাজ্জাদ বলল, কিরে মজিদ, তোকে এ রকম লাগছে কেন?

'কি রকম লাগছে?'

'তোর কি যেন হয়েছে — তোর মধ্যে ঘর-জামাই ঘর-জামাই ভাব চলে এসেছে।'

মজিদ হাসল। তবে ঠিকমত হাসতেও পারল না। হাসিটা কেমন যেন ঠোঁটের কোণায় ঝুলে রইল।

সাজ্জাদ বলল, বোকার হাসি কবে থেকে শিখলি? ও মাই গড! কি অদ্ভুত করে হাসছিস! হয়েছে কি?

'কি আবার হবে?'

'ঝেড়ে কাশ তো। ঝেড়ে কাশ।'

'কফ থাকলে তবে না ঝেড়ে কাশব — কফ নেই।'

সাজ্জাদ আতাহারের দিকে তাকিয়ে বলল, আতাহার, বল তো ঠিক করে ওকে কেমন লাগছে?

'ওকে গৃহস্থের মত লাগছে।'

মজিদ আবারো হাসল। সে এখনো ধাতস্থ হতে পারেনি। তবে বন্ধুদের দেখে এখন আনন্দ হচ্ছে। রক্তে পুরানো স্মৃতি জেগে উঠেছে। একে বোধ হয় বলে রক্ত উজানে যাওয়া।

মজিদ বলল, তোদের পরিকল্পনা কি?

সাজ্জাদ বলল, তোকে নিয়ে ফুল-মুন দেখব।

'আজ ফুল-মুন না-কি?

আতাহার বলল, আজ ফুল-মুন নাকি তাও জানিস না? তোর হয়েছে কি? তুই কি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিস ?

'উহুঁ।'

'অবশ্যই ছেড়ে দিয়েছিস। তোকে দেখেই মনে হচ্ছে তুই বর্তমানে মফস্বলি অধ্যাপক। আজ রাতের জন্যে অধ্যাপকী খোলসটা ঝেড়ে ফেলে দে।'

মজিদ শংকিত গলায় বলল, ঝেড়ে ফেলে কি করব?

সাজ্জাদ বলল, আমরা ত্রিমূর্তি বোহেমিয়ান জীবনে ফিরে যাব। তোদের এখানে ব্রথেল আছে না?

মজিদ আঁতকে উঠে বলল, কি সর্বনাশের কথা!

'আছে কিনা সেটা বল।'

'আছে তো নিশ্চয়ই। তবে কোথায় তা জানি না।'

সাজ্জাদ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ওদের কয়েকটাকে ধরে এনে চল নদীর পাড়ে চলে যাই। চাঁদের আলোয় ধেই ধেই করে নাচানাচি করব।

'পাগলের মত কথা বলিস না তো।'

'পাগলের মত কথা মানে? আজ রাতটা হবে নাইট অব দ্যা পোয়েটস।'

'এখানে এসব সম্ভব না।'

'অবশ্যই সম্ভব। ইমপসিবল ইজ দ্যা ওয়ার্ড ফাউন্ড ওনলি ইন দ্যা ডিকশনারি অব ফুলস। তুই তো বোকা না। তোদের এখানে নদী আছে?'

'হুঁ।'

'ছোট না বড়?'

'ছোট তবে এখন ভাল পানি আছে।'

'একসেলেন্ট। বজরা ভাড়া পাওয়া যাবে?'

'জানি না। খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে। তবে ব্রথেলের মেয়েদের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর কর।'

'মেয়ে ছাড়া নাইট অব দ্যা পোয়েটস হবে কি ভাবে? এ বাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে

ভাব-টাব হয়নি? ভুলিয়ে ভালিয়ে তাকে নিয়ে চল।'

মজিদ হড়বড় করে বলল, ওয়াদুদ সাহেবের কোন মেয়ে নেই। উনার দুই ছেলে। দোস্ত আরেকটা কথা, এই বাড়িতে কোন মদ খাওয়া-খাওয়ি হবে না। এরা অসম্ভব রকম কনজারভেটিভ।

সাজ্জাদ বলল, আমাদের মুখ থেকে মদের গন্ধ পেলেই রগ কেটে ফেলবে?

'প্রায় সে রকম।'

'জেনে-শুনে তুই এই জায়গায় পড়ে আছিস? ব্যাপারটা কি? তুই ঝেড়ে কাশ তো সোনামণি।'

সোনামণি ঝেড়ে কাশতে পারল না। সে চাচ্ছে দ্রুত বন্ধুদের নিয়ে বের হয়ে পড়তে। মাগরিবের নামাজের পর ওয়াদুদ সাহেবের বাড়ি ফেরার সময় হয়ে গেছে। মজিদ চাচ্ছে না তার বন্ধুদের সঙ্গে ওয়াদুদ সাহেবের দেখা হোক। সাজ্জাদের মুড ভাল থাকলে অসম্ভব ভদ্র ব্যবহার করবে। ওয়াদুদ সাহেব তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মুড খারাপ থাকলে সে ওয়াদুদ সাহেবকেই হাসিমুখে বলবে, স্যার, কিছু মনে করবেন না — আপনাদের এখানকার ব্রথেলটা কোন দিকে?

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়' — এই প্রবচন সত্য প্রমাণ করার জন্যেই — ওয়াদুদ সাহেবের সঙ্গে সবার দেখা হয়ে গেল। মজিদ চাপা আতংক নিয়ে বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিল। সাজ্জাদের এসএসসি এবং অনার্সের রেজাল্টের কথা বলতে ভুলল না। ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনারা এই সন্ধ্যাবেলা যাচ্ছেন কোথায়? বিশ্রাম করেন। খাওয়া-দাওয়া করেন।

সাজ্জাদ বলল, স্যার, আমরা গ্রামের জোছনা দেখতে এসেছি। রাতে খাওয়া-দাওয়া করব না।

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, রাতে খাওয়া-দাওয়া করবেন না মানে? জোছনা খেয়ে পেট ভরে?'

'ঠিকমত খেতে পারলে জোছনা খেয়েও পেট ভরে। বেশিরভাগ মানুষ জোছনা খাওয়ার টেকনিক জানে না।'

ওয়াদুদ সাহেব বিস্মিত হয়ে মজিদের দিকে তাকালেন। মজিদ অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমরা চলে আসব। রাত একটু বেশি হবে কিন্তু চলে আসব।

'যাচ্ছ কোথায়?'

মজিদ বলল, নদীর ধারে হাঁটব।

ওয়াদুদ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, নদীর পাড়ে মানুষ হাঁটে? নদীর পাড় হল পায়খানা করার জায়গা।

সাজ্জাদ বলতে যাচ্ছিল — আমরা পায়ে 'গু' মাখার জন্যেই ঐদিকে যাচ্ছি। অনেকদিন পায়ে 'গু' মাখা হয় না। মজিদের করুণ মুখ দেখে বলল, স্যার, আমরা খুব সাবধানে হাঁটব। আমার নাক কুকুরের নাকের মত। এক মাইল দূর থেকে গন্ধ পাই।

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনারা জোছনা দেখতে চান তো আমার একটা খামার

বাড়ির মত আছে, সেখানে চলে যান না। সুন্দর বাগান আছে, টিনের একটা ঘর আছে, পাশ দিয়ে নদী গেছে। ইচ্ছা করলে নদীর পাড় ধরে হাঁটতেও পারেন।

সাজ্জাদ বা আতাহার কিছু বলার আগেই — মজিদ হড়বড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।

'নসুকে বলে দেই, নসু তোমাদের নিয়ে যাবে।'

'জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।'

'বেশি দেরি করবেন না। চলে আসবেন। একসঙ্গে খানা খাব।'

আবারো মজিদ হড়বড় করে বলল, জ্বি আচ্ছা। জ্বি আচ্ছা।

সাজ্জাদ বলল, স্যার, আপনি খেয়ে নেবেন। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। আমাদের খাওয়া ঢেকে রাখলেই হবে। আমরা কখন ফিরি ঠিক নেই। মজিদের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। পেট ভর্তি গল্প জমা হয়ে আছে।

'বেশি দেরি না করাই ভাল।'

'রাত গভীর না হলে জোছনা ফুটে না। জোছনা ফোটার জন্যে একটু দেরি স্যার হবেই।'

ওয়াদুদ সাহেব বললেন, আপনি আমাকে স্যার স্যার বলছেন কেন?

'আপনার আপত্তি থাকলে আর বলব না। চাচা ডাকব। চাচা, আমরা তাহলে যাই।'

ওয়াদুদ সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন।

গ্রামের চাঁদ শহরের চেয়ে কি আগে ওঠে? রাত বেশি হয়নি, এর মধ্যেই আকাশে বিশাল এক চাঁদ। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জোছনা চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে। সাজ্জাদ বলল, জোছনার অবস্থাটা দেখেছিস?

"সে কোন জ্যোৎস্নায় আর আসিবে না
আসিবে না কখনো প্রভাতে"

আতাহার বলল, বল দেখি কার লাইন?

আতাহার বলল, জী দাশ বাবুর লাইন।

'এই কবিতার শেষ লাইন বলতে পারবি?'

'না।'

'মজিদ পারবে। কি রে মজিদ, তুই পারবি না?'

মজিদ বিরস গলায় বলল, শেষ লাইন হচ্ছে —

"অশ্বত্থের শাখা ঐ দুলিতেছে, আলো আসে, ভোর হয়ে আসে।"

'একসেলেন্ট। কবিতাটার মজাটা কোথায় জানিস? আলো আসছে, ভোর হয়ে আসছে — এই দুঃখে কবি বিষণ্ন। এখানেই কবির সঙ্গে আমার মিল। আমিও অন্ধকারের কবি।'

মজিদ বলল, আমাদের এখন উঠা দরকার।

সাজ্জাদ বলল, এই কবিতাটা কেমন দেখ তো —

'আকাশে চাঁদের আলো — উঠোনে চাঁদের আলো — নীলাভ চাঁদের আলো
এমন চাঁদের আলো আজ
বাতাসে ঘুঘুর ডাক — অশথে ঘুঘুর ডাক — হৃদের ঘুঘুর যে ডাক
নরম ঘুঘুর ডাক আজ।'

এই কবিতায় আমি একটা ভুল করেছি — ইচ্ছা করে করেছি। ভুলের জন্যে মাত্রায় গণ্ডগোল হয় গেছে। বল দেখি আতাহার ভুলটা কি?

আতাহার বলল, আমরা জোছনা দেখতে এসেছি, না কবিতার পরীক্ষা দিতে এসেছি?

সাজ্জাদ বলল, মজিদ, তুই বল। তুই পারবি।

মজিদ বলল, অশ্বত্থে হবে না, শব্দটা অশথে। জীবনানন্দ ইচ্ছে করে ভুল বানান ব্যবহার করেছেন।

'একসেলেন্ট। তোর মত একজন কবি গ্রামে এসে গৃহপালিত কুকুর হয়ে গেলি — এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই। আমি এসেছি তোকে উদ্ধার করতে।'

'আমাকে উদ্ধার করতে হবে না।'

সাজ্জাদ ব্যাগ খুলে পেটমোটা একটা বোতল বের করল। মজিদ আঁতকে উঠে বলল, অসম্ভব, মদ খেয়ে ঐ বাড়িতে যেতেই পারব না।

সাজ্জাদ বলল, ঐ বাড়িতে যাবার দরকার কি? কোন দরকার নেই। আমরা সারারাত জোছনা দেখব। পায়ে গু মাখব। ভোরবেলা সুবোধ বালকের মত ঢাকা চলে যাব।

মজিদ বলল, পাগলের মত কথা বললেই হল? আমাকে গলা টিপে ধরলেও আমি এক ফোঁটা মদ খাব না।

'এটা মদ না।'

'মদ না তো কি?

'সিদ্ধির সরবত। পেস্তা বাদাম, ধুতরার পাতা দিয়ে অনেক ঝামেলা করে ঢাকা থেকে বানিয়ে এনেছি। নিধুবাবু নামের জনৈক এক্সপার্ট বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি কালীপূজা ছাড়া সিদ্ধির সরবত বানান না। আমার বিশেষ অনুরোধ এবং বিশেষ অর্থ ব্যয়ের কারণে বানিয়েছেন। এই সিদ্ধির সরবত খাইয়ে — আজ তোর সিদ্ধিলাভ ঘটাব।'

মজিদ বলল, অসম্ভব!

আতাহার বলল, ও খেতে চাচ্ছে না, ওকে জোর করে খাওয়ানোর দরকার কি?

সাজ্জাদ বলল, আচ্ছা থাক, আমি একাই খাব। আমি এই জোছনা পুরোপুরি অনুভব করতে চাই।

সাজ্জাদ বোতল থেকে ঢক ঢক করে অনেকখানি মুখে ঢালল। মুখ মুছে বলল, তোরা গান শুনবি?

কেউ হ্যাঁ বা না বলার আগেই সাজ্জাদ গান ধরল —

বাউলা কে বানাইল রে?
হাসন রাজারে বাউলা কে বানাইল রে?

কিছু কিছু মানুষ বাউলা হয়ে পৃথিবীতে জন্মায়। কে তাদের বাউলা বানায়? সে কে? কে?

টলমলে জোছনায় এই গান বাউলা শ্রেণীর মানুষদের বড়ই কাবু করে। বিচিত্র উপায়ে এই গান তাদের রক্তে ঢুকে যায়। এক সময় রক্তের লোহিত রক্তকণিকারাও গানে অংশগ্রহণ করে। তখন মানসিক সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

মজিদ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, দেখি বোতলটা। সে হড়হড় করে অনেকখানি মুখে ঢেলে দিল। তারপর বোতলটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকল। এই তিন যুবকের জন্যে চাঁদ অনেকখানি নিচে নেমে এল। সে তার জোছনাকে আরো তীব্র এবং একই সঙ্গে আরো কোমল করল।

মজিদ বলল, জোছনায় গোসল করলে কেমন হয়? গায়ের সব ময়লা জোছনায় ধুয়ে ফেলি। কি বলিস?

বাকি দু'জন জবাব দিল না। মজিদ তার শার্ট-পেন্ট খুলে ফেলে পুরোপুরি নগ্ন হল। জোছনা সারা গায়ে ডলে ডলে স্নান শুরু করল।

রাত বাড়তে থাকল। সিদ্ধির সরবত তিন যুবককে অন্য জগতে নিয়ে গেল। যে জগতের সঙ্গে পৃথিবীর কোন যোগ নেই।

ওয়াদুদ সাহেব নসুকে সঙ্গে নিয়ে রাত দু'টার দিকে তাদের খোঁজে এলেন। মফস্বলের মানুষ সব সময় হাতে টর্চ রাখে। তীব্র চাঁদের আলোতেও তারা টর্চ-হাতে চলাফেরা করে। ওয়াদুদ সাহেব টর্চের আলো ফেলে ডাকলেন, মজিদ! মজিদ!

মজিদ খিক খিক করে হাসল।

সেই হাসির শব্দে যে কেউ আতংকগ্রস্ত হবে। তিনিও হলেন। তিনি ভীত গলায় বললেন, মজিদ, কি হয়েছে?

মজিদ বলল, কিছু হয় নাই। আমার কিছু হয় নাই। কিছু হয় নাই।

বলেই সে ঝোপের আড়াল থেকে বের হল। হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল ওয়াদুদ সাহেবের দিকে।

চাঁদের আলোয় নগ্ন একজন মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে — এই ভয়ংকর দৃশ্য তিনি দেখলেন। নসু দেখল। নসু বিড় বিড় করে কি যেন বলল। ওয়াদুদ সাহেবও বললেন। মজিদ আবারো খিক খিক শব্দ করে হাসল। পশুর গোংগানির মত শব্দ করে হাসতে তার খুব ভাল লাগছে।

নেত্রকোনা গার্লস কলেজ থেকে মজিদকে ছাটাই করা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বরখাস্তের চিঠিতে লিখেছেন — Your service is no longer required. চিঠিতে কোন কারণ দর্শানো হয়নি। প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মজিদকে তাঁর নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বলেছেন — বেসরকারি কলেজের চাকরি আর কারখানার মজুরের চাকরি এক রকম। মালিকের মর্জির উপর চাকরি। বুঝলেন ভাইসাহেব, আমাকে যে রকম লিখতে বলেছেন আমি লিখেছি। আপনার মত একজন ভাল শিক্ষক চলে যাচ্ছে। আফসোসের ব্যাপার।

মজিদ বলল, না, ঠিক আছে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, রুটি–রুজির মালিক আল্লাহ পাক। আপনি এইটা শুধু মনে রাখবেন। মানুষ রুটি–রুজির ব্যাপারে কিছু করতে পারে না। যা করার করেন উপরওয়ালা।

'জ্বি।'

'এখন বলেন তো দেখি মজিদ ভাই ব্যাপারটা কি? ওয়াদুদ সাহেবের সঙ্গে আপনার গণ্ডগোলটা কি নিয়ে? আমাকে বলা আর গাছকে বলা এক কথা। কাকপক্ষী জানবে না। বলেন দেখি ব্যাপারটা কি?'

মজিদ বলল, ব্যাপার কিছু না।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব বললেন, আমাকে ইন কনফিডেন্সে বলতে পারেন। একটা কানাঘুসা শুনছি — সমস্যাটা না–কি ওয়াদুদ সাহেবের মেয়েকে নিয়ে। মেয়ের না–কি ঝামেলা হয়ে গেছে — রোজ সকালে বমি–টমি হচ্ছে?

'ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন! সমস্যাটা — সম্পূর্ণই আমার, আমি বন্ধুদের সঙ্গে সিদ্ধির সরবত খেয়ে নানান পাগলামি করেছি। ওয়াদুদ সাহেব দেখেছেন।'

'সিদ্ধির সরবত?

'হ্যাঁ — স্ট্রং হেলোসিনেটিং ড্রাগ।'

'ও।'

'নেংটো হয়ে নাচানাচি করেছি — হাসাহাসি করেছি।'

'নেংটো হয়ে নাচানাচি?'

'জ্বি।'

'সোবাহানাল্লাহ, কি বলেন? আমরা আরো উল্টা কথা শুনেছি। আমরা শুনেছি ...।'

'আপনারা কি শুনেছেন তা আমি শুনতে চাচ্ছি না। বিদায় হচ্ছি। আপনারা ভাল

থাকবেন।'

'নেংটো হয়ে সত্যি নাচানাচি করেছেন নাকি রে ভাই?'

'হুঁ সত্যি করেছি।'

'সর্বনাশ !'

'সর্বনাশ তো বটেই।'

'তাহলে এখন ঢাকা চলে যাচ্ছেন?'

'জ্বি।'

'ঢাকা গিয়ে কি করবেন?'

'পথে পথে নেংটো নাচ নাচব, বেশ্যার দালাল হব, কবিতা লেখব . . .।'

প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মুখ হা হয়ে গেল। মজিদ নামের অতি ভদ্র, অতি বিনীত মানুষটা আজ কি ধরনের কথা বলছে? এ রকম একটা মাথা-খারাপ মানুষ মেয়েদের কলেজে এতদিন মাস্টারি করেছে? ভাবাই যায় না। এই লোককে তো অনেক আগেই পাগলা গারদে লোহার চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা উচিত ছিল।

মজিদের জিনিসপত্র ওয়াদুদ সাহেবের বাড়িতে। সে ঢাকা থেকে আসার সময় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল। এখন অল্পে অল্পে অনেক কিছু হয়েছে। লেপ, তোষক, কম্বল, চাদর, বালিশ। এইসব নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। এখানে আসার সময় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল, একটা স্যুটকেস নিয়েই তার ফিরে যাওয়া উচিত। সন্ন্যাসীরা বলেন — আসছি নেংটা, যামু নেংটা। পৃথিবীতে আমরা নগ্ন হয়ে আসি, পৃথিবী থেকে ফিরেও যাই নগ্ন হয়ে।

মজিদ স্যুটকেস গুছালো — কয়েকটা শার্ট-পেন্ট আর এক তোড়া কাগজ, যার সাদা শরীরে কবিতা লেখা হয়েছে। সবই প্রেমের কবিতা। জনৈকা নৈঃশব্দবতীকে নিয়ে লেখা। তার এই জীবনের সঞ্চয়। লেপ, তোষক, কাঁথা বালিশ পড়ে থাকুক। এইগুলি কোন সঞ্চয় নয়।

যাবার আগে নৈঃশব্দবতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে পারলে ভাল হত। তাকে সহজ গলায় যদি বলা যেত —

"শোন নৈঃশব্দবতী, তুমি থেকো সুখে।
তুমি থেকো চন্দ্র-শাদা দুধের সায়রে॥"

কিছুই বলা যাবে না। যাবার আগে দেখা হবে না। মজিদের গলার কাছে দলা পাকাতে লাগল। দুঃখের এই অনুভূতি তার শৈশবে হত। আর কখনো হয়নি। আবারো অনেক অনেকদিন পরে হল। কি হাস্যকর ব্যাপার ! বায়বীয় দুঃখ জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যায়। গলার কাছে এসে আটকে থাকে।

গোছগাছে সাহায্য করার জন্যে নসু এসেছে। দড়িদাড়া নিয়ে সে প্রবল উৎসাহে তোষক বাঁধতে শুরু করেছে। মজিদ বলল, নসু, এইসব আমি নেব না।

নসু অবাক হয়ে বলল, নিবেন না?

'না।'

'এইগুলো কি করবেন?'

'তুমি নিয়ে যাও।'

'আমি নিয়ে যাব?'

'হ্যাঁ — লেপ-তোষক, বিছানা-বালিশ সব নিয়ে যাও। আর শোন, তুমি জাহেদাকে বলবে সে যেন ভালমত পড়ে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'বলবে কিন্তু মনে করে।'

'অবশ্যই বলব। এখন বইল্যা আসি?'

'না, এখন বলতে হবে না। আমি চলে যাবার পরে বলবে।'

'জ্বে আইচ্ছা।'

'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়াবে নসু?'

'অবশ্যই খাওয়াব। পানি খাওয়ামু না এইটা কেমন কথা?'

নসু পানি আনতে গেল। মজিদ সিগারেট ধরাল। এই বাড়িতে তার শেষ সিগারেট। সিগারেটের ছাই ফেলে সে চলে যাবে। "উইড়া যায়রে বনের পক্ষী পইড়া থাকে মায়া।"

'উইড়া যাবে আবদুল মজিদ,
পইড়া থাকবে ছাই।'

'পানি নেন।'

মজিদ চমকে তাকাল। পানির গ্লাস নিয়ে নসু আসেনি, এসেছে জাহেদা। সে অন্যান্য দিনের মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে নেই। সে তাকিয়ে আছে মজিদের চোখের দিকে। পানির গ্লাসও ঠক করে টেবিলে নামিয়ে রাখল না। গ্লাস হাতে নিয়েই সে দাঁড়িয়ে আছে। আজ পানির গ্লাস তার হাত থেকেই নিতে হবে।

'কেমন আছ জাহেদা?'

'ভাল।'

জাহেদার চোখে পানি জমতে শুরু করেছে। আশ্চর্য! মেয়েটার চোখ এত সুন্দর।

'পানি নিন। কতক্ষণ গ্লাস হাতে দাঁড়িয়ে থাকব?'

মজিদ পানির গ্লাস নিল। তার তৃষ্ণা চলে গেছে। তারপরেও এক চুমুকে পানির গ্লাস শেষ করল। জাহেদা বলল, স্যার, বাবা আপনার সম্পর্কে যা বলেছে তা কি সত্যি?

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এইসব আর করবেন না।'

'না, আর কোনদিন করব না।'

'আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করুন।'

মজিদ বিস্মিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল। কি বলছে এই মেয়ে?

জাহেদার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। মেয়েরা তাদের অশ্রু অন্যদের দেখাতে চায় না, প্রিয়জনদের তো কখনোই না। কিন্তু জাহেদা তার চোখ নিচু করছে না। সে তাকিয়েই আছে।

'আপনি কোথাও যাবেন না। এই বাড়িতেই থাকবেন। আমি বাবাকে বলেছি।'

'বাবা তোমার কথা শুনবে?'

'হ্যাঁ শুনবে। কই, আপনি তো আমার হাত ধরে প্রতিজ্ঞা করছেন না।'

মজিদ হাত বাড়াতেই নৈঃশব্দবতী তাকে জড়িয়ে ধরল। এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! দরজা খোলা, জানালা খোলা, লোকজন আসা-যাওয়া করছেন। নৈঃশব্দবতী কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মজিদ তার খাটে বসে আছে। তার হাতে একগাদা কাগজ। তার সারা জীবনে লেখা প্রতিটি কবিতা এই কাগজের তাড়ায় লেখা আছে। মজিদ বসে বসে কাগজগুলি ছিঁড়ে কুচি কুচি করছে। একটি প্রিয় জিনিস পেতে হলে অন্য একটি প্রিয় জিনিস ছাড়তে হয়। সে আজ থেকে কবিতা ছাড়ল। কবিতাকে তার আর প্রয়োজন নেই।

কবি

সালমা বানু চোখ মেললেন। ঘর আলো হয়ে আছে। সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, তবু কিছুই যেন ঠিক স্পষ্ট না। নতুন চশমা পরলে চারপাশ যেমন এলোমেলো লাগে — তেমন লাগছে। সব কেমন যেন আঁকা বাঁকা। মাথার উপরের ছাদ মাঝখানে খানিকটা যেন নেমে এসেছে। তিনি কোথায়? হাসপাতালে? হাসপাতালে যদি হন তাহলে ঘরটা চিনতে পারছেন না কেন? তাঁর তৃষ্ণা বোধ হল। প্রবল তৃষ্ণা না — হালকা ধরনের তৃষ্ণা। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি কেউ তাঁর হাতে দিলে তিনি ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করতেন। ঢক ঢক করে না। ঢক ঢক করে পানি খাওয়ার মত তৃষ্ণা তাঁর হয়নি। আরামদায়ক তৃষ্ণা। যে তৃষ্ণা নিয়ে রাতে ঘুমুতে যাওয়া যায়। ঘুমের অসুবিধা হয় না।

তিনি সাবধানে মাথা কাত করলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল কে যেন পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ দাঁড়িয়ে ছিল না। পুরো ঘরটা ফাঁকা। তাঁর একটু ভয় ভয় লাগল। তিনি ডাকলেন, রুনু, ও রুনু। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে রুনু নামের কাউকে তিনি চেনেন না। হঠাৎ এই নামটা কেন তাঁর মাথায় এল তিনি জানেন না। তাঁর শীত শীত করছিল। কেউ যদি একটা পাতলা সুতির চাদর তাঁর কোমর পর্যন্ত টেনে দিত। এটা কোন কাল? শীত কাল? আশ্বিনের শেষ ভাগ? আশ্বিনের শেষ ভাগে গায়ে হালকা সুতির চাদর দিতে হয়।

একটা চালতা গাছের কথা তাঁর মনে পড়ল। তাঁদের মামার বাড়ির উঠোনে চালতা গাছটা ছিল। ঘন সারিবদ্ধ পাতার কি বিশাল গাছ। পাতাগুলি করাতের মত খাঁজকাটা। মে-জুন মাসে বড় বড় ফুল ফুটতো। শাদা ফুল। মোটা পুরুষ্ট পাপড়ি। কি অদ্ভুত সুগন্ধি ফুল! মেজো মামী একবার চালতার আঠা এনে তাঁর মাথায় মাখিয়ে দিলেন, এতে না-কি চুল উজ্জ্বল হবে। চুল উজ্জ্বল হয়েছিল কি-না তাঁর মনে নেই। কারণ তার দু'দিন পরই তাঁর মাথা কামিয়ে দেয়া হয় যাতে ঘন হয়ে চুল উঠে।

তিনি হাসপাতালের এই ঘরে চালতা ফুলের গন্ধ পেতে লাগলেন। মনে হচ্ছে কাছেই কোথাও চালতা গাছ আছে। চালতা গাছ ছেয়ে ফুল ফুটেছে। তিনি আবারো ডাকলেন — রুনু, ও রুনু। তাঁর মন বলছে — রুনু নামের একজন কেউ পাশেই ঘুর ঘুর করছে। সে একটা পাতলা সুতির চাদর তাঁর কোমর পর্যন্ত টেনে দেবে। কাঁচের ঝকঝকে পরিষ্কার গ্লাসে করে এক গ্লাস পানি এনে দেবে। তখন তিনি রুনুকে

বলবেন, ও রুনু, তুই আমাকে কয়েকটা চালতা ফুল এনে দিতে পারবি? রাতের বেলা গাছ থেকে ফুল পাড়া নিষেধ। তবু তাঁর খুব ইচ্ছা করছে বালিশের কাছে কয়েকটা ফুল রেখে দিতে।

কিশোরী বয়সে বালিশের কাছে ফুল রেখে ঘুমানোর অভ্যাস হয়েছিল। ফুলের গন্ধ নিয়ে ঘুমুতে গেলে সুন্দর স্বপ্ন দেখা যায়। সুন্দর স্বপ্ন দেখার লোভে রাতের পর রাত তিনি বালিশের পাশে ফুল নিয়ে ঘুমিয়েছেন।

একবার অদ্ভুত সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখেওছিলেন। কিশোরী বয়সের সেই স্বপ্নে একটা কিশোর ছিল। যার চোখ দু'টি মেয়েদের মত জলেভরা। স্বপ্নে তিনি ছেলেটির সঙ্গে নানান ধরনের দুষ্টুমি করেছিলেন। সে কোন প্রতিবাদ করে নি। সারাক্ষণ মাথা নিচু করেছিল। এক একবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি সে কেঁদে ফেলবে। তবু তিনি দুষ্টুমি বন্ধ করলেন না। দুষ্টুমি করতে তাঁর এত মজা লাগছিল। স্বপ্ন ভাঙ্গার পর তিনি অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তাঁর মনে হল — এই রকম সুন্দর একটা ছেলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

অবিশ্বাস্য মনে হলেও এরকম একটা ছেলের সাথেই তাঁর বিয়ে হয়েছিল। কিশোরী বয়সের স্বপ্নের ব্যাপারটা তিনি অবশ্যি কোনদিনই তাঁর স্বামীকে বলেন নি। ছেলেমেয়েদেরও বলেন নি। আজ বলতে ইচ্ছে হচ্ছে— অথচ আজ কেউ পাশে নেই। রুনু মেয়েটা বোধ হয় আছে। তার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ডাকলেন, ও রুনু। রুনু।

রুনু জবাব দিল। অস্পষ্টভাবে বলল, হুঁ।

'ও রুনু, ঘরের জানালা বন্ধ কেন? জানালা খুলে দিলে চালতা ফুলের গন্ধ আরো ভাল পাওয়া যেত।'

কথাগুলি তিনি বললেন খুব স্পষ্টভাবে। তারপরই তাঁর তৃষ্ণা হঠাৎ বেড়ে গেল, শ্বাসকষ্ট শুরু হল। সমস্ত শরীরে বিচিত্র এক ধরনের ছটফটানি শুরু হল। তিনি আবারো ডাকলেন, ও রুনু। রুনু . . .

একবারের জন্যেও তাঁর নিজের পুত্র-কন্যা, স্বামীর কথা মনে পড়ল না। পরিচিত পৃথিবীর কারোর কথাই মনে এল না। রুনু নামের একটি কাল্পনিক মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে, চালতা ফুলের গন্ধ শুকতে শুকতে তিনি যাত্রা করলেন — রহস্যময় এক জগতের দিকে। তিনি মারা গেলেন রাত তিনটায়।

আতাহার ভোরবেলা কখনো হাসপাতালে আসে না। সেদিন কি মনে করে যেন এল। মা'র ঘরে উঁকি দিল। বেডের উপর লম্বালম্বিভাবে হলুদ রঙের একটা চাদর বিছানো। সে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রবল শোক তাকে আচ্ছন্ন করল না। বরং হঠাৎ নিজেকে খানিকটা মুক্ত বলে মনে হল। মনে হল, এই এতদিন পর বিবলিক্যাল কর্ড কাটা পড়ল। শিশুর জন্মের পর নাড়ি কেটে মা'র কাছ থেকে

তাকে আলাদা করা হয়। তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয় তুমি এখন আর তোমার মায়ের শরীরের কোন অংশ না। তুমি আলাদা একজন মানুষ। সত্যিকার অর্থে কিন্তু সেই নাড়ি কাটা পড়ে না। যতদিন মা বেঁচে থাকেন ততদিন অদৃশ্য নাড়ির বন্ধন থাকে। বন্ধন কাটে মা'র মৃত্যুতে।

দীর্ঘদিনের অভ্যেসের কারণে আতাহার মনে মনে মা'কে বলল, কি ব্যাপার মা,এরকম হুট করে চলে গেলে যে?

বলেই লজ্জা পেল। এমন গভীর বিষাদের সময় এ জাতীয় হালকা কথাবার্তা কি বলা চলে?

আতাহার ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমাকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ মা। তোমাকে ধন্যবাদ। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টির প্রথম শর্ত হচ্ছে পূর্ণ মুক্তি। পুরোপুরি মুক্ত একজন মানুষই সৃষ্টি করতে পারে। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির মূল রহস্যই এইখানে — তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

হলুদ চাদর সরিয়ে মা'র মুখ দেখার কোন ইচ্ছা আতাহারের হল না। সে চাচ্ছে তার মনে জীবিত মানুষের মুখের স্মৃতিটিই থাকুক। মৃত মানুষের শীতল ছবি না।

আতাহার হাসপাতালের বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। এটা অন্যায় একটা কর্ম। জায়গায় জায়গায় নোটিশ ঝুলছে "ধুমপান মুক্ত এলাকা।" আজকের দিনে সামান্য অন্যায় বোধ হয় করা যায়। তাকে ঠাণ্ডা মাথায় কিছুক্ষণ চিন্তা করতে হবে। সারাদিনের কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। মিলিকে খবর দিতে হবে। মিলি একটা টেলিফোন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিল — কোথায় আছে সেই নাম্বার কে জানে। নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে। মনিকাকে টেলিফোন করতে হবে। খবর শুনে এরা দু'জনই আকাশ ফাটিয়ে কাঁদবে। এদের কান্না শুনতে হবে।

মৃত্যু ব্যাপারটা কিছুক্ষণের জন্যে ভুলে থাকার কোন উপায় কি আছে? মৃত্যু শোকে কাতর মানুষদের মৃত্যুশোক ভুলানোর জন্যে কোন ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত — বিশেষ একটা টেলিফোন নাম্বার। যে নাম্বারে ডায়াল করলেই সমবেদনায় আর্দ্র একটি কণ্ঠ বলবে,

"আমি জানি তোমার মন ভয়ংকর খারাপ। ভয়ংকর এক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তারপরেও এসো আমরা খানিকক্ষণ গল্প করি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখ বাইরের আকাশ কি ঘন নীল। কত না মধুর বাতাস। তোমার চারদিকে জীবন ঝলমল করছে— এর মাঝখানে মৃত্যু নিয়ে ভেবোনাতো।"

আতাহার করিডোর ধরে এগুচ্ছে। তার একটা টেলিফোন করা দরকার। তার মন বলছে পরিচিত কারো সঙ্গে খানিকক্ষণ সাধারণ কোন বিষয় নিয়ে কথা বললেই তার মন ঠিক হয়ে যাবে। যে কোন বিষয় নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে — আওয়ামী লীগ, বিএনপি রাজনীতি। খালেদা হাসিনার ঠাণ্ডা স্নায়ু যুদ্ধ। গ্রীন হাউস এফেক্টে পরিবেশ গত বিপর্যয়। বিষ্ণুদের কবিতায় ভুল ছন্দ . . .

হাসপাতাল এবং রেলওয়ে ইনকোয়ারির টেলিফোন কখনো ডায়াল টোন থাকে না। রিসিভার উঠালে হয় ভয়াবহ নীরবতা কাকে বলে তা বোঝা যায় কিংবা কট কট শব্দ হয়। মনে হয় কেউ যেন জাঁতি দিয়ে টেলিফোনের তার কাটছে।

আতাহার বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল হাসপাতালের ইনকোয়ারির টেলিফোন ঠিক আছে। ডায়াল টোন আসছে। সে সাজ্জাদের নাম্বার ডায়াল করল। দু'বার রিং হতেই সাজ্জাদ বলল, আতাহার তোর খবর কিরে?

আতাহার বিস্মিত হয়ে বলল, বুঝলি কি করে আমি?

'মাঝে মাঝে আমার সিক্সথ সেন্স খুব কাজ করে। রিং বাজা মাত্রই মনে হল তুই। খবর কি রে?'

'তেমন কোন খবর নেই।'

'তুই বাসায় চলে আয়। এক্ষুণি চলে আয়।'

'এখন আসতে পারব না। একটা সমস্যা আছে।'

'মানুষ হয়ে জন্মেছিস সমস্যাতো থাকবেই। চলে আয়।'

'এখন আসতে পারব না সারাদিন খুব ব্যস্ত থাকব।'

'রাতে আসবি?'

'হ্যাঁ, তা আসতে পারি। কোথায়?'

'এখন বলব না। আগে এরেঞ্জ করে নেই।'

'আসে-পাশে কি নীতু আছে নাকি?'

'না। কথা বলবি? ডেকে দেই?'

'দে।'

আতাহার টেলিফোন ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ইস, কেউ যদি এক মগ গরম এসপ্রেসো কফি তার হাতে ধরিয়ে দিত। আর একটা ডানহিল সিগারেট। ফেনা ভর্তি কফির মগে চুমুক দিতে দিতে সে টেলিফোনে কথা বলতে পারত।

'আতাহার ভাই!'

'কে, নীতু?'

'হুঁ।'

'তুই আছিস কেমন?'

'ভাল।'

'জ্বর কমেছে?'

'হুঁ।'

'শুনলাম কামাল সাহেবের সঙ্গে বিয়েটা হচ্ছে না। এ রকম হুটহাট ডিসিশান নিস কেন? খুব খারাপ।'

'আপনার কি হয়েছে আতাহার ভাই?'

'কিছু হয় নিতো।'

"আমার ধারণা হয়েছে। আপনার গলার স্বর পাল্টে গেছে।'

'মনে হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।'

'না ঠাণ্ডা না– অন্য কিছু। আতাহার ভাই আপনার মা কেমন আছেন?'

আতাহার জবাব দিল না। তার ইচ্ছা করছে টেলিফোনটা রেখে দিতে।

'আতাহার ভাই?'

'হুঁ।'

'আপনার মা কেমন আছেন?'

'কেমন আছেন বলতে পারছিনারে। তাকে একটা হলুদ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। শাদা চাদরে ঢেকে রাখা নিয়ম — মনে হয় এদের শাদা চাদর শেষ হয়ে গেছে।'

'আতাহার ভাই, আপনি কি হাসপাতালে?'

'হুঁ।'

'আমি আসছি।'

'তুই কি আমার জন্যে একমগ এস্‌প্রেসো কফি বানিয়ে আনবি? আমার খুব কফি খেতে ইচ্ছা করছে।'

'অমি কফি নিয়ে আসব।'

'তুই কি একটু সেজেগুজে আসবি নীতু? আমার খুব সুন্দর একটা মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

বাদ আছর আতাহার তার মা'কে কবরে নামিয়ে দিল। রাত ন'টা পর্যন্ত একা একা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে হাঁটল। দশটার দিকে সাজ্জাদের সঙ্গে গেল চানখার পুলের এক বাড়িতে। মজার কিছু দেখতে।

মজার ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছে। আতাহার তাকিয়ে আছে। তার পেটের সবকিছু দলা পাকিয়ে উঠেছে। সে অনেক কষ্টে ঘেন্না চেপে রাখছে। কতক্ষণ চেপে রাখতে পারবে বুঝতে পারছে না। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে শরীরের সমস্ত ঘেন্না বমি হয়ে বের হয়ে আসবে। দুর্গন্ধ বমিতে সে সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়ে দেবে। কারণ তার চোখের সামনে নোংরা কদর্য একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে।

সে এবং সাজ্জাদ বসে আছে একটা টিনের বাড়ির মেঝেতে। এই গরমেও বাড়ির সব ক'টা জানালা বন্ধ। তাদের সঙ্গে আরো তিনজন আছে, যারা ডাল-খোর। নেশার জগতে ফেন্সিডিলের আদরের নাম হল ডাল। যারা দৈনিক তিন-চার বোতল খায় তারাই ডাল-খোর। ডাল খাওয়া হয়ে গেছে। ঘরের ভেতর আনন্দময় আবহাওয়া বিরাজ করছে। তিন ডাল-খোরের একজন এখন আরেকটি বিচিত্র নেশা করবে। আতাহার এবং সাজ্জাদ তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। সে জ্যান্ত টিকটিকি খাবে। ডালের নেশা দু'-তিন ঘণ্টার বেশি থাকে না। ডালের পর একটা জ্যান্ত

টিকটিকি খেতে পারলে নেশাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পৃথিবী নানা বর্ণে, নানা গন্ধে ধরা দেয়।

টিকটিকে যে খাবে তার নাম কুদ্দুস। সে এক কৃষি ব্যাংকের নাইট গার্ড। আজ তার অফ ডিউটি। সে মুখ-বন্ধ টিনের কৌটায় টিকটিকি নিয়ে এসেছে। টিনের কৌটার মুখ ফুটো করা আছে যাতে টিকটিকি মরে না যায়।

সাজ্জাদ বলল, কৌটায় কয়টা টিকটিকি আছে?

কুদ্দুস হাসিমুখে বলল, তিন-চারটা আছে, গনতি নাই। বেশীও থাকতে পারে।

'আপনি খাবেন ক'টা?

'ভাইজান একটা খাব। বিষাক্ত জিনিস তো — বেশি খাইলে বাঁচনের উপায় নাই।'

'জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবেন?'

'জ্যান্ত খাওনের নিয়ম। খাওনের পর ডাইল দিয়ে কুলি করলেই সব হজম। তবে ভাইজান — টিকটিকির লেজের বিষয়ে সাবধান। টিকটিকির সব বিষ তার লেজে।'

'লেজ খাওয়া যায় না?'

'তাও খাওয়া যায়। অনেক ঝামেলা আছে। লেজটারে প্রথম পুইড়া ছাই বানাইতে হয়। সেই ছাই সিগারেটের শুকার সাথে মিশাইয়া টানতে হয়।'

'আপনি টেনেছেন?'

'জ্বে-না, অত ঝামেলা পুষায় না।'

আতাহার বলল, জ্যান্ত টিকটিকি খান, ঘেন্না লাগে না?

'ঘিন্নার কি আছে? মাছ মাংস মানুষে খায় না? অত ঘিন্না করলে দুনিয়াতে বাঁচন যায় না। তাছাড়া ভাইজান, ডাইল-খোরের অত ঘিন্না থাকে না। এইটাই ডাইলের মজা। ডাইল খাইলে কোন কিছুতে ঘিন্না লাগে না। সবেরে বড় আপন লাগে। দুনিয়াটা যে রঙ্গিলা এইটা ডাইল না খাইলে বুঝা যায় না।'

আতাহার ঘৃণা ও বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে। সাজ্জাদের চোখে কোন ঘৃণা নেই, বিস্ময়ও নেই। তার চোখে শুধুই কৌতূহল। নির্ভেজাল কৌতূহল।

কুদ্দুস টিনের কৌটা থেকে একটা টিকটিকি বের করে আনল। বাঁ হাতের আঙুলে একটা টোকা দিতেই টিকটিকির লেজ খসে পড়ল। কুদ্দুস হাসিমুখে বলল, বড়ই আজিব পোকা। লেজ খুইল্যা পড়ে, আবার লেজ হয়।

ছাদের দিকে মুখ করে কুদ্দুস প্রকাণ্ড হা করে টিকটিকিটা মুখের ভেতর ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করল। কচ কচ শব্দ হচ্ছে।

আতাহার ছুটে ঘর থেকে বের হয়ে দু'হাতে পেট চেপে রাস্তায় বসে পড়ল। মনে হচ্ছে বমি করতে করতে সে রাস্তাতেই নেতিয়ে পড়বে। রাস্তা ফাঁকা, দূরে ডাস্টবিনের কাছে একটা কুকুর ছিল। সে উঠে দাঁড়াল। কুকুরটা ভীত পায়ে আতাহারের দিকে আসছে। আতাহারের মনে হল কুকুরটার চোখ মমতা ও

সহানুভূতিতে আর্দ্র। আতাহার ডাকল, আয় আয়, তুই আমার কাছে আয়।

কালো রঙের কুকুর এগিয়ে আসছে। আতাহার আবারো ডাকল, আয় আয় —। কি আশ্চর্য! এই অদ্ভুত অবস্থাতেই তার মাথায় কবিতার লাইন আছে। কোন মানে হয়? একজন কবি সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেন — একগাদা বমি সামনে নিয়ে সে বসে আছে। এর ভেতর সৌন্দর্য কোথায়? সৌন্দর্যের জন্ম অন্ধকারে। আলোর জন্মদাত্রী মা অবশ্যই অন্ধকার।

একটা ঝকঝকে রঙিন কাচপোকা
হাঁটতে হাঁটতে এক ঝলক রোদের মধ্যে পড়ে গেলো।
ঝিকমিকিয়ে উঠল তার নকশাকাটা লাল নীল সবুজ শরীর।
বিরক্ত হয়ে বলল, রোদ কেন?
আমি চাই অন্ধকার। চির অন্ধকার।
আমার ষোলটা পায়ে একটা ভারি শরীর বয়ে নিয়ে যাচ্ছি —
অন্ধকারকে দেখব বলে।
আমি চাই অন্ধকার। চির অন্ধকার

একটা সময়ে এসে রোদ নিভে গেল।
বাদুড়ে ডানায় ভর করে নামল আঁধার।
কি গাঢ়, পিচ্ছিল থকথকে অন্ধকার!
কাচপোকার ষোলটা ক্লান্ত পা বার বার
সেই পিচ্ছিল আঠালো অন্ধকারে ডেবে যাচ্ছিল।
তার খুব কষ্ট হচ্ছিল হাঁটতে।
তবু সে হাঁটছে —
তাকে যেতে হবে আরো গভীর অন্ধকারে।
যে অন্ধকার — আলোর জন্মদাত্রী।

কবি

কণার মুখ হাসিহাসি।

তাকে দেখে মনে হতে পারে আনন্দময় কোন অভিজ্ঞতার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। তার গায়ে ইস্ত্রি করা সুতীর ছাপা শাড়ি। শাদা জমিনে নীল রঙের ফুলের ছাপ। কণাকে দেখে মনে হচ্ছে তার শরীরে নীল ফুল ফুটে আছে। সত্যি সত্যি ফুটে আছে। কণা মাথায় গন্ধ তেল দিয়ে চুল বেঁধেছে। মাথার গন্ধটাকেই মনে হচ্ছে ফুলের গন্ধ।

নার্স ঘরে ঢুকে কণার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ঘণ্টা খানিক।

কণা 'ঠিক আছে' বলে আগের মত হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল। নার্স বলল, আপনার স্বামী আসেন নি?

'জ্বি না।'

'উনি এলে ভাল হত।'

কণা হাসল। সেই হাসি যা তাকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে ফেলে। কণা তার তেইশ বছরের জীবনে এই হাসি অনেকবার ব্যবহার করেছে। হয়ত আরো অসংখ্যবার ব্যবহার করতে হবে। তার এখন আর ভাল লাগে না। হাসিটা সে শুধুমাত্র একজনের জন্যেই ব্যবহার করতে চায়। হাসি হল শরীরেরই একটা অংশ। ঠোঁটের ফাকে ফুলের মত ফুটে ওঠে। শরীর যেমন সবার জন্যে নয় — হাসিও তেমনি সবার জন্য না।

কণা বসে আছে ধানমণ্ডি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিকে। ঘণ্টা খানিকের মধ্যে তার পেটের বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলা হবে। নতুন একজন মানুষের দায়িত্ব নেয়ার সামর্থ তার স্বামীর নেই। অনেক আলাপ অলোচনা করে তারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবার পর কণা হেসেছে খিলখিল করে। কণার স্বামী বিরক্ত মুখে বলেছে, হাস কেন?

কণা বলেছে, হাসতে ভাল লাগে এইজন্যে হাসি। ছোটবেলায় খুব কাঁদতাম এইজন্যে নাম হয়ে গিয়েছিল কাঁদুনি। কাঁদুনি থেকে কানি। কানি থেকে কণা। বুঝলেন সাহেব?

'এত কথা বল কেন?'

'আচ্ছা যাও, কথাও বলব না।'

কণা শান্ত মুখে কেরোসিনের চুলা ধরিয়েছে। কৌটায় সামান্য কিছু কফি আছে।

স্বামীকে কফি বানিয়ে দিয়ে সে অবাক করে দেবে। চা ভেবে চুমুক দিয়ে দেখবে কফি। সে আঁৎকে উঠবে। মজার একটা ব্যাপার হবে। কণা সারাজীবন চেয়েছে তাকে ঘিরে সারাক্ষণ মজার মজার সব ঘটনা ঘটুক। কিন্তু তার জীবনটা এ রকম যে তাকে ঘিরে মজার কোন ঘটনা কখনো ঘটে না। অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটে।

তাকে কাপড় খুলে আধবুড়ো একজন মানুষের সামনে নানান অঙ্গ ভঙ্গি করে বসে থাকতে হয়। আধবুড়ো মানুষটা তার ছবি আঁকে। তবে মানুষটা ভাল। ঋষির মত মানুষ। মানুষটার চোখে লোভ ঝিলমিল করে না। কখনোই সে কোন অজুহাতে হাত দিয়ে তার নগ্ন শরীর ছুঁয়ে দেয় না। মানুষ এ রকম হয় কিভাবে?

একটা স্বাভাবিক জীবন কণার কেন হল না? আল্লাহ কি জন্মের সময় তার কপালে লিখে দিয়েছেন — এই মেয়েটার কোন স্বাভাবিক জীবন হবে না? সে সরাক্ষণ ভয়ংকরের ভেতর থাকবে। তার গর্ভে আসবে সুন্দর সুন্দর শিশু। তাদের একের পর এক ফেলে দিতে হবে। কোনদিন তাদের সে কোলে নিতে পারবে না। তাদের ঠোঁটে চুমু দিতে পারবে না। রাতের বেলা কাঁধে শুইয়ে সুর করে বলতে পারবে না —

আমার কথাটি ফুরাল
নটে গাছটি মুড়াল।
'কেনরে নটে মুড়ালি?'
'গরুতে কেন খায়?'
'কেনরে গরু খাস?'
'রাখাল কেন চরায় না?'
'কেনরে রখাল চরাস না?'
'বৌ কেন ভাত দেয় না?'
'কেনলো বৌ ভাত দিস না?'
'কলাগাছ কেন পাতা ফেলে না?'
'কেনরে কলাগাছ পাতা ফেলিস না?'
'জল কেন হয় না?'
'কেনরে জল হ'স না?'
'ব্যাঙ কেন ডাকে না?'
'কেনরে ব্যাঙ ডাকিস না?'
'সাপ কেন খায়?'
'কেন রে সাপ খাস?'
'খাবার ধন খাবুনি, — গুড় গুড়ুতে যা'ব নি?'

কোনকিছু নিয়েই কণা বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। তার ভাল লাগে না, মাথা

ধরে যায়। কিন্তু পেটের শিশুগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার ভাবতে ভাল লাগে। শুধু যে তার ভাবতে ভাল লাগে তা না — এদের নিয়ে অন্যদের সঙ্গে তার কথা বলতেও ভাল লাগে। তার কথা বলার লোক কোথায়? কাজেই সে নিজেই আশে পাশে থেকে লোক খুঁজে নেয়। হয়ত সে রিকশা করে যাচ্ছে — সে ফস করে বলে বসল, রিকশাওয়ালা ভাই আপনের ছেলেমেয়ে কি? রিকশাওয়ালা চমকে পেছন ফিরে তাকায়। তার চোখে চাপা সন্দেহ ঝিকঝিক করে। কণার ধারণা তাকে হয়ত খারাপ মেয়ে ভাবে। খারাপ মেয়েরাই রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে দ্রুত ভাব জমাবার জন্যে ব্যক্তিগত গল্প শুরু করে। তখন কণা তার বিশেষ হাসিটা হাসে। এই হাসি বলে দেয় — সে খারাপ মেয়ে না। ভাল মেয়ে। এরকম ভাল মেয়ে সচরাচর পৃথিবীতে আসে না। তবে ভাল মেয়ে হলেও সে খুব দুঃখী মেয়ে। এ রকম দুঃখী মেয়েও সচরাচর পৃথিবীতে আসে না।

কণা উঠে দাঁড়াল। এক জায়গায় বসে থাকতে থাকতে তার পায়ে ঝি ঝি ধরে গেছে। একটু হাঁটাহাটি করলে বোধহয় ভাল লাগবে। কণা বারান্দায় চলে এল। বারান্দাটা ফাঁকা। টুলের উপর একজন খাকি পোষাক পরা পিয়ন বসে আছে। বেচারা বোধ হয় কয়েক রাত ঘুমায়নি। আয়েশ করে ঝিমাচ্ছে। তাকে কি কণা জিজ্ঞেস করবে — পিয়ন ভাই, আপনার ছেলেমেয়ে কি? কণা নিশ্চিত এই প্রশ্ন করা মাত্রই পিয়নের চোখ থেকে ঘুম কেটে যাবে। সে লাফ দিয়ে উঠবে।

আচ্ছা, কণা কি পারেনা সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পেটের শিশুটিকে বাঁচিয়ে রাখতে? সে নিজে যদি বেঁচে থাকতে পারে তার শিশুটি থাকবে না কেন? আচ্ছা, সেতো সাজ্জাদ নামের দারুণ বড়লোক ঐ ছেলেটার কাছে চলে যেতে পারে। পারে না? তাকে গিয়ে বলতে পারে —

'সাজ্জাদ ভাই আমাকে চিনতে পেরেছেন? আমি কণা।'

উনি হাসি মুখে বলবেন, হ্যাঁ চিনতে পারছি। কেমন আছ কণা?

'ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন?'

'আমিও ভাল আছি।'

'কণা, তোমাকে কেমন জানি রোগা রোগা লাগছে। তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ?'

'উহুঁ। আমি খুব ভাল আছি। আমি আপনার কাছে একটা কাজে এসেছি।'

'বল কি কাজ?'

'আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান। এটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি।'

'এখনো কি চান?'

'হ্যাঁ, এখনো চাই।'

'আমি রাজি আছি সাজ্জাদ ভাই।'

'সত্যি রাজি আছ?'

'হ্যাঁ সত্যি — তিন সত্যি।'
'তিন সত্যিটা কি?'
'মাটির সত্যি, আকাশের সত্যি আর পাতালের সত্যি।'
'তাহলে তুমি চলে এসো।'
'একটা কিন্তু আছে যে সাজ্জাদ ভাই।'
'কিন্তুটা কি?'
'আমার পেটে একটা শিশু আছে। শিশুটাকে আমি বড় করতে চাই।'
'অবশ্যই বড় করবে।'
'আমার স্বামীকেও তো ছেড়ে চলে আসতে হবে।'
'তাতো হবেই। আমাদের বর্তমান সমাজ এক স্বামীর দু'টি স্ত্রী সহ্য করে নিলেও, এক স্ত্রীর দুই স্বামী সহ্য করবে না।'
'কিন্তু ওকে তো আমি প্রচণ্ড রকম ভালবাসি।'
'তোমার ভালবাসার ক্ষমতা আছে বলেই তুমি ভালবাস। আজ তুমি তোমার স্বামীকে প্রচণ্ড ভালবাসছ — একদিন আমাকেও প্রচণ্ড ভালবাসবে। ভালবাসা নির্ভর করে ভালবাসার ক্ষমতার উপর।'
'তাও ঠিক।'
'একটা কথা কি জান কণা, ভালবাসতে হলে ভালবাসার উপকরণ লাগে। ক্ষুধার্ত পেটে ভালবাসা যায় না। আমার কাছে ভালবাসার উপকরণ আছে। আমি তোমাকে নিয়ে কি করব জান?'
'কি করবেন?'
'জোছনা রাত্রিতে তোমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবো শহর থেকে দূরে। আশি, নব্বুই, একশ কিলোমিটার স্পীডে গাড়ি চলবে। হাওয়ায় উড়বে তোমার চুল।'
'আমরা কোথায় যাব?'
'তুমি যেখানে যেতে চাও আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাব।'
'আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি — আপনি আমাকে সমুদ্র দেখাবেন?'
'অবশ্যই দেখাব। তুমি চাইলে সমুদ্রের কোন এক প্রবাল দ্বীপে তোমার জন্যে ঘর বানিয়ে দেব। তুমি কি চাও?'
'হ্যাঁ চাই।'
'শোন কণা, তোমার স্বামীর এত ভালবাসার দরকার নেই। আমার দরকার। আমার প্রচুর ভালবাসা দরকার।'
কণা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। নার্স এসে বিরক্ত মুখে বলল, আপনি এখানে? আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আসুন ভেতরে আসুন। ডাক্তার এসে গেছেন। ফরম ফিলাপ করেছেন?
কণা শুকনো গলায় বলল, জ্বি।
'আসুন তাহলে।'
কণা ক্লান্ত গলায় বলল, চলুন।
নার্স বলল, ভয় পাবেন না। ভয়ের কিচ্ছু নেই।
কণা বলল, আমি ভয় পাই না।

টেবিলের উপরে টিফিন কেরিয়ার থাকার কথা।

টিফিন কেরিয়ার নেই। আতাহার ঘড়ি দেখল। বারোটা বাজতে এগারো মিনিট। এত রাতে নিশ্চয়ই টিফিন কেরিয়ার নিয়ে কেউ আসবে না। খাবার পাঠাতে কি ভুলে গেছে। ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক না। ধরে নেয়া যেতে পারে আতাহারের বড় মামার বাড়িতে দৈনন্দিন কাজের একটা অলিখিত তালিকা আছে। টিফিন কেরিয়ারে করে আতাহারকে খাবার পাঠানোর কাজটা তালিকায় একেবারে শেষের দিকে। যার উপর দায়িত্ব সে সম্ভবত জ্বরে পড়েছে। কিংবা ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে গেছে।

বেছে বেছে আজকের দিনেই ক্ষিধেয় আতাহারের নাড়িভুড়ি উল্টে আসছে। দোকানপাট এখনো কিছু কিছু খোলা। গোটা দুই কলা কয়েকটা বিসকিট এবং এক কাপ চা খেয়ে এলে হয়। সেটাও সম্ভব না। পকেটে কিচ্ছু নেই।

আজ নিয়ে তিন দিন সে শূন্য পকেট নিয়ে ঘুরছে। একটা লাভ হয়েছে সিগারেট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আজ সারা দিনে মাত্র দু'টা সিগারেট খাওয়া হয়েছে। তৃতীয় সিগারেটটা পাঞ্জাবির পকেটে আছে। রাতের খাবার পর আয়েশ করে বিছানায় শুয়ে ধরাবে এমন পরিকল্পনা ছিল। পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ আয়েশ করে সিগারেট ধরানোটা করা যাবে। প্রথম অংশ খাওয়া দাওয়া বাদ দিতে হবে।

কোন একটা দোকানে গিয়ে দরদাম করে দু'টা কলা কিনে সেখানেই তাৎক্ষণিকভাবে ছিলে খেয়ে ফেলা যায়। কলা খাওয়া হয়ে যাবার পরে পকেটে হাত দিয়ে আঁৎকে উঠে বলতে হবে — সর্বনাশ 'মানিব্যাগ গন'। এই সব কাজ মজিদ ভাল পারত। তার অভিনয় প্রতিভা ছিল তুলনাহীন। তার কাব্য প্রতিভাও তুলনাহীন। সে এখন কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসিত। তার বিয়ের কার্ড এসেছে। কার্ডের সঙ্গে ছোট চিরকুট —

দোস্ত,

কার্ড দেখে বুঝতে পারছিস বিয়ে করছি। খবর্দার বিয়েতে আসবি না। হাত জোড় করছি। সাজ্জাদও যেন না আসে। ওকে আমি বিয়ের কার্ডও পাঠাইনি। কবিতার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি, রক্তমাংসের কবিতা আমার কাছে অনেক আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। প্রতিজ্ঞা করেছি দুই দেবীর আরাধনা করব না। পুরানো লেখাও সব ছিড়ে ফেলেছি। দোস্ত খবর্দার তোরা বিয়েতে আসবি না।

ইতি মজিদ

মজিদের বিয়ের কার্ডটা সুন্দর । সাধু ভাষায় লেখা ভাব গম্ভীর নিমন্ত্রণ পত্র।

"আল্লাহ পাকের অসীম মেহেরবানীতে আগামী ৮ই পৌষ ২৯শে রজব রোজ শুক্রবার বাদ জুমা এজিন কাবিনের দিন ধার্য্য হইয়াছে . . . "

আতাহার বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষিধে ক্রমেই বাড়ছে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় শুয়ে থাকলে ক্ষিধে কম লাগে কার যেন কথা? মজিদের। ক্ষুধা বিষয়ে মজিদের অনেকগুলি আবিষ্কার আছে। ক্ষুধা নষ্ট করা বিষয়ক আবিষ্কার। তার মধ্যে আছে —

১। প্রচণ্ড ক্ষুধায় গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা চালাতে হবে। সামান্য বমি হলে সারাদিনের জন্য ক্ষিধে নষ্ট হবে।

২। প্রচুর লবণ দিয়ে আধ ছটাক বাদাম খেতে হবে। এর মধ্যে কয়েকটা অবশ্যই খোসা শুদ্ধ।

৩। প্রচুর পরিমাণ চা এবং প্রচুর পরিমাণে জর্দাসহ পান খেলেও ক্ষিধে নষ্ট হবে। তবে এই পদ্ধতি বিপদজনক, এতে মুখের ভেতরের চামড়া পুড়ে যায় ।

প্রতিটি পদ্ধতি মজিদের পরীক্ষিত। এখন মনে হচ্ছে এ জীবনে তাকে আর ক্ষিধে নষ্ট করার কোন পরীক্ষা করতে হবে না। তার ক্ষিধে পেলেই সবুজ চুড়ি পরা স্নিগ্ধ দু'টা হাত তাকে ভাত বেড়ে দেবে। গোল গোল চাকা করা বেগুন গরম গরম ভেজে তার উপর এক চামচ গাওয়া ঘি ঢেলে দেবে। মজিদ তখন হয়ত রহস্য করে বলবে, ও বউ, আমার ডান হাতে কি যেন হয়েছে। হাত নাড়াতে পারছি না। কি সমস্যায় পড়লাম বল দেখি। বউ মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলবে, তুমি বড় যন্ত্রণাা কর। আচ্ছা যাও হা কর, খাইয়ে দিচ্ছি। কে কোন ফাঁকে দেখে কি সব ছড়াবে।

ছড়াক যার যা ইচ্ছা — "আমি তব মালঞ্চের হব মালাকার।"

'মানে কি?'

'মানে হল আমি তোমার দাসানুদাস।'

'হয়েছে দাস হতে হবে না। কপ কপ করে গিলবেনাতো। ভালমত চিবিয়ে খাও।'

'ভাত খাবার ফাঁকে আচার হিসাবে ছোট্ট একটা চুমু কি খেতে পারি?'

'ফাজলামী করবেনাতো। তোমার এইসব ফাজলামী অসহ্য লাগে।'

আতাহার পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করে সবধানে টেবিলের উপর রাখল। তার জীবনের শেষ সঞ্চয় নষ্ট যেন না হয়।

পরিমল বাবু বললেন, ভাই একটা রিকোয়েস্ট — ঘরের ভিতর সিগারেট খাবেন

না। দয়া করে বাইরে গিয়ে খাবেন।

'জ্বি আচ্ছা। আজ আপনার কাশি এখনো শুরু হয়নি, ব্যাপারটা কি?'

পরিমল বাবু দুঃখিত চোখে তাকালেন। আতাহার বলল, কাশি শুরু না হওয়ায় সব কেমন এলোমেলো লাগছে। নাটক শুরু হয়ে গেছে অথচ আবহ সংগীত নেই।

'ভাই রসিকতা করবেন না। মানুষের যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি নিয়ে রসিকতা করতে নেই। ভগবান বিরক্ত হন । আজ আপনার খাওয়া দিয়ে যায় নি?'

'মনে হয় ভুলে গেছে। বাঙ্গালী বড়ই বিস্মৃতি পরায়ণ জাতি। এরা সব কিছু দ্রুত ভুলে যায়।'

'আপনার ক্ষিধে লাগেনি?'

'লেগেছে তবে ক্ষুধা জয়ের কিছু মন্ত্র আমার জানা আছে। আমার বন্ধু মজিদ এই বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করেছে। মন্ত্রগুলির সেই হচ্ছে জনক। তার মন্ত্র ব্যবহার করে আপাতত সুখে নিদ্রা যাব। '

'আমার টিনের কৌটায় মুড়ি আছে, খাবেন ?'

'জ্বি–না।'

'খাবেন না কেন?'

'মুড়ি খেতে ইচ্ছা করছে না বলে খাব না।'

'কি খেতে ইচ্ছা করছে?'

'চিকন চালের গরম গরম ভাত। খুব শক্তও না, আবার নরমও না। ধোঁয়া উড়ছে এমন গরম। পাতের পাশে চাক চাক করে কাটা বেগুন ভাজা। বেগুন ভাজার উপর গরম ঘি এক চামচ ঢেলে দেয়া হয়েছে। ভাত এবং বেগুনের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে, ঘিয়ের গন্ধ। পাতের পাশে গাঢ় সবুজ রঙের একটা কাচা মরিচ।

পরিমল বাবু বিছানায় শুয়ে ছিলেন। উঠে বসলেন, মুগ্ধ গলায় বললেন, আপনার কথা শুনেতো আমার নিজেরই আবার ক্ষিধে লেগে গেছে। বেগুন ভাজা দিয়ে ভাত সত্যি সত্যি খাবেন? কাছেই আমার এক আত্মীয় থাকেন। তাঁকে বললে রেঁধে দেবেন।

'উনার কাছে কি বেগুন আছে?'

'বেগুন হাতীরপুলের কাঁচা বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাব। হাতীরপুলের কাঁচা বাজারে সারা রাত শাক–সব্জি পাওয়া যায়।'

'না থাক।'

'থাকবে কেন, চলুন। আপনার খুব ক্ষিধে লেগেছে আপনাকে দেখে মায়া লাগছে এই জন্য বলছি।'

আতাহার হাসি মুখে বলল, আমাকে দেখে যদি মায়া লাগে তাহলে দয়া করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট খাবার অনুমতি দিন।

'আচ্ছা খান। সিগারেট খান।'

আতাহার সিগারেট ধরাল। বালিশের কাছে এয়ার মেইল স্টিকার লাগানো

মনিকার চিঠি। প্রায় এক সপ্তাহ হল এই চিঠি খাম বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। খাম খোলা হয়নি। চিঠিও পড়া হয়নি। মনিকার চিঠি পড়তে ইচ্ছা করে না। চিঠিতে কি লেখা থাকবে জানা কথা। একগাদা হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর। হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর পড়ে কি হবে? আনন্দময় কোন চিঠি থাকলে পড়া যেত। মনিকা আনন্দের কিছু লিখতে পারে না। আতাহার নিজের অজান্তেই চিঠির খাম খুলল —

প্রিয় আতাহার,

তোদের ব্যাপারটা কি আমাকে বলবি? কি হচ্ছে না হচ্ছে আমাকে কিছুটা জানাবি না? আমিতো তোর বোন। বাবা-মা তো আমাকে মেঘনা নদীর জল থেকে তুলে আনেন নি।

মায়ের কবর কোথায় হল? জানাজায় কত লোক হয়েছিল কিছুই আমাকে জানাবি না? প্রতি দিন তোদের কথা ভাবি — এই তার প্রতিদান। তোদের কথা এত বেশি ভাবি বলেই দিন রাত তোর দুলাভাইয়ের বাক্যবান সহ্য করতে হয়।

যাই হোক এখন তোকে একটা সুসংবাদ দিচ্ছি। তোর এবং ফরহাদের ইমিগ্রেশন হয়েছে। তোদের নিজেদের তো কোন গরজ নেই দু'কপি ছবি পাঠানোর কথা বললে পাঠাবি না। তিনবার চারবার মনে করিয়ে চিঠি দিতে হবে। বার্থ সার্টিফিকেটের মত সামান্য সার্টিফিকেট জোগার করতে তোদের লাগে তিন মাস। আল্লাহর অসীম মেহেরবানী এখানে একজন ভাল লইয়ার পেয়েছিলাম। উনি প্রচুর ডলার নিয়েছেন, কিন্তু কাজ ভাল করেছেন।

তোরা প্রথম কিছুদিন এসে আমার এখানেই থাকবি তারপর নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিবি। লোকে যে বলে আমেরিকায় পথে-ঘাটে ডলার উড়ে বেড়ায় ধরতে জানলেই হল, কথাটা মিথ্যে না। সাউথ ইন্ডিয়ান এক ভদ্রলোক আমেরিকায় এসে এক অফিসে জেনিটারের চাকরি নিলেন। মেঝে ঝাড়ু দেন। কমোড পরিষ্কার করেন। পাঁচ বছরের মাথায় ভদ্রলোক মিলিওনীয়ার হয়েছেন। তাঁর বেশ কয়েকটা ফাস্ট ফুডের দোকান আছে। নাম হল 'কাপ্পাস ইটারি।' ভদ্রলোকের নাম হরিকাপ্পা। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ভদ্রমহিলা অতি মিশুক। তিনি তাঁর স্বামীকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা।

এক হাজার ডলারের একটা ব্যাংক ড্রাফট পাঠালাম। তোদের এখানে ডলার এখন কত করে? চল্লিশ করে না? যদি চল্লিশ করে হয় তাহলে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা পাবি। এই টাকাটা তোদের দুই ভাইকে আমি ধার হিসেবে দিচ্ছি। আমেরিকা এসে শোধ করবি। এবং টাকার ব্যাপারটা যেন কোন ক্রমেই তোর দুলাভাই না জানে। টাকাটা দিয়ে তোরা ভালমত জামা কাপড় বানিয়ে আনবি। টিকিট আমি পিটিএ করে পাঠাব। ভাল কথা, আমার জন্যে ভাল কাসুন্দি আনতে পারবি? ক'দিন ধরে হঠাৎ কাসুন্দি দিয়ে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছা

করছে। এখানে 'শ্যাড' নামের এক ধরনের মাছ পাওয়া যায়। আমাদের ইলিশ মাছের মত, তবে স্বাদ কম। তোদের খাওয়াব। আমরা এখন আর ডিফারেন্স ধরতে পারি না। তোরা নিশ্চয়ই পারবি।

ভাল কথা, মা-বাবা এই দু'জনের কবরই আমি বাঁধাতে চাই। কালো গ্রানাইট পাথরে বাঁধাতে কত খরচ পড়বে আমাকে জানাবি। কবে দেশে আসব, তাতো জানি না। এলে যেন মা'র কবরের একটা চিহ্ন দেখতে পাই।

ইতি তোর

মনিকা আপু

এক হাজার ডলারের ব্যাংক ড্রাফটটা আতাহার ঘুরিয় ফিরিয়ে দেখল। সামান্য একটা কাগজ। যে কাগজে নগদ মূল্যে অনেক খানি সুখ কেনা যায়।

পরিমল বাবুর কাশি শুরু হয়েছে। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমেরিকায় গেলে ক্যাসেটে পরিমল বাবুর কাশি রেকর্ড করে নিয়ে যেতে হবে। ঘুমুবার আগে কাশি না শুনলে ঘুম হবে না।

খক খক খকর খক। খু খু খু — খকর খকর খকর — হ হ হ খক খক খক। কাশি চলছেই।

কবি

হোসেন সাহেব সাজ্জাদকে ড্রাগ এডিক্ট ট্রিটমেন্ট সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা ছিল সাজ্জাদ প্রবল আপত্তি করবে। তা সে করেনি। বাবার একটা কথাতেই রাজি হয়েছে। নিজেই আগ্রহ করে স্যুটকেসে কাপড় চোপড় নিয়েছে, বইপত্র নিয়েছে। ঘরে ছোট পোর্টেবল ক্যাসেট প্লেয়ার ছিল না। ড্রাইভারকে পাঠিয়ে বায়তুল মোকাররাম থেকে কিনিয়ে আনিয়েছে।

হোসেন সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে ছেলে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর দুঃখে এবং লজ্জায় তিনি মরে যাচ্ছেন। সাজ্জাদের চোখে চোখ রেখে কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না। তিনি কথা বলছেন অন্য দিকে তাকিয়ে।

'বাবা সাজ্জাদ!'

'জ্বি।'

'ড্রাগের সমস্যাটা তো বাবা মানসিক। তার জন্য তুমি লজ্জিত হয়ো না, বা দুঃখিত হয়ো না। দোষটা পুরোপুরিই আমার।'

সাজ্জাদ বলল, তোমার হবে কেন?

'আমি তোমাকে প্রপার গাইডেন্স দিতে পারিনি। তোমার মা পাশে ছিল না, একা একা তোমাদের মানুষ করতে গিয়ে ভুল করেছি।'

'তুমি কোন ভুল করনি বাবা। ভুল পুরোটাই আমার। একুশে পদকের মত 'শ্রেষ্ঠ পিতা পদক' বলে কোন জাতীয় পদক থাকলে অবশ্যই তুমি সেই পদক পেতে।'

হোসেন সাহেবের চোখ ভিজে উঠল। মনে হচ্ছে তিনি কেঁদে ফেলবেন। অনেক কষ্টে তিনি নিজেকে সামলালেন। সাজ্জাদ বলল, বাবা শোন, আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি সুস্থ হয়ে ফিরব। এবং তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে আমি ড্রাগ স্পর্শ করব না। তবে তোমার মৃত্যুর পর কি হবে আমি জানি না।

'তুই চিকিৎসা কেন্দ্রে ভর্তি হচ্ছিস এটা কাউকে জানানোর দরকার নেই।'

'জানালেও কোন ক্ষতি নেই বাবা। শরীরের অসুখের কথা যেমন জানানো যায়, মনের অসুখের কথাও জানানো যায়।'

'দরকার কি?'

'তুমি জানাতে না চাইলে জানিও না।'

'যে সাইকিয়াট্রিস্ট তোর চিকিৎসা করবেন তাঁর নাম রুবিনা। রুবিনা হক। খুব নাম করা সাইকিয়াট্রিস্ট।'

'বুঝলে কি করে নাম করা?'

'আমেরিকার সেন্ট পল হাসপাতালের সাইকিয়াট্রিস্ট বিভাগে ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি খুব ইমপ্রেসড। তোর যে সব সমস্যা তাঁকে খোলাখুলি বলবি। ডাক্তার এবং উকিল এদের কাছে কিছু লুকাতে নেই।'

'আমি কিছুই লুকাব না। উনি যা জানতে চাইবেন আমি বলব।'

'জানতে না চাইলে নিজে থেকে বলবি। হয়ত কোন একটা জরুরি পয়েন্ট জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেল।'

'ভাল সাইকিয়াট্রিস্ট হলে ভুলবে না। যদি ভুলে যায় তাহলে বুঝতে হবে লো ক্যালিভার সাইকিয়াট্রিস্ট। তখন তার প্রশ্নের জবাব না দেয়াই ভাল।'

'তোর বন্ধু বান্ধব যদি তোর খোঁজ করে তাহলে আমি বলব তুই কিছুদিনের জন্যে রাঙ্গামাটি গিয়েছিস।'

'আচ্ছা।'

'ওদের কাউকে যদি তোর কিছু বলার থাকে তাহলে আমাকে বলে যা। আমি বলে দেব।'

'কাউকে কিছু বলতে হবে না। শুধু মজিদের বিয়ে হচ্ছে ৮ই পৌষ। বিয়েতে দামী গিফট পাঠাবে। দাওয়াতের কার্ড দিয়ে যাচ্ছি — সেখানে ঠিকানা আছে।

'কি গিফট পাঠাব?'

'দামী একটা শাড়ি আর একসেট রবীন্দ্র রচনাবলী। মজিদ সব সময় বলতো তার টাকা হলে সে এক সেট রবীন্দ্র রচনাবলী কিনবে।'

'আচ্ছা আমি পাঠিয়ে দেব। তবে আমার ধারণা ৮ই পৌষের আগেই তুই সুস্থ হয়ে ফিরে আসবি।'

'আমার সে রকম মনে হয় না বাবা।'

হোসেন সাহেব একাই সাজ্জাদকে চিকিৎসা কেন্দ্রে রেখে এলেন। নীতুকে সঙ্গে নিলেন না। তাঁর মনে হল এইসব জায়গায় মেয়েদের নিয়ে যাওয়া ঠিক না। গাড়িতে ফেরার পথে তিনি খুব কাঁদলেন।

রুবিনা হকের বয়স চল্লিশের উপরে — তাকে দেখে তা মনে হয় না। বয়সের একমাত্র ছাপ তাঁর চুলে। কানের পাশের চুল সাদা হয়ে আছে। তিনি সেখানে রঙ দেননি। কানের পাশে চুলগুলি কালো করে তিনি যদি চোখ থেকে ভারী চশমাটা খুলে ফেলতেন তাহলে তাঁকে কিশোরীদের মত দেখাতো। তিনি তা জানেন। কিশোরী মনস্তত্ত্ববিদ রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এই তথ্যটিও সম্ভবত তাঁর জানা। তিনি সাজ্জাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন আছেন?

সাজ্জাদ বলল, ভাল।

মহিলার শাড়ির রঙ হালকা সবুজ। কাঁধে সাদা রঙের চাদর জড়িয়েছেন। তাঁকে এই পোষাকেও চমৎকার লাগছে। শুধু গলার স্বর 'হাস্কি'। মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা লেগেছে।

রুবিনা হক বললেন, আসুন আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলি।

সাজ্জাদ বলল, বলুন। সেসানটা হবে কেমন? আমি কি কাউচে শুয়ে থাকব?

'না। যেভাবে চেয়ারে বসে আছেন ঠিক সেইভাবে বসে থাকবেন। চা দিতে বলব?'

'বলুন।'

'আপনি কি সিগারেট খান?'

'জ্বি খাই।'

'তাহলে সিগারেট খেতে পারেন। আমি নিজেও সিগারেট খাই। তবে বাংলাদেশের পুরুষদের সামনে না। মেয়েরা সিগারেট খাচ্ছে এই দৃশ্য এই দেশের পুরুষরা অভ্যস্ত হয় নি। তারা একটা শক খায়। আপনাকে কোন শক দিতে চাচ্ছি না।'

সাজ্জাদ বলল, আমি এত অল্পতে শকড হই না। আপনি সিগারেট ধরান।

রুবিনা হক অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালেন। টেবিলের ওপাশে ফ্লাস্ক ছিল। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন।

'সাজ্জাদ সাহেব!'

'জ্বি।'

'আসুন আমরা একটা চুক্তি করি।'

'কি ধরণের চুক্তি।'

'আমার প্রশ্নের আপনি সত্যি জবাব দেবেন। সরাসরি জবাব দেবেন। ড্রাগ নিয়ে যারা অভ্যস্ত এই কাজটা তারা পারে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপনি পারবেন।'

'আপনার এরকম মনে হবার কারণ কি?'

'আপনাকে রেসপনসিভ বলে মনে হচ্ছে। আপনার ভেতর দ্বিধা এবং কুণ্ঠার ভাবটা নেই। আমার কি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করব?'

'করুন।'

'আমি কি ধরে নিতে পারি আপনি সত্যি কথা বলবেন?'

'হ্যাঁ ধরে নিতে পারেন?'

রুবিনা হক সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে সাজ্জাদের দিকে ঝুঁকে এলেন। ভারী এবং গম্ভীর গলায় বললেন, আপনি কি কখনো মানুষ খুন করার কথা ভেবেছেন?

সাজ্জাদ হকচকিয়ে গেল। এই প্রশ্নের জন্যে সে তৈরী ছিল না। সে ধরে নিয়েছিল প্রশ্ন হবে ড্রাগ সম্পর্কিত। সে কি ধরণের ড্রাগ নেয়। কতবার নেয়। কবে

থেকে শুরু করেছিল এইসব। ভদ্রমহিলা সে দিকে না গিয়ে আচমকা প্রশ্ন করলেন — আপনি কি কখনো মানুষ খুন করার কথা ভেবেছেন। ইন্টারেস্টিং।

সাজ্জাদ বলল, সব মানুষই জীবনে কখনো না কখনো খুন করার কথা ভাবে।

'আমি সব মানুষের কথা জানতে চাচ্ছি না। আপনার কথা জানতে চাচ্ছি। আপনি কি ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু ভেবেছেন, না পরিকল্পনাও করেছেন?'

'পরিকল্পনাও করেছি।'

'পরিকল্পনাটা বলুন।'

সাজ্জাদ হেসে ফেলল। রুবিনা হক বললেন, বুঝতে পারছি আপনার প্রাথমিক পরিকল্পানটা খুব হাস্যকর ছিল। নিশ্চয়ই শিশু বয়সের পরিকল্পনা। বলুন শুনি। আপনার সিগারেট নিভে গেছে। সিগারেট ধরিয়ে বলুন।

'আমার একজন প্রাইভেট স্যার ছিলেন — নাম এজাজ উদ্দিন। ইংরেজী পড়াতেন। স্যারের অভ্যাস ছিল সারাক্ষণ নাকের লোম ছেড়া। তিনি নাকের লোম ছিড়তেন এবং তাঁর সামনে একটা সাদা কাগজে সেগুলি জমাতেন। আমাকে পড়ানো শেষ করে কাগজটা প্যাকেট করে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।'

'আপনার কাছে দৃশ্যটা ভয়ংকর কুৎসিত লাগত?'

'জ্বি।'

'আপনি তাকে খুন করার পরিকল্পনা করলেন?'

'জ্বি।'

'পরিকল্পনাটা বলুন শুনি।'

'আমার ফুটবলের একটা পাম্পার ছিল। আমি ঠিক করলাম কেরোসিন দিয়ে সেই পাম্পার ভর্তি করব। তারপর আড়াল থেকে পাম্পারে চাপ দিয়ে তাঁর গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেব। তারপর একটা দেয়াশলাই জ্বেলে কাঠিটা তার গায়ে ফেলে দেব।'

'আপনার বয়স তখন কত?'

'আমি তখন সিক্সে পড়ি।'

'পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি কেন?'

'স্যার চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন।'

'পরের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।'

'কণা নামের একটা মেয়ে আছে আমি তার স্বামীকে খুন করার পরিকল্পনা করি।'

'পরিকল্পনা সম্পর্কে বলুন।'

'খুব সহজ পরিকল্পনা — জটিল কিছু না। আমি খুব তীব্র কিছু বিষ জোগাড় করে কণাকে দিয়ে আসি। তাকে বলে দেই সে যেন কোন না কোন ভাবে তার

স্বামীকে খানিকটা খাইয়ে দেয়।'

'কণা রাজি হয়?'

'সে শিশিটা হাতে নিয়ে খুব হাসে। হাসি দেখে মনে হচ্ছিল সে রাজি।'

'সে যে রাজি না সেটা কখন বুঝলেন?'

'পরের বার তার খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সে বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।'

'মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করতে চাচ্ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? সে খুব রূপবতী?'

'না, খুব রূপবতী না। চেহারায় আকর্ষণ ক্ষমতা অবশ্যি আছে। . . .'

'কেন তাকে বিয়ে করতে চান এটা নিয়ে কি কখনো ভেবেছেন?'

'জ্বি-না।'

'ব্যাপারটার পেছনে কি প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করছে? আপনার মা, আপনার বাবাকে ছেড়ে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে . . . এই জাতীয় কিছু।'

'হতে পারে।'

'আপনার কি বন্ধু-বান্ধব আছে?'

'না।'

'না কেন?'

'বেশী দিন কাউকে আমার ভাল লাগে না।'

'কেন লাগে না।'

'ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নশ্রেণীর মনে হয়। ওদের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাই না।'

'মানুষকে চমকে দিতে আপনার ভাল লাগে?'

'লাগে।'

'আপনার শখ কি?'

'আমার কোন শখ নেই।'

'আপনার বাবার কাছে শুনেছি মুখোশ সংগ্রহ করা আপনার হবি।'

'ঠিকই শুনেছেন।'

'মাঝে মাঝে আপনি কি মুখোশ পরে চুপচাপ বসে থাকেন?'

'জ্বি।'

'আপনি কি জানেন আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'জানি।'

'আমাদের সাইকোলজির ভাষায় এই রোগের একটা নাম আছে। আপনি নামটা জানেন?'

'Antisocial Psychopath'

'এই বিষয়ে আপনার পড়াশোনা আছে?'

'জ্বি আছে। আমার প্রিয় বিষয় — কবিতা এবং সাইকোলজি।'

'আমাকে একটা কবিতা শুনানতো।'

সাজ্জাদ চোখ বন্ধ করে গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করল,

> You know Orion always comes up sideways .
> Throwing a leg up over our fence of mountains.
> And rising on his hands, he looks in on me
> Busy outdoors by lantern-light with something
> I should have done by daylight, and indeed, . . .

'কার কবিতা?'

'রবার্ট ফ্রস্ট।'

'রবার্ট ফ্রস্ট কি আপনার প্রিয় কবি?'

'না — আমার অপ্রিয় কবি।'

'অপ্রিয় কেন? যে সব কবিতা আপনার লেখার কথা সে সব কবিতা উনি লিখে ফেলেছেন বলে?'

'হ্যাঁ।'

সাজ্জাদ হাসল। মহিলার বুদ্ধি তাকে চমৎকৃত করছে। এর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। সাধারণত মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে আরাম পাওয়া যায় না। জন্মগতভাবেই তারা চাপা। এরা সহজ ভাবে কিছু বলবে না। বুদ্ধিমতি মেয়েদের বেলায় এই ব্যাপারটি আরো তীব্র। তারা পুরুষদের সঙ্গে কখনো বুদ্ধির খেলা খেলবে না। নিজের বুদ্ধি, মেধা ও মনন চাপা দিয়ে রাখবে। মেয়েরা অন্যদের কাছে নিজেদের সরল সহজ হিসেবে দেখাতে ভালবাসে।

'সাজ্জাদ সাহেব।'

'জ্বি।'

'কণার হাতে বিষের শিশি দিয়েছেন, এই কথাটা আপনার বানানো? তাই না?'

'জ্বি বানানো — আমি কণাকে বলেছিলাম আমি তোমাকে বিষ দিয়ে যাবো। তুমি তোমার স্বামীকে খাইয়ে দিও। শুনে সে খিলখিল করে হেসেছিল। আমি তার দু'দিন পরে সত্যি সত্যি বিষের কৌটা নিয়ে যাই — তখন আর তাদের পাইনি। এবার কিন্তু আমি সত্যি কথা বলছি।'

'হ্যাঁ এবার সত্যি কথা বলেছেন। আপনার মা যখন আপনার বাবাকে ছেড়ে যান তখন আপনার বয়স কত?'

'ছ' সাত বছর হবে। ঠিক বলতে পারছি না।'

'সেই সময়কার স্মৃতিতো নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'আপনার মা যাকে বিয়ে করেন তিনি আপনার বাবার বন্ধু?'

'জ্বি।'

'আপনার বাবার অনুপস্থিতিতে তিনি আসতেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মা কি তার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে গল্প করতেন?'

'হ্যাঁ।'

'দরজার ফাঁক দিয়ে আপনি কি কখনো উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন ভেতরে কি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, করেছি।

'যা দেখেছেন তাতে আপনার মনে প্রচণ্ড রাগ এবং ঘৃণা তৈরি হয়েছে।'

'আমি ছোট ছিলাম। কিছু বুঝতাম না।'

'তার পরেও প্রচণ্ড রাগ এবং ঘৃণা জন্মাতে পারে।'

'হ্যাঁ পারে।'

'আপনি কি বুঝতে পারছেন আপনার বর্তমান অবস্থার বীজ হচ্ছে শৈশব।'

'হতে পারে।'

'এখনতো আপনার বয়স হয়েছে, এখন কি আপনি আপনার মা'র ব্যাপারটা সহজভাবে নিতে পারেন না? বাবা আপনার যতই প্রিয় হোন না কেন আপনার মা'র কাছে প্রিয় ছিলেন না। তাঁর যে সব অভাব ছিল আপনার বাবা সে সব অভাব মিটাতে পারছিলেন না। অসুখী একজন মহিলা সুখের সন্ধান করবে — এটা কি স্বাভাবিক না?'

'হ্যাঁ স্বাভাবিক।'

'আপনি কি আরেক কাপ চা খাবেন?'

'না।'

'আপনার কি ক্ষিধে পেয়েছে? কিছু খাবেন? আমার সঙ্গে ভাল চকলেট কেক আছে।'

'কেক না — অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করছে।'

'বলুন কি খেতে চান?'

সাজ্জাদ শীতল গলায় বলল, একটা টিকটিকি খেতে চাই। মিডিয়াম সাইজের একটা টিকটিকি।

রুবিনা হকের মুখের ভাব বদলাল না। তিনি স্বাভাবিক ভাবেই ফ্লাক্স থেকে চা ঢালছেন। যেন তিনি সাজ্জাদের কথা শুনতে পান নি।

সাজ্জাদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার হাতের মুঠি বন্ধ। মনে হচ্ছে সে অনেক কষ্টে রাগ সামলাচ্ছে।

নীতু তার বাবাকে ডাকতে এসে দেখল তিনি জবুথবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর মাথা নিচু। বেশ শীত পড়েছে। কিন্তু তিনি বসে আছেন পাতলা একটা গেঞ্জি গায়ে।

মাথার উপর ফ্যানটাও ফুলস্পীডে ঘুরছে। নীতু বলল, বাবা তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?

হোসেন সাহেব বললেন, না।

'তাহলে এসো। ভাত খাবে এসো।'

হোসেন সাহেব বললেন, ভাত খাব নারে মা।

'ভাত খাবে না কেন?'

'মনটা ভাল নেই।'

'রুটি বানিয়ে দেব?'

'না। কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'একদম কিচ্ছু খাবে না তা কি করে হয় বাবা? একটা কলা খাও, আর এক গ্লাস দুধ এনে দেই?'

'আচ্ছা দে।'

নীতু কলা এবং দুধ এনে দেখল তার বাবা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। নীতুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একজন বয়স্ক মানুষ যদি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে তাহলে তাকে খুব অসহায় লাগে। নীতু বাবার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, ভাইয়ার জন্য কি মনটা খারাপ লাগছে বাবা?

'না।'

'তাহলে কি জন্য মন খারাপ লাগছে?'

হোসেন সাহেব চোখ মুছতে মুছতে বললেন, আমার জন্যে তোদের সবার জীবন উলট পালট হয়ে গেল এই জন্য মন খারাপ লাগছে।

'তোমার জন্যে হবে কেন?'

'অবশ্যই আমার জন্যে। আমি তোদের ঠিকমত মানুষ করতে পারি নি। ঠিকমত মানুষ করলে এই সমস্যা হত না। তোদের দু'জনের জীবনই ধ্বংস করে দিয়েছি। সব সময় আমার নিজেকেই দোষী মনে হয়।'

নীতু বলল, শুধু শুধু কষ্ট পেও না বাবা। তুমি কারো জীবন নষ্ট করনি। আরেকটা কথা বাবা তুমি বার বার দু'জনের জীবন নষ্ট করে দিয়েছি এসব বলছ কেন? ভাইয়ার জীবন খানিকটা এলোমেলো হয়েছে — কিন্তু আমারতো কিছু হয়নি। আমি ড্রাগও ধরিনি, মাথা খারাপের মত আচরণও করছি না।

হোসেন সাহেব ধরা গলায় বললেন, তুইও করছিস। বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেল, দাওয়াতের চিঠি চলে গেল তখন তুই সব বাতিল করে দিলি। এটাতো মা এক ধরনের অসুস্থতা।

নীতু বাবার হাতে হাত রেখে বলল, বাবা এরকম আর হবে না। তুমি আবার আমার জন্যে একটা বিয়ে ঠিক কর, দেখবে আমি হাসি মুখে বিয়ের আসরে গিয়ে বসব।

হোসেন সাহেব বললেন, আমার নিজের শরীরটা ভাল না। কয়েকদিন পরপর

বুকে ব্যথা হয়, তোদের বলি না। তোরা নার্ভাস হয়ে পড়বি। আমি বুঝতে পারছি আমার সময় শেষ হয়ে গেছে। অথচ কিছুই গুছিয়ে যেতে পারলাম না। সব এলোমেলো। যত দিন যাচ্ছে ততই এলোমেলো হচ্ছে।

নীতু বলল, দুধটা খাও বাবা।

হোসেন সাহেব বাধ্য ছেলের মত দুধের গ্লাসে চুমুক দিলেন। বাবাকে দেখে নীতুর মনটা মায়ায় ভরে গেল। তার ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে এমন কিছু করে যা দেখে তার বাবার মনটা ভাল হয়ে যায়। তিনি যেন বুঝতে পারেন তাঁর সংসারটা পুরোপুরি এলোমেলো হয়ে যায় নি।

নীতু বাবাকে ঘুমুতে পাঠিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে প্যাডের কাগজে লিখল,

আতাহার ভাই,

দয়া করে আপনি কি এক্ষুণি একটু আসবেন?

ইতি নীতু

নীতু চিঠি খামে বন্ধ করল না। চিঠিতে এমন কিছু লেখা নেই যে খামের ভেতর আড়াল করে পাঠাতে হবে। খুব সহজ সরল আহ্বান।

নীতু চিঠি হাতে ড্রাইভারের খোঁজে গেল। ড্রাইভারকে বলে দিল চিঠিটা যেন সে আতাহারকে দেয় এবং যত রাতই হোক সে যেন আতাহারকে নিয়ে আসে। রাত তিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলেও সে যেন অপেক্ষা করে।

নীতু বারান্দায় বসে অপেক্ষা করছে। যত রাতই হোক সে অপেক্ষা করবে। আতাহার যদি রাত তিনটাতেও আসে সে বসেই থাকবে। দেরীতে এলেই ভাল হয়, আতাহার ভাইকে কি বলবে তা সে গুছিয়ে নিতে পারবে। বেশি কিছু বলবে না। অল্প কয়েকটা কথা — 'আতাহার ভাই আমি সারাক্ষণ আপনার কথা ভাবি। আমি জানি আমার ভয়ংকর কোন অসুখ করেছে। আপনি আমার অসুখ সারিয়ে দিন।'

তার মুখে এই ধরনের অদ্ভুত কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে তাকাবেন তখন সে আতাহার ভাইয়ের হাত ধরে যা মনে আসে তাই বলবে। আগে থেকে কিছু ভেবে রাখবে না। তার যদি ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয় — কাঁদবে। অন্য কিছু করতে ইচ্ছে করলেও করবে। তাকে যদি সবাই পৃথিবীর সবচে খারাপ মেয়ে ভাবে তাতেও কিছু যায় আসে না। কিছু যায় আসে না। কিচ্ছু যায় আসে না। না — না-না।

নীতু বারান্দার বাতি নিভিয়ে রাখল। অন্ধকারই ভাল। অন্ধকারে এমন অনেক কিছু বলা যায় যা আলোতে বলা যায় না। শুধু একটাই সমস্যা অন্ধকারে সে আতাহার ভাইয়ের মুখটা দেখতে পাবে না। মুখ না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই — সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে। আজ রাতের জন্য সে হবে এক অন্ধ তরুণী।

ড্রাইভার রাত একটার দিকে ফিরে এসে জানালো — আতাহারকে সে খুঁজে পায়নি । সে আগে যেখানে থাকতো সেখানে নেই। এখন অন্য কোথায় যেন থাকে। কেউ বলতে পারে না কোথায়।

কবি

আতাহার কাল রাত থেকে পথে পথে ঘুরছে। নিজের ঘরে ফেরে নি। ফরহাদকে প্লেনে তুলে দিয়ে তার মনটা এত খারাপ হল যে ঘরে ফিরতে ইচ্ছো করল না। মনে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে কেউ ঘরে ফিরে না। সন্ধ্যাবেলা সব পাখি ঘরে ফিরে। কারণ পাখিদের মনে কষ্ট নেই। মানুষের মনে নানান ধরনের কষ্ট। তাই বুঝি সব মানুষ ঘরে ফেরে না।

ফরহাদ এয়ারপোর্টে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। তার গায়ে কমপ্লিট স্যুট। গলায় লালের উপর কাল ফুলের টাই। পায়ে চকচকে নতুন জুতা। তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

আতাহার বলল, কাঁদছিস কেন?

ফরহাদ বলল, একা একা আমেরিকা যেতে ভয় লাগছে।

'ভয়ের কি আছেরে গাধা। নিউ ইয়র্কে নামবি। আপা এয়ারপোর্ট থেকে তোকে নিয়ে যাবে।'

'যদি না আসে?'

'আসবে না কেন? আসবেতো বটেই, না এলে এয়ারপোর্টে নেমে টেলিফোন করে দিবি।'

'ভাইয়া, তুমি আমেরিকা যাবে না?'

'যাব, তুষারপাত দেখার জন্যে বেড়াতে যাব। দেশ ছেড়ে যাব না। আমি হচ্ছি এই দেশের একজন কবি। কবিরা দেশের আত্মা। দেশ ছেড়ে আত্মা যাবে কি ভাবে? আমি কি করে যাই।'

'তুমি সারা জীবন পথে পথে ঘুরবে? এর বাড়িতে খাবে, ওর বাড়িতে ঘুমাবে।'

'তা না। কিছু দিনের মধ্য একটা চাকরি জোগার করব। তারপর যথা সময়ে বিয়ে টিয়ে করে গৃহপালিত হয়ে যাব।'

'তোমাকে চাকরি কে দেবে?'

'ময়না ভাই। খুব ওস্তাদ লোক — অনেক কানেকশান। তার সঙ্গে মোটামুটি কথাও হয়েছে। উনি চাকরির ব্যবস্থা করলেই শুভ বিবাহ। তোকে কার্ড পাঠিয়ে দেব। চলে আসবি।'

'কাকে বিয়ে করবে?'

'এখনো ঠিক করিনি। খুব সম্ভব নীতুকে। সমস্যা একটাই, মেয়েটা আমাকে দু' চোখে দেখতে পারে না।'

'দু' চোখে দেখতে পারে না এমন একটা মেয়েকে তোমার বিয়ে করার দরকার কি?'

'এখন দেখতে পারে না — তবে আমার ধারণা আমার সঙ্গে ভালমত মিশলে আমাকে সে পছন্দই করবে। মানুষ হিসেবে আমি কি খারাপ?'

'ভাইয়া, তুমি অসাধারণ।'

'এরকম কাঁদতে কাঁদতে কথা বলছিস কেন? চোখ মুছে স্বাভাবিকভাবে কথা বল। চোখের পানিতে তোর টাই ভিজে গেছে। টাইয়ের রঙ কাঁচা হলে রঙ ওঠে যাবে। সবাই তোকে দেখছে। প্লেন লেট আছে। চা খাবি? আয় চা খাই।'

'চল।'

দু' ভাই চা খেতে ঢুকল। আতাহার মনে মনে আল্লাহকে ধন্যবাদ দিল যে মিলি ঠাকুরগাঁ থেকে আসতে পারে নি। মিলির শাশুড়ি অসুস্থ, মরনাপন্ন। মিলি বিদায়ের সময় উপস্থিত থাকলে এক হাঁটু চোখের পানিতে এয়ারপোর্ট ডুবে যেত।

আতাহার বলল, ফরহাদ তুই এরকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছিস কেন?

'জুতাগুলি খুব টাইট হয়েছে।'

'টাইট হলে জুতা ফেলে দে। আমার স্যান্ডেল পরে চলে যা।'

'সত্যি স্যান্ডেল পরে যাব?'

'হ্যাঁ যা।'

'সবাই তাকিয়ে থাকবে। স্যুট পরেছি, পায়ে স্যান্ডেল।'

'তাহলে থাক।'

রেষ্টুরেন্টে ফরহাদ সারাক্ষণই একহাতে তার ভাইয়ের হাত ধরে থাকল। সেই হাত ছাড়ল শুধু ইমিগ্রেশন এরিয়ায় ঢোকার আগে।

আতাহার বলল, দাঁড়িয়ে থাকিস না — ঢুকে যা।

'আমার প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত ভাইয়া তুমি কিন্তু এয়ারপোর্ট ছেড়ে যাবে না।'

'না, যাব না। তুই রুমাল দিয়ে চোখটা ভালমত মোছ।'

ফরহাদ রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তাতে চোখের পানির কেন উনিশ বিশ হল না। টপ টপ করে চোখের পানি পড়ছেই।

আতাহার বৃটিশ এয়ার ওয়াজের বিমান আকাশে না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। বিমান আকাশে মিলিয়ে যাবার পর মনে হল — বাসায় ফিরেই বা কি হবে। একটা রাত এয়ারপোর্ট কাটিয়ে দেয়া যায় না? অবশ্যই যায়। এয়ারপোর্টে চায়ের দোকান আছে। সে দোকান নিশ্চয়ই সারারাত খোলা থাকে। দোকানের সামনে কোন একটা চেয়ারে বসে মানুষের মনের একটা জটিল রহস্য নিয়ে চিন্তা করা যেতে পারে। রহস্যটা হচ্ছে — ফরহাদ চলে যাওয়ায় তার এত খারাপ লাগছে কেন? তার মা মারা গেছে, বাবা মারা গেছে — কিন্তু সে এতটা কষ্টতো পায়নি। তার ভাই, যার

সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না বললেই হয় — তার জন্যে এতটা খারাপ লাগার মানে কি? এত জটিল কেন মানুষের মন?

এয়ারপোর্টে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। হেঁটে হেঁটে ঢাকার দিকে রওনা হলে কেমন হয়? একসময় না একসময় ঢাকায় নিশ্চয় পৌঁছে যাবে। আর পৌঁছতে না পারলেও ক্ষতি নেই — মানুষের যাত্রা কখনো শেষ হয় না। সে চলতেই থাকে। চলতেই থাকে। মৃত্যুর পরেও সে যাত্রা শেষ হয় না — তখন শুরু হয় অন্য এক যাত্রা।

হাঁটতে শুরু করে আতাহারের মনে হল সে আসলে ঢাকায় যেতে চাচ্ছে না। মন টানছে না। অন্য কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। সেই অন্য কোথাওটা আসলে কোথায় তা তার জানা নেই।

গণি সাহেব আতাহারকে দেখে আঁৎকে উঠলেন। অবাক হয়ে বললেন, কি হয়েছে তোমার?

আতাহার বলল, কিছু হয়নিতো।

'তোমাকে লাগছে মরা মানুষের মত। ইজ এনিথিং রং?'

'জ্বি না।'

'আসছ কোত্থেকে?'

'এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছিতো মনে এজন্যই ক্লান্ত লাগছে।'

'এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে আসার দরকার কি? অর্থহীন পাগলামী তোমরা কেন কর? ক্রিয়েটিভিটি এবং পাগলামীকে তোমরা সমার্থক করে ফেলেছ। এটা ঠিক না আতাহার। ক্রিয়েটিভিটি এবং পাগলামী দু'টা দু'জিনিস। এয়ারপোর্ট থেকে হেঁটে কেন এলে এটা আমাকে বুঝিয়ে বল দেখি?'

আতাহার কিছু বলল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আবার উঠে চলে যেতেও ইচ্ছা করছে না।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'তোমার জন্যে একটা সুসংবাদ আছে। শীত সংখ্যায় তোমার চারটা কবিতা এক সঙ্গে যাচ্ছে। শীত সংখ্যা বের হলে তোমাকে চমকে দেব বলে আগে খবর দেইনি। এখন তোমার অবস্থা দেখে আগে ভাগেই বললাম। কবিতাগুলি ভাল হয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ সত্যি। দু' এক জায়গায় ছন্দ ভুল আছে। মাত্রা এদিক ওদিক করলে ঠিক হয়ে যায় --- তবে আমি হাত দেইনি।'

'হাত দেননি কেন?'

'একদিন যদি খুব বিখ্যাত কেউ হয়ে যাও তখন তোমার কবিতায় হাত দেয়ার জন্যে দেশের লোক আমার উপর রাগ করবে। এই ভয়েই হাত দেইনি।'

আতাহারের মন গভীর আনন্দে আচ্ছন্ন হবার কথা। তা হচ্ছে না। বড় ক্লান্ত লাগছে। মনে হচ্ছে এই চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভাল লাগত। মাথার দু' পাশের শিরা দপ দপ করছে। জ্বর হবার আগে কি এ রকম হয়? অনেক দিন তার অসুখ বিসুখ হয় না। অসুখের আগের শারীরিক ব্যাপারগুলি সে জানে না।

'আতাহার!'

'জ্বি।'

'বাসায় চলে যাও। টেক রেস্ট। ইয়াং ম্যান, শরীরের দিকে লক্ষ্য রেখো। রবীন্দ্রনাথ শরীর ঠিক রাখার জন্যে আশি বছর বয়সেও চিরতার পানি খেতেন। হালকা ব্যায়াম করতেন। রিমেম্বার দ্যাট। টাকা লাগবে? নাও, পঞ্চাশটা টাকা রেখে দাও।'

আতাহার হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিল। তার কোন অস্বস্তি বা লজ্জাবোধ হল না। গণি সাহেব বললেন — কোন দিন যদি অতি বিখ্যাত হও তাহলে এই সব খুটি নাটি মনে রাখবে। জীবনী লেখার সময় অবশ্যই আমার কথা লিখবে। লিখবে — প্রথম জীবন বড় অর্থ কষ্টে কেটেছে। সে সময় সুবর্ণ সম্পাদক জনাব আব্দুল গণি আমাকে বিভিন্ন সময়ে অর্থ সাহায্য করেছেন। হা হা হা।

আতাহার উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল — আপনি নিজে কি জানেন, মানুষ হিসেবে আপনি প্রথম শ্রেণীর।

গণি সাহেব বললেন, না জানি না। তোমার কাছে প্রথম শুনলাম। মানুষ হিসেবে আমি প্রথম শ্রেণীর না। তোমার কাছে মনে হচ্ছে, কারণ তোমাকে উপরে ওঠার জন্যে আমি সাহায্য করেছি। সিঁড়ি কেটে দিচ্ছি। সিঁড়ি সবার জন্যেই কাটা হয়। সবাই সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে না। তোমার বন্ধু মজিদ পাড়ল না। লাফিয়ে কয়েক ধাপ উঠেই হুমকি খেয়ে পড়ে গেল। সাজ্জাদও পাড়ল না। শুনেছি ও কোন এক চিকিৎসা কেন্দ্রে আছে। কথাটা কি সত্যি?

'জ্বি।'

'একদিন আমাকে নিয়ে যেও, ওকে দেখে আসব।'

'জ্বি, নিয়ে যাব।'

'ও এখন কেমন আছে?'

'ভাল না। নানান রকম জটিলতা দেখা দিয়েছে।'

গণি সাহেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

আতাহার রাস্তায় নামল। হাঁটতে গিয়ে লক্ষ্য করল সে ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না। বাইরের রোদ তীব্র মনে হচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। পানির পিপাসাও হচ্ছে। সে আবদুল্লাহ সাহেবের লৌহ বিতানে ঢুকল ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানির জন্যে।

পানি খুব ঠাণ্ডা হতে হবে। খুব ঠাণ্ডা।

আবদুল্লাহ দরাজ গলায় বললেন, এতদিন পর আমার কথা মনে পড়ল। আসুন আসুন। আপনাকে এমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে কেন?

আতাহার বলল, বুঝতে পারছি না কেন?

আবদুল্লাহ ঝুঁকে এসে বললেন, আমার গল্পটা কি আজ শুনবেন? আজ আপনাকে শুনাতে পারি।

আতাহার প্রায় বলেই ফেলছিল - কিসের গল্প? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলালো। মনে পড়ল আবদুল্লাহ তার প্রেমের গল্প শুনাতে চেয়েছিলেন। আতাহার প্রেমের গল্প শোনার জন্যে কোন আগ্রহ অনুভব করছে না। বাঙালীর সব প্রেমের গল্পই জলো ধরনের হয়। চিঠি লেখালেখি, হাত ধরাধরি, তারপর এক সময় বাবা-মা জাতীর কারো হাতে ধরা পড়ে যাওয়া। গৃহত্যাগ এবং আবারো গৃহে প্রত্যাবর্তন। শতকরা আশি ভাগ ক্ষেত্রে মধুর মিলন। বিশ ভাগ — ট্রাজেডি। নায়ক-নায়িকা কিছুদিন বিরহ ব্যথায় কাতর — তারপর আবার স্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তন। আবার নতুন কারো সঙ্গে চিঠি চালাচালি।

লৌহ বিতানের মালিক এই সাধারণ ফর্মুলার বাইরে যাবেন এটা মনে করার কোন কারণ নেই।

আবদুল্লাহ বললেন, আমি ধরে নিয়েছিলাম আপনি ভুলে গিয়েছেন।

'ভুলি নি।'

'আজ তাহলে প্রেমের গল্পটা শুনবেন?'

'জ্বি। আজ রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসবদত্তা। ভাই, গল্প শুরু করার আগে খুব ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খাব। গ্লাস যত বড় হয় তত ভাল। আমার টেন্টেলাসের মত জল তৃষ্ণা পেয়েছে।'

'আপনার কি শরীর খারাপ?'

'জ্বি না শরীর খারাপ না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে — আপনার গায়ে জ্বর। বেশ ভাল জ্বর। মুখ লাল হয়ে আছে। দেখি, মাথাটা এগিয়ে আনুনতো, জ্বর দেখি।'

আতাহার তার মাথা এগিয়ে দিল। আবদুল্লাহ সাহেব জ্বর দেখলেন। তাঁর মুখে কোন ভাবান্তর হল না। তিনি তাঁর জরাগ্রস্ত বুড়ো কর্মচারীকে বিছানা করতে বললেন। আরো কি সব বললেন — আতাহারের মাথায় কিছুই ঢুকল না। সব কিছুই তার কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। যে তীব্র পানির তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছিল — সেই তৃষ্ণা নেই। শরীর কেমন যেন হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে কোন পাঁচতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে সে মাটিতে পড়বে না। আকাশে উড়তে থাকবে।

'আতাহার সাহেব!'

'জ্বি।'

'শুয়ে পড়ুন।'

'শুয়ে পড়ব কেন? আপনার গল্প শুনব না?'

'আপনার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। জ্বর এত বেশি যে থার্মোমিটার দিয়ে দেখতেও ভয় লাগছে। যান, শুয়ে থাকুন। আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি।'

'গল্প শুনব না?'

'শুনবেন। শুনবেন, গল্প অবশ্যই শুনবেন। খুবই ইন্টারেস্টিং গল্প। আপনাকে না শুনালে কাকে শুনাব? গল্পের একটা অংশ বলব আমি আরেকটা অংশ বলবে আমার স্ত্রী। আমি আপনাকে আমার স্ত্রীর নাম বলেছিলাম, আপনার কি মনে আছে?'

'জ্বি না।'

'আপনার জ্বর খুব বেশি। জ্বর কমলে অবশ্যই মনে পড়বে। যান, শুয়ে পড়ুন। আমি হাত ধরে আপনাকে শুইয়ে দিতে পারলে ভাল হত। সেটা সম্ভব না। আমি বরং আমার স্ত্রীকে ডাকি। আমি কি আপনাকে বলেছি আমার স্ত্রীর ধারণা আপনি একজন অভিনেতা?'

'জ্বি না।'

'আমি বলেছি — আপনার মনে নেই। যাই হোক, জ্বরটা কমলেই মনে পড়বে। আমার ধারণা ডাক্তার আপনাকে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখতে বলবে।'

আতাহার তাকিয়ে আছে। আবদুল্লাহর চোখ মুখ কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে আসছে। পানির তৃষ্ণা ফিরে এসেছে — কিন্তু আবদুল্লাহ নামের লোকটা তাকে পানি দিচ্ছে না। সেও গণি সাহেবের মত নানান কথা বলছে। অধিকাংশই অর্থহীন কথা। আতাহার ঘোরের ভেতর তলিয়ে গেল।

অসম্ভব রূপবতী একটি মেয়ে আতাহারের মুখের উপর ঝুঁকে আছে। মেয়েটি সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু সে খুব চেনা চোখে আতাহারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখে চাপা হাসি। মেয়েটির মাথা ভর্তি চুল। শাড়ির রঙ কমলা। কমলা রঙের শাড়ির ফাঁক দিয়ে কাল চুল বের হয়ে এসেছে। বাহ্, রঙের কি সুন্দর কম্বিনেশন।

আতাহার বলল, কে?

'আমি নীতু।'

আতাহার হতাশ গলায় বলল, ও আচ্ছা, নীতু।

সে জানে তার শরীর খুবই খারাপ। তার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। তাই বলে সে নীতুকে চিনবে না? তার কি হেলুসিনেশন হচ্ছে?

রূপবতী মহিলাটি বলল, আপনাকে আমরা একটা খুব ভাল ক্লিনিকে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

'আমি কোন চিন্তা করছি না।'

'আপনার জ্বর কত জানেন? একশ' পাঁচ।'

'আতাহার মনে করার চেষ্টা করল থার্মোমিটারে কত দাগ পর্যন্ত থাকে। একশ দশ? মনে পড়ছে না।'

'আমরা চিন্তা করছি। আমরা ভয়ংকর চিন্তায় পড়ে গেছি।'

'চিন্তা করবেন না।'

'আপনার আত্মীয় স্বজনের ঠিকানা দিন। তাদের খবর দেই।'

'তাদের খবর দেয়ার দরকার নেই।'

'অবশ্যই দরকার আছে। আপনি বুঝতে পারছেন না আপনার শরীর কতটা খারাপ। নীতুর টেলিফোন নাম্বার দিন। উনাকে আসতে বলি।'

আতাহারের মাথা আবারো এলোমেলো হয়ে গেলো। এই মেয়েটি বলছে সে নীতু আবার সে নীতুর টেলিফোন নাম্বার চাচ্ছে। জ্বর একশ পাঁচ হলে কি সব কিছু এমন হয়? কথাবার্তা অর্থহীন লাগে?

'আতাহার সাহেব!'

'জ্বি।'

'নীতুর টেলিফোন নাম্বার কি আপনার মনে আছে?'

'জ্বি।'

'নাম্বারটা বলুন।'

আতাহার অনেক চেষ্টা করেও নাম্বারটা মনে করতে পারল না। তার যা মনে পড়ল তা হচ্ছে সে একটা লিফটে করে উঠছে। সেই লিফটে একটা মেয়ে উঠেছে। মেয়েটার নাম বেহুলা। লিফটটা হচ্ছে বেহুলার লোহার বাসর। আতাহার বিড় বিড় করে বলল, —

'কপাটহীন একটা অস্থির ঘরে তার সঙ্গে দেখা।
লোহার তৈরি ছোট্ট একটা ঘর।
ঘরটা শুধু উঠছে আর নামছে . . .'

তরুণী বললেন, কি বলছেন আপনি?

আতাহার ক্লান্ত গলায় বলল, কিছু বলছি না।

'নীতুর ঠিকানাটা কি বলবেন? ওদের বাসাটা কোথায়?'

আতাহার বাসার ঠিকানা জানে না। রোড নাম্বার কত, বাড়ির নাম্বার কত কিছুই না। শুধু বাড়িটা চেনে।

'আচ্ছা, আপনি শুয়ে থাকুন। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।'

'আমি চিন্তা করছি নাতো।'

আতাহার চিন্তা করছে না। তার খানিকটা হাসি পাচ্ছে। হাসি পাবার কারণটাও অদ্ভুত। সে চোখের সামনে একজনকে দেখছে যে উঠবোস করছে। ডন বৈঠক দিচ্ছে। দাঁড়িওয়ালা একজন লোক — রবীন্দ্রনাথ না-কি? রবীন্দ্রনাথ ডন-বৈঠক দেবেন কেন? গণি সাহেব বলছিলেন আশি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একসারসাইজ করতেন। সেই কারণেই কি সে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে?

আতাহার হঠাৎ লক্ষ্য করল তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বেশ কষ্ট হচ্ছে। সে মারা যাচ্ছে নাতো?

অপূর্ব রূপবতী এক রমনী ঝুঁকে আছে তার দিকে। রমনীর মুখ একই সঙ্গে চেনা এবং অচেনা। কোথায় যেন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। জায়গাটা মনে পড়ছে না। হাসপাতালে নাতো? আচ্ছা, এই তরুণীর নাম কি হোসনা?

রমনী বলল, এ্যাম্বুলেন্স আনতে গেছে। এ্যাম্বুলেন্স এলেই আপনাকে ক্লিনিকে নিয়ে যাব। আপনি চিন্তা করবেন না।

আতাহার ক্লান্ত গলায় বলল, চিন্তা করছি না।

'আপনি তাকিয়ে থাকবেন না। চোখ বন্ধ করুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনি কে?'

'আমি আপনার বন্ধু আবদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী।'

'ও।'

'আপনার নাম কি হোসনা?'

'জ্বি-না। আমার নাম নীতু।'

আতাহার চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ করা মাত্র সে চলে গেলো প্রবল ঘোরের এক জগতে।

সেই রহস্যময় জগতে তার মাথায় একটা কবিতা তৈরি হচ্ছে। আশ্চর্যের ব্যাপার সে কবিতা তৈরির ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এইতো প্রথম শব্দটা চলে এসেছে, হালকাভাবে ভাসছে। নাচের ভঙ্গিতে শব্দটা ঘুরছে — কি অদ্ভুত সুন্দর লাগছে শব্দটা। শব্দটার গায়ে নানান বর্ণের পোষাক। শব্দটা ঘুরছে আর তার পোষাকের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার।

আতাহার আবার চোখ মেলল। রূপবতী মেয়েটা এখনো তার উপর ঝুঁকে আছে। ঘরে আরো লোকজন আছে। দিন না রাত্রি তা বোঝা যাচ্ছে না। ঘরে বাতি জ্বলছে। এই বাড়িতে সে দিনে ঢুকেছিল — এখন রাত্রি। তার মানে কি? রূপবতী মেয়েটির নাম কি? লীলাবতী? তাকেতো লীলাবতীর মতই লাগছে। না ইনি লীলাবতী না। ইনার নাম নীতু। ইনি আবদুল্লাহ সাহেবের স্ত্রী। এদের দু'জনের খুব সুন্দর একটা প্রেমের গল্প আছে। গল্পটা তার শোনার কথা। শোনা হয় নি। খুব রূপবতীদের প্রেমের গল্পগুলি ভয়ংকর টাইপের হয়। ইনারটা কি ভয়ংকর?

মেয়েটি বলল, আপনার শরীর কি এখন একটু ভাল লাগছে?

'না। ভাল লাছে না। খুব খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে আমি মারা যাব।'

মেয়েটি গভীর মমতায় আতাহারের মাথায় হাত রাখল। মেয়েটির হাত খুব ঠাণ্ডা। বেশ ঠাণ্ডা। কপালটা কেমন যেন করছে। তাকে একটা কথা বলা দরকার। আতাহার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, যদি মরে যাই তাহলে আপনি কি একটা কাজ করতে পারবেন?'

'বলুন কি কাজ?'

'নীতুকে একটা কথা বলবেন। ওকে বলবেন আমি যে দিনের পর দিন সাজ্জাদের পেছনে ঘুরতাম, ওদের বাড়িতে যেতাম, সকালে ঘুম থেকে উঠেই নাশতা খাবার জন্যে চলে যেতাম, সেটা শুধুমাত্র ওকে দেখার জন্যে। অন্য কিছু না।'

মেয়েটি হাসল। বাহ্, মেয়েটার হাসিটাতো সুন্দর। আতাহার বলল, আমি যদি বেঁচে যাই তাহলে ওকে কিছু বলার দরকার নেই। আপনার কি মনে থাকবে?

'থাকবে। আপনি নীতুর টেলিফোন নাম্বারটা মনে করার চেষ্টা করুন।'

আতাহার টেলিফোন নাম্বার মনে করার চেষ্টা করছে। মনে পড়ছে না। কবিতার একটা লাইন উঠে আসছে — আহ্ কি অপূর্ব পংক্তিমালা।

১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে জন্ম।

পেশা শিক্ষকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক। তেইশ বছর ধরে লেখালেখি করছেন। বাংলা কথাসাহিত্যের কিংবদন্তী পুরুষ। পেয়েছেন বাংলা একাডেমী পুরস্কার, একুশে পদক। নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র — আগুনের পরশমণি। ছবিটি ১৯৯৫-এর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। টিভিতে নাটক লিখছেন দীর্ঘদিন থেকে। যাত্রা শুরু এইসব দিনরাত্রি দিয়ে। তারপর এসেছে বহুব্রীহী, অয়োময়, কোথাও কেউ নেই, নক্ষত্রের রাত। জাপানের টেলিভিশন NHK অতি সম্প্রতি তাঁর উপর একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণ করে প্রচার করেছে।

নিভৃতচারী এই লেখক তিন কন্যা, এক পুত্র এবং স্ত্রী গুলতেকিনকে নিয়ে বাস করেন আপন ভুবনে। মাঝে মাঝে মনে হয় তিনি তাঁর নিজের সৃষ্ট চরিত্র — হিমু। আবার কখনো মনে হয় — মিসির আলি। যখন জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি কে ঠিক করে বলুন তো! তিনি হেসে বলেন, আমি কেউ না। I am nobody.